প্রবাস বন্ধু

মেহুল ঘোষ, বয়স ১৩

মোরা পৃথিবীর ছেলেমেয়ে, চলি সময়ের সাথে বেয়ে
মোরা আগামীর সেই আশা, সেই বিশ্বাস ভালবাসা
মোরা ছোট তবু গুণে শত, যেন আকাশের তারা কত
আলো দিতে পারি মোরা যদি জ্বলি গো নিজের মতো

নববর্ষ সংখ্যা ১৪৩১

১৪৩১ : প্রবাস বন্ধু : সূচীপত্র : নববর্ষ সংখ্যা : 2024

সম্পাদকীয়	মালবিকা চ্যাটার্জী (ডিকেটার, জর্জিয়া)	2
ডঃ এস এস নেওয়াজ স্মরণে		
একজন নেওয়াজভাই	সৈয়দ মনোয়ার রেশাদ (হিউস্টন, টেক্সাস)	5
পদ্মদিঘি থেকে তুলে আনা পদ্মের এক কোরক	সুমিতা বসু (হিউস্টন, টেক্সাস)	6
নেওয়াজ ভাই স্মরণে		
জন্ম-জীবন-মৃত্যু	রঙ্গনাথ (হিউস্টন, টেক্সাস)	8
নেওয়াজভাই	মালবিকা চ্যাটার্জী (ডিকেটার, জর্জিয়া)	9
গদ্য		
দিগদর্শন	মৃণাল চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস) চিত্ত ঘোষ (কলকাতা, ভারত)	12
নাটকের ইতিকথা ও বাংলা বারোয়ারি নাটকের জন্মকথা	সুমিতা বসু (হিউস্টন, টেক্সাস)	14
বনতামামি	অলোক কুমার চক্রবর্তী (কলকাতা, ভারত)	18
বার্ন আউট	বিষ্ণুপ্রিয়া (ইউ এস এ)	21
স্বাধীনতার রাজধানী – মাদারিপুর	৺এস এস নেওয়াজ	29
রূপালি জলের শস্য	চিত্ত ঘোষ (কলকাতা, ভারত)	31
স্নানের জলে দু'চার ফোঁটা	রিমি পতি (স্পার্টানবার্গ, সাউথ ক্যারোলাইনা)	33
ধারণা	রামেশ্বর কাম্বোজ (নয়ডা, ভারত) অনুবাদ: বেবী কারফরমা (কলকাতা, ভারত)	36
মন-উড়ান	অনিন্দিতা রায় বিশ্বাস (চ্যান্ডলার, অ্যারিজোনা)	37
বাস্তব	আনন্দিতা চৌধুরী (ইস্ট ব্রান্সউইক, নিউ জার্সি)	41
আমার কথা	দীপশিখা দাস (হিউস্টন, টেক্সাস)	42
কুহুর ফিরে যাওয়া	শান্তনু চক্রবর্তী (এডিনবার্গ, টেক্সাস)	63
আজও অপেক্ষায়	সুজাতা দাস (কলকাতা, ভারত)	71
চোর এবং দরজার আঙ্গিকে দুর্নীতি	ভজেন্দ্র বর্মন (হিউস্টন, টেক্সাস)	73
পোষা বোনু	সুজয় দত্ত (ক্লীভল্যান্ড, ওহায়ো)	76
নিজেকেই একটু পুষি	বলাকা ঘোষাল (হিউস্টন, টেক্সাস)	82
ডেস্টিনেশন ম্যারেজ	সফিক আহমেদ (হিউস্টন, টেক্সাস)	84
স্নেহে অন্ধ	নন্দিতা ভট্টাচার্য (কলকাতা, ভারত)	87
জামাইয়ের জুতো	কল্যাণী মিত্র ঘোষ (স্যান ডিয়েগো, ক্যালিফোর্নিয়া)	88
মায়ের অবদান	হুসনে জাহান (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	90

কবিতা

ছবি:-	আরাত্রিকা পাল (ক্যানসাস সিটি, ক্যানসাস)	43
ভিন্ন নববর্ষ	ডাঃ নিবেদিতা গাঙ্গুলী (হিউস্টন, টেক্সাস)	
হে নূতন	বৈশাখী চক্কোত্তি (কলকাতা, ভারত)	44
আত্মিক	ডাঃ নিবেদিতা গাঙ্গুলী (হিউস্টন, টেক্সাস)	44
অনাথ	শান্তনু মিত্র (কলকাতা, ভারত)	45
ডায়াস্পোরা, বালার্ক	সুজয় দত্ত (ক্লীভল্যান্ড, ওহায়ো)	47
ক্ষুদ্রকাব্য	শেলী শাহাবুদ্দিন (স্টোন মাউন্টেন, জর্জিয়া)	48
দখল	কৃষ্ণা গুহ রায় (কলকাতা, ভারত)	49
ঘুম	প্রভাস দাস (কলকাতা, ভারত)	50
অভিসার	মণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	51
জীবন ছবি	কমলপ্রিয়া রায় (হিউস্টন, টেক্সাস)	52
ছলছল চূর্ণি নদী	পৃথা চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	52
খনন, কোন দীপাবলি	শঙ্কর তালুকদার (কলকাতা, ভারত)	53
বর্তমান সংবিধান	মালবিকা চ্যাটার্জী (ডিকেটার, জর্জিয়া)	54
কৃপণ, তিরিশ হ'ল পার	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	55
তুমিই তো শব্দ শেখালে	অজয় সাহা (কলকাতা, ভারত)	56
বসন্ত বিলাপ	সফিক আহমেদ (হিউস্টন, টেক্সাস)	56
বৃদ্ধাশ্রম	সন্তোষ অ্যালেক্স (কোচিন, ভারত) অনুবাদ: বেবী কারফরমা (কলকাতা, ভারত)	57
একদিন সমুদ্র সৈকতে	নূপুর রায়চৌধুরী (অ্যান আর্বার, মিশিগান)	57
যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা	রঙ্গনাথ (হিউস্টন, টেক্সাস)	58
একাকীত্বের নেই কোনো বিপরীত	আলী তারেক (হিউস্টন, টেক্সাস)	59
যেতে পারো না, কবিতারা গিয়েছে মৌন মিছিলে	সুব্রত ভট্টাচার্য (কলকাতা, ভারত)	59, 60
তোমার চিঠি	উদ্দালক ভরদ্বাজ (হিউস্টন, টেক্সাস)	60
যদিও তুমি বলোনি...	দীপান্বিতা সরকার (মুম্বাই, ভারত)	61
নরক	অযান্ত্রিক (কলকাতা, ভারত)	62

প্রবাস বন্ধু

নববর্ষ সংখ্যা

বৈশাখ ১৪৩১, এপ্রিল ২০২৪

প্রকাশনায়: প্রবাস বন্ধু পাঠচক্র সভ্যবৃন্দ

প্রচ্ছদ চিত্র:

মেহুল ঘোষ, বয়স ১৩

কার্যনির্বাহী সদস্য:

চন্দ্রা দে

রূপছন্দা ঘোষ

অসিত কুমার সেন

সুজয় দত্ত

মালবিকা চ্যাটার্জী

প্রবাস বন্ধু পত্রিকা কেবলমাত্র

‘প্রবাস বন্ধু ওয়েবসাইট’-এ প্রকাশিত হয়

https://www.prabashbandhu.org/

সম্পাদকীয়

আজকের দুনিয়ায় হয়তো স্থিতি বা স্বস্তি আশা করাটাও ধৃষ্টতা। মনকে যতই পথ দেখাতে চাই যে ইচ্ছে থাকলেই ভালটা খুঁজে নেওয়া যায়, অমনি তেড়ে আসে একঝাঁক যুদ্ধের বার্তা, বয়ে আসে অকল্পনীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনীতির কথা তো বাদই দিলাম! জগৎজুড়ে অরাজকতার লীলাখেলা চলেছে! পৃথিবীটা ক্রমশ যেন অজানা, অচেনা উন্মত্ততায় মেতে উঠছে।
তবু এই ডামাডোলের মধ্যেও নববর্ষ এসে দাঁড়ায়। চৈত্র সেল জনতাকে উৎসাহিত করে খানিক কেনাকাটা, হৈচৈ করে সময় কাটাতে। বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ বাঙালিকে বাধ্য করে বাংলার নানান উৎসবে মেতে উঠতে।
আমরা যারা ভারতের বাইরে বাস করি, তারা হামেশাই নিজের দেশে গিয়ে বেশ খানিকটা আনন্দ ভরে নিয়ে আসি স্মৃতির ঝুলিতে। কিন্তু পারতপক্ষে গরমকালটা এড়িয়ে যেতে চাই। তবে অনেক বছর আগে একবার নববর্ষে ছিলাম কলকাতায়। বিদেশ-জীবনে ফিরে আসার আগে শেষ মুহূর্তের কিছু কেনাকাটা বাকি ছিল। জানলাম পয়লা বৈশাখে নাকি বাজার-হাট খোলা থাকে। বেরিয়ে পড়লাম; রাস্তায় বেরিয়ে দেখি সব দোকানের সদর দরজা ফুলের সাজে সেজে উঠেছে। কেনাকাটা করতে যে দোকানেই ঢুকছি সেখান থেকে বেরোবার আগে দোকানের কর্তৃপক্ষ হাতে ধরিয়ে দিচ্ছেন নতুন বছরে অভিনন্দন জানানো খাবারের বাক্স। দোকানের ভেতরেও সবার মনে খুশির আমেজ। এইভাবে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর ধারা এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সে ছিল এক অভিনব অভিজ্ঞতা!

আমাদের পাঠচক্র সাহিত্য সভার এককালীন সদস্য ডঃ এস এস নেওয়াজ এই বছরের জানুয়ারী মাসে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। হিউস্টনে তাঁদের অনেক দিনের বাস। সম্প্রতি তাঁরা তাঁদের সন্তানের কাছাকাছি বাস করতে শুরু করেছিলেন। সেখানেই তিনি তাঁর জীবনযাত্রা শেষ করেন। নেওয়াজ-ভাইয়ের আত্মার শান্তি কামনা করি। প্রবাস বন্ধু পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাই এবং সহানুভূতি জানাই তাঁর পরিবারের প্রতি।

এই পত্রিকার প্রচ্ছদ চিত্রটি এঁকেছে মেহুল ঘোষ, বয়স ১৩। মেহুল কলকাতায় থাকে। Tagore Foundation School of Kolkata, India-র ছাত্রী সে; Contributor: "We Amra" প্রজেক্ট। We Amra (https://weamra.org) ছোটদের জন্য একটি nonprofit multicultural গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম, যা সঙ্গীত, শিল্পকলা এবং নানা রকম হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষা ও সচেতনতা প্রদান ক'রে তাদের সৃজনশীল এবং বিশ্লেষণাত্মক মনকে লালন করে। প্রচ্ছদে কবিতাটি লিখেছেন ডাঃ নিবেদিতা গাঙ্গুলী।
পত্রিকার সব লেখক, লেখিকা ও চিত্রশিল্পীদের ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই।
প্রবাস বন্ধুর পক্ষ থেকে নতুন বছরে সকলের জন্য বিশেষ শুভেচ্ছা রইল।
মালবিকা চ্যাটার্জী

চিত্র: আধুনিক চিত্রকলার প্রবর্তক শ্রী যামিনী রায়

{এই পত্রিকার অনুল্লিখিত ছবিগুলি ইন্টারনেট থেকে নেওয়া হয়েছে}

ডঃ এস এস নেওয়াজ
স্মরণে

ডঃ এস এস নেওয়াজ (১ জানুয়ারী ১৯৪৫- ৫ জানুয়ারী ২০২৪)

একজন নেওয়াজভাই

সৈয়দ মনোয়ার রেশাদ

ডঃ এস এস নেওয়াজ – আমাদের নেওয়াজভাই ছিলেন হিউস্টনের প্রথম দিকের প্রবাসী বাংলাদেশীদের একজন। ১৯৬৯ সালে হিউস্টনে এসেছিলেন তিনি। এরপর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ইউনিভার্সিটি অফ হিউস্টনে পাকিস্তান স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সপক্ষ ত্যাগ করে নেওয়াজভাই বাংলাদেশ আন্দোলনের পথিকৃৎ হন এবং পাকিস্তানী পাসপোর্ট হারান। সেটা ছিল কেবলমাত্র শুরু – এরপর দেশ স্বাধীন হবার পরে এখানে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠাসহ এমন কোনোকিছু বাদ ছিল না যেখানে নেওয়াজভাই জড়িত ছিলেন না। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

যাঁরা ভাল লেখেন তাঁরা সবাই সুন্দর কথা বলতে পারেন না, যাঁরা সুন্দর কথা বলেন তাঁরা অনেকেই সুন্দর করে কাজ করতে পারেন না। নেওয়াজভাই ছিলেন ব্যতিক্রম – তিনি ছিলেন ভাল লেখক, ভাল কথক এবং অসম্ভব কর্মক্ষম একজন মানুষ।
তিনি যখন ১৯৫৪-র নির্বাচন, ১৯৬৬-র ৬ দফা আন্দোলন এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে প্রজ্ঞার সাথে কথা বলতেন, আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতাম – তিনি ছিলেন আমাদের অভিভাবক, বড় ভাই এবং গুরুজন।
নেওয়াজভাইয়ের লেখা ছোট গল্পের বই "নোনা জলের পদ্মদিঘি" পাঠকের মন ছুঁয়ে যায়। তাঁর দীর্ঘ জীবনের নানা ঘটনা গল্পের আকারে তুলে ধরেছেন সেখানে – সেসব লেখা পাঠককে নিয়ে যায় সেই আইয়ুব খানের সময় থেকে আজকের বাংলাদেশ এবং আমেরিকাতে।

প্রায় ৫০ বছর হিউস্টনে থেকে ২০১৯ সালে নেওয়াজভাই স্যান অ্যান্টোনিওতে একমাত্র পুত্রসন্তান রিফি নেওয়াজের কাছে একই শহরে আবাসী হন – দীর্ঘ হিউস্টন জীবনের অবসান ঘটলেও এখানকার যে কোনও অনুষ্ঠানে ছিল তার নিয়মিত পদচারণা।
পেশায় কেমিস্ট নেওয়াজভাই বাংলাদেশে স্কুলসহ অসংখ্য জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।

৫ই জানুয়ারী, শুক্রবার সকালে নেওয়াজভাই আমাদের সবাইকে চোখের জলে ভাসিয়ে পরপারে চলে গিয়েছেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না লিল্লাহে রাজেউন)। তাঁর মৃত্যুতে হিউস্টনে তাঁর পরিচিত মানুষদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে।
মৃত্যুকালে নেওয়াজভাই স্ত্রী সাঈদাভাবী, পুত্র রিফি, পুত্রবধূ ড্যাফনি, নাতি জেনসেন এবং নাতনি ইলাইজেকে রেখে গিয়েছেন।
আমরা তাঁদের সকলের সুস্থ-সবল এবং সুখী জীবন কামনা করি। তাঁদের পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জানাই।
নেওয়াজভাই বেঁচে থাকবেন আমাদের মাঝে, তাঁর অসংখ্য ভাল কাজের মধ্যে দিয়ে।
নেওয়াজভাই রচিত "নোনাজলের পদ্মদিঘি" বইটির 'ভূমিকা' অংশটি এখানে তুলে ধরলাম –

ভূমিকা

আমাদের জীবনটা সবরকম প্রবহমান অভিজ্ঞতারই সমষ্টি–তাই আমাদের অনুভূতি, চিন্তাধারা আর মূল্যবোধ–এইসব তদানীন্তন সময়ের পটভূমিকায় আর নানান অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রকাশ পায়। আমরা ইতিহাসের মধ্যেই বাস করি–কিন্তু সেই ক্ষণে ইতিহাসের প্রবাহটা হয়তো বোধ করি না। পরবর্তীতে সেইসব ঘটনাচক্র আর তার প্রভাব প্রাঞ্জল হয়ে দেখা দেয়। বইয়ের পাতার নীরস ইতিহাস গল্পের ছলে হয়ে ওঠে জীবন্ত।

আমার সমস্ত ছাত্রজীবনটা কেটেছে পাকিস্তান আমলে। ব্রিটিশ শাসনের শেষে স্বাধীন পাকিস্তানের এক অংশ পূর্ব পাকিস্তান। সেই পরিবর্তন আর তার প্রভাব প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনে, কর্মধারায় আর পারিপার্শ্বিকতায়। কিশোর মনে জেগেছে প্রশ্ন: আমাদের জাতীয়তাবোধটা কী বা কী হওয়া উচিত? ব্রিটিশরাজ শেষ হওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তান বা ভারতে এই প্রশ্নটা হয়তো এমন প্রাধান্য নাও পেতে পারে। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন আর তার পরবর্তীতে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম–বাংলাদেশের একান্তই নিজের। ইতিহাসের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন আর এই অভিজ্ঞতাই আমার মানসিকতা, মূল্যবোধ আর বিশ্লেষণকে সেই প্রজন্মের প্রায় সকলের মতোই প্রভাবিত করেছে সুদূরপ্রসারী ভাবে।

নামটা নিয়ে খটমট সমস্যা থেকেই গেল, সর্দার শাহ নেওয়াজ নেতাজীর অনুগামী ক্যাপ্টেন শাহ নেওয়াজের অনুপ্রেরণায়। কিন্তু হঠাৎ করেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে বাবা ইংরেজি কায়দায় তাকে বদলে করে দিলেন 'এস. এস. নেওয়াজ' এবং তারও অজস্র বাংলাদেশের নাগরিকের মতোই জন্ম-তারিখ পয়লা জানুয়ারি।

পদ্মদিঘি থেকে তুলে আনা পদ্মের এক কোরক
নেওয়াজ ভাই স্মরণে

সুমিতা বসু

নেওয়াজ-ভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় প্রায় দশ বছর আগে, হিউস্টনে প্রবাস বন্ধুর এক 'পাঠচক্র' সাহিত্য-সভায়। সাল বা মাস মনে নেই, কিন্তু তাঁর পড়া গল্পটি আবছা মনে আছে। গল্পটায় ছিল এক কিশোর অবোধ বালকের মুগ্ধ ও নির্মল ভাললাগার কথা। সেটা ছিল লোটন ও প্রভার গল্প – লোটন নাটক শেষ হবার পর শুধু ভাবে প্রভার কথা। ভাবে, প্রভা কী সুন্দর ! ভাবে, প্রভার চোখের তারায় আলো জ্বলে। এই ভাললাগা যতই চিরন্তন হোক না কেন, বড় ক্ষণিকের, দন্ড'দুয়ের তরে মাত্র।

তারপর কিশোরীটি একদিন চলে যায় তার অতি পরিচিত মা-বাবার গ্রাম ছেড়ে নতুন জীবনে। লোটনের দু'চোখ ভরা জল, আর সেই টলমল জলের ওপর চিকচিক করছে গোপন অভিমান। নৌকো ভাসে অকুল দরিয়ায় আর অজানা জীবন নদীতে ভাসে অবুঝ কিশোর মন। লোটন ও প্রভার শিশু বয়সের খেলার সাথীর প্রথম বিচ্ছেদ। প্রভার হঠাৎ বিয়ে আর অজানা এক যুবকের সঙ্গে চলে যাওয়া লোটনকে কেমন যেন অসহায় ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছিল!

নেওয়াজ-ভাইয়ের আবেগভরা গলায় সেই গল্প শুনতে শুনতে বারবার মনে পড়েছিল,

"আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে / বসন্তের বাতাসটুকুর মতো
সে যে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল রে / ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত" – গানটি।

লোটনের বুকের মধ্যে যে টালমাটাল, আবছা করে সেদিন মনে হয়েছিল গানের পরবর্তী অংশটুকুও –

"সে চলে গেল, বলে গেল না / সে কোথায় গেল ফিরে এল না
সে যেতে যেতে চেয়ে গেল / কী যেন গেয়ে গেল…"

এমনিই তো হয় – অনিত্য কাল, অনিত্য সম্পর্ক, মহাকালের গর্ভে নিমিত্তমাত্র। ছোটবেলা, সহচরী, অতি প্রিয় ও পরিচিত ঘরদোর আত্মীয় সব এক এক করে সরে সরে যেতে থাকে, দ্রুতগামী ট্রেন থেকে দেখা দু'পাশের মতো।
হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'জীবন সঙ্গীত' কবিতার বিখ্যাত লাইনটি:

"দারাপুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার
বলে জীব করো না ক্রন্দন!"

পরে এই গল্পটি আবার পড়েছিলাম, 'পেরিয়ে যাওয়া' নাম দিয়ে, বইটির মধ্যে। আবার নতুন করে ভাল লাগল।

নেওয়াজ-ভাইয়ের বইটির সম্পাদনার কাজ করতে গিয়ে সব গল্পই পড়েছি, আপ্লুত হয়েছি বিষয়বস্তু থেকে শব্দচয়নে তাঁর ব্যাপ্তি দেখে। আরও মুগ্ধ হয়েছি তাঁর আবেগ ও সঙ্গে সঙ্গে সীমিত রাশ টানার বিরল ক্ষমতায়। সম্পাদক-প্রকাশকের কাজ করতে করতে বারবার অনেকের লেখার মধ্যে ভাবনার জোয়ারের উচ্ছ্বাসে, ভাবের যতিচিহ্নকে হারিয়ে যেতে দেখি। সেটা একেবারেই প্রযোজ্য নয় নেওয়াজ ভাইয়ের ক্ষেত্রে। প্রথম বই হলেও অসম্ভব দক্ষতার ও নিপুণতার পরিচয় আছে তাঁর সৃষ্টিকর্মে। আর অবাক হয়ে দেখেছি সাঈদা-আপার নিরন্তর অনুপ্রেরণা।

এই প্রসঙ্গেই আসি তাঁর বইয়ের কথায়। নামটি 'নোনাজলের পদ্মদিঘি'। প্রথম প্রকাশ ২০১৬, প্রকাশক ইন্ডিক হাউস, কলকাতা। বইটি উৎসর্গ করেছেন 'মা ও স্ত্রী'র উদ্দেশ্যে।

এত সুন্দর করে বিনম্র এই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানানো – এক কথায় বুকের একান্ত গভীর তন্ত্রীতে একই সঙ্গে কড়ি মধ্যম ও কোমল গান্ধারের সুর তোলে!

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে 'নোনাজলের পদ্মদিঘি'তে যে অপরূপ পদ্মগুলি কোরক মেলেছিল তারা সাধারণ হয়েও অ-সাধারণের দাবি রাখে। সুদূর বাংলা থেকে আমেরিকার হিউস্টন শহর পর্যন্ত এর বিস্তৃতি – সময়ের ধারাসূত্রে নয়, খণ্ডচিত্রের নকশি-কাঁথায়। আর আছে পরাধীন অবিভক্ত ভারতবর্ষ, তারপর পূর্ব পাকিস্তান এবং স্বাধীন বাংলাদেশকে ঘিরে গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকা।

> আমার মা এবং আমার স্ত্রীর উদ্দেশে–
>
> আমার মা: প্রথমবার আমেরিকা থেকে দেশে গেলে পর আম্মা আমার হাতে বিবর্ণ, প্রায় হলদে হয়ে যাওয়া কাগজের কয়েকটি পাতা দিয়ে বললনে, 'খোকন, তোর একটা পুরানো লেখা পেয়েছি!' স্কুল-জীবনে লেখা তখনকার একদম সদ্য অভিজ্ঞতায় লেখা–এটাই 'অষ্টান্ন' লেখাটির ভিত্তি। বললাম, 'আমি এটা নিয়ে যাব।' এত বছর ধরে ছেলের লেখাটা বুকে করে যত্নে রেখেছেন–আমার কথাটা শুনে একটু ম্লান মুখে সরে গেলেন। দুদিন পরে মনে করে বিবর্ণ সেই কাগজগুলো আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই নে তোর লেখা।' তাঁর অন্য হাতে ছিল নতুন লাইনটানা কাগজের দু-তিনটে পাতা। সেখানে আমার পুরো লেখাটাই নিজে আবার লিখে নিয়েছেন।
>
> সাঈদা: আমার স্ত্রী সাঈদার মাতৃভাষা বাংলা নয়। নিজের আগ্রহ ও চেষ্টায় সে বাংলাকে আপন করে নিয়েছে। আমার প্রায় সবগুলো লেখার প্রথম পাঠিকা-শ্রোতা সে। তার উৎসাহ ছাড়া এ সংকলন হত কি না সন্দেহ।

অভিবাসী লেখক এস.এস. নেওয়াজ পরম যত্নে জীবন্ত করে তুলেছেন সেই ফেলে আসা দিনগুলি, সেই স্মৃতিময় ভালবাসা। বইটি শুরু করলে থামা যায় না, কী অদ্ভুত চুম্বকের ক্ষমতা তাঁর লেখায়। 'নোনাজলের পদ্মদিঘি' বইটিতে কুড়িটি গল্প আছে, আর আছে চারটি কবিতা। এই কুড়িটি গল্পে ১৯৪৭ এর আগের পুববাংলা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জন্ম, আর সেই সময় বেড়েওঠা বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে কিশোর নেওয়াজের সেই প্রজন্মের প্রতিভূ হয়ে মাতৃভূমির ওপর নিবিড় টানের কথা – কালির কালো রঙকে ছাপিয়ে বাঙালির স্বেদ-রক্তবিন্দুকে ফুটিয়ে তুলেছে।

এই বইয়ের চারটি কবিতাই যেন একেকটি চাবুকের মতো। যেমন, 'নীল কাগজের খাম' কবিতাটি গায়ে কাঁটা দেয়, যখন শুনি –

... 'ভুটে নাজিম গদি ছাড়। চোঙা ফোঁকে হিরো কচি ভাই
সমস্বরে আমরা হাঁকি: চাই-ই চাই রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই!'

মানবতার নির্মম অপমান ও যন্ত্রণা নিয়ে আরেকটি চাবুকের মতো কবিতা, 'ওদের শীত নেই' –
শীতার্ত রাতের নির্জন প্লাটফর্মে কুঁকড়ে লেজ গুটিয়ে শুয়ে আছে এক কুকুর। মানুষের সে নিয়ে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু গরীব অসহায় কোনো ছেলে যদি একটু উষ্ণতা খোঁজে কোনো পড়ে থাকা ছেঁড়া ত্রিপলের নীচে, ধুরন্ধর ব্যবসায়ী বলে, ব্যাটা ওরা চোর। অন্য পথযাত্রী মেনেও নেয় তা, কারণ যতই আমরা মনুষ্যরূপী, এই তথাকথিত সভ্যতার দুনিয়ায় আমরা আত্মসর্বস্ব হতে হতে সত্যিই প্রতিবাদের ভাষা হারিয়েছি, ভুলে গিয়েছি ঘুরে দাঁড়াতে! কবিতাটি আমাদের আয়নার সামনে দাঁড় করায়, যেখানে সারি সারি মুখের বদলে, শুধুই মুখোশ আর মুখোশ।

নেওয়াজ-ভাইয়ের জাদুময় লেখনীর টানে বইয়ের প্রতিটি রচনাই অনন্যতার দাবি রাখে। যাঁরা পড়েননি, তাঁদের প্রতি বিনীত অনুরোধ বইটি সংগ্রহ করে পড়ার। প্রতিটি গল্পে আছে সুর-তান-লয়... শুধু অশ্রুত গানটি পাঠক বা শ্রোতাকে শোনাবার অপেক্ষায়। পাঠকও কোন অজান্তে লেখকের সঙ্গে গলা মেলায়, 'একটা গান লিখো আমার জন্য'... এই গানটি লেখকের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের আকারে আমাকে লিখতেই হবে।
এটি আমার অলিখিত অঙ্গীকার – তাই এই প্রয়াস, তাই এই নিবেদন। নমস্কার জানাই, সালাম জানাই আপনাকে, নেওয়াজ ভাই।

জন্ম-জীবন-মৃত্যু

রঙ্গনাথ

জন্ম ও মৃত্যু পায় যত্ন, উদ্বেগ ও কদর –
দুটিকে ভালবাসার সাথে গ্রহণ করা হয়।
জন্মেতে সবাই খুশী, এ নিয়ে কত হৈ চৈ;
মৃত্যুতে সবাই হই শোকাতুর ও ভগ্নহৃদয়।

জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানটাই হ'ল জীবন –
এ জীবনকালের সীমানাটা কম বেশী হয়
এ জীবনযাত্রার নেই কোন নির্ধারিত পথ;
কারো ক্ষেত্রে খুব সহজ, অনেকের তা নয়।

বলা যেতে পারে, সকল জন্ম এক রকম –
জন্মের সময় নবজাতক ভেঙ্গে পড়ে কান্নায়
ভয়ে ভয়ে সে তাকাতে থাকে এদিক ওদিক;
তার কান্না থামে যবে সে ভরসা খুঁজে পায়।

জীবন যেন আনন্দ ও বেদনা নিয়ে বাঁচা –
সুখে থাকলে রই হাসিখুশি, কষ্টে কাতর।
একক সুখ বিরল; দুঃখও আসে, চলে যায়;
এ সুখ-দুঃখ কম বেশী থাকে জীবন'ভর।

কিছু উত্তর বলে দেয় জীবনের ভাল-মন্দ –
পাও কি নির্মল বায়ু-জল, পর্যাপ্ত খাদ্য-বস্ত্র?
পরিবেশ কেমন? পাও কি সম্মান ও সুবিচার?
নিজে সৎ না অসৎ? কি চিন্তা কর দিবারাত্র?

সমাজে এখন সবার জীবন হয় না সমান;
প্রশ্ন আসে, 'কেন বৈষম্য, কেন বিভাজন?'
বায়ু, জল, খাদ্য-বস্ত্র, শুশ্রূষা একমত হলে
সমাজের বৈষম্য অনেকটাই কমত তখন।

জীবনের চিত্রপট, আকাঙ্ক্ষা, সহন-ক্ষমতা
প্রকাশ পায় কথায়, কর্মকাণ্ডে ও আচরণে।
কেহ সুখী অল্পে, কারো চাহিদার অন্ত নেই;
সুখ দুঃখ বাড়ে কমে রকমারি চিন্তার কারণে।

যদি অর্থ, ত্বকের রং, ধর্ম দিয়ে হয় মূল্যায়ন
সম্পদ-ক্ষমতা নিয়ে সমাজে বাড়াবাড়ি যখন,
ঘৃণা-হিংসা-দ্বন্দ্ব, দুর্নীতি বাড়ে মানুষের মাঝে।
তখন শ্রেষ্ঠ হতে বিবেককে দেওয়া হয় বিসর্জন।

প্রতিটি জীবনে দেখতে পাই জয় ও পরাজয়
দেখা যায় মানুষে-মানুষে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা;
জীবনে শান্তি-অশান্তি ভিন্ন ঢেউ হয়ে আসে
আরও দেখি সুস্থ-রুগ্নতা, উল্লাস-বিষণ্নতা।

দেখি মানুষের মাঝে বাড়ন্ত অবিচার-কদাচার
দেখি অন্যায়, দুর্নীতি আর সভ্যতার অবক্ষয় –
এর শিকার যারা, তাদের হয় দুর্বিষহ জীবন;
এসব ঘৃণিত দিক বাড়ায় মানবতার বিপর্যয়।

দেখি বহু নিবেদিত প্রাণ রেখে যায় অবদান
এরা সমাজ সেবক, থাকে মানুষের পাশে;
সকল জীবন সার্থক হোক—এই তারা চায়
বাড়ি-গাড়ি, সম্পদ বড় নয় তাদের কাছে –

অন্যায় রুখতে অনেকে করে না মৃত্যুর ভয়;
যারা দয়া দেখায়, পায় প্রশংসা সবার থেকে।
বিজ্ঞানীরা দিয়ে যায় নতুন নতুন আবিষ্কার
বহু জ্ঞানী বিদায় নেয় জ্ঞান-ভান্ডার রেখে।

মৃত্যু আনে পার্থিব জীবনের চির অবসান –
উত্তম অধম নির্বিশেষে এক নীতি, এক রায়।
যখন কোন মরণ ঘটে রোগে বা অপঘাতে
তখন জীবনের সকল কল-কব্জা থেমে যায়।

মৃত্যুর পর যা করণীয় তা শুধু সংস্কার মাত্র –
যথা নিশ্চল দেহটা এক গোরস্থানে দাফন পায়
কিংবা ভস্ম হয় শ্মশানের চুল্লিতে দাহনের পর।
শেষে স্বজনের মাঝে জীবনের স্মৃতি রয়ে যায়।

উৎসর্গঃ

শ্রদ্ধেয় ডঃ এস এস নেওয়াজ, যিনি ৫ই জানুয়ারী, ২০২৪-এ মৃত্যুবরণ করেছেন। একজন শিক্ষক, বিজ্ঞানী ও সমাজ হিতৈষী হিসাবে তিনি বহু গুণের অধিকারী ছিলেন।

নেওয়াজভাই

মালবিকা চ্যাটার্জী

জানুয়ারীর এক সকালে নেওয়াজভাইয়ের মৃত্যুসংবাদটি পেয়ে মন বিচলিত হয়েছিল।
নেওয়াজভাইকে আমি অল্পই চিনতাম, ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় তাঁর লেখার মাধ্যমে। তাঁর লেখার বিষয়বস্তু আর লেখার ধরন খুব ভাল লাগত আমার। প্রবাস বন্ধুর প্রত্যেক সংখ্যায় লেখা দিতেন না, কিন্তু যখনই খুব করে অনুরোধ করতাম তখনই অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে রাজি হয়ে যেতেন। সাহিত্য সভায় আসতেন মাঝে মধ্যে, নিয়মিত আসা ওঁদের পক্ষে সম্ভব হতো না, সেইজন্য পরিচয়ের মাঝখানে একটা ছোট্ট বেড়া রয়ে গিয়েছিল।
কিন্তু ওই অল্প পরিচয়েও নেওয়াজভাইয়ের স্ত্রী 'সাঈদা'র সঙ্গে বেশ একটা স্বচ্ছন্দ ভাললাগার বিনিময় ছিল। তার একটা বিরাট কারণ হয়তো সাঈদার অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহার।

হিউস্টনে থাকতে আমার একটা বিশ্রী অপবাদ ছিল যে আমি গাছের সেবাযত্ন ঠিকমতো করতে পারি না; তাই আমার কাছে গাছেরা এলে বিনা যত্নে দেহরক্ষা করে। কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে নয়, তবে অবশ্যই আমি গাছ হত্যাকারী নয়। হিউস্টনের ওই বেদম গরমে বাইরে দাঁড়িয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গলদঘর্ম করে গাছেদের তরিবত করা সত্যিই আমার পোষাত না।
অপরপক্ষে সাঈদার হাতে কী না হয়! ওঁর শুধু বুড়ো আঙুলই নয়, দুহাতের সবকটা আঙুলই সবুজ।
আমাদের বাড়িতে একটি সাহিত্য সভায় নেওয়াজভাই ও সাঈদা এসেছিলেন। নেওয়াজভাইয়ের হাতে একটা বড় খোলা বাক্সে ছিল বেশ ক'টা ছোট ছোট গাছ। আমার হাতে বাক্সটি দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "আমার ধারণা এগুলো সব ঠিক থাকবে।" আমি বলতে পারব না তিনি আমার অপবাদের কথা মাথায় রেখে সে কথা বলেছিলেন, নাকি এমনিই বলেছিলেন।
আশ্চর্যের কথা তাঁদের দেওয়া সবকটি গাছ বেঁচে গেছে। এমনকি যে শিউলি গাছ অনেক সবুজ-বুড়ো-আঙুলযুক্ত মানুষরা জিইয়ে রাখতে পারেন না, সে গাছ আমাদের বাড়িতে বছর বছর শরৎকালীন ফুলে ভরে দিয়েছিল।

নেওয়াজভাই তাঁর বইতে একটি জায়গায় লিখেছেন –
"এর মধ্যেই রয়েছে ইতিহাসের অনেক ছেঁড়া পাতার অংশবিশেষ। নতুন প্রজন্মের কোনো পাঠক যদি খুঁজে পায় সেই সুদূর অতীতের কোনো পরিচিতি, তাহলে এ প্রয়াসকে সার্থক মনে করব।..."
আমার ধারণা ওঁর অমন প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরা ইতিহাসের পাতার অংশগুলি সমস্ত পাঠককে মুগ্ধ করবে। পরের প্রজন্ম অতি অবশ্যই জানতে পারবে হারিয়ে যাওয়া অনেক সত্য গল্পের তথ্য।
নেওয়াজভাইয়ের অনেক গুণের কথা শুনি, কিন্তু সবটা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়নি।
আশা রাখি নেওয়াজভাইয়ের অবর্তমানে তাঁর পরিবারের সকলে পরিস্থিতি সামলে চলার শক্তি পাবেন।
নেওয়াজভাইয়ের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

With
Deepest
Sympathy...
From:
Prabash Bandhu Pathachakra

নববর্ষ সংখ্যা

দিগদর্শন

মৃণাল চৌধুরী ও চিত্ত ঘোষ

সংখ্যা সত্য তৈরী করে না | সত্য স্বনির্ভর, নিজের শক্তিতে কালজয়ী হয় | মানুষ ইতিহাস তৈরী করে | কিন্তু এটাও ইতিহাসগতভাবে সত্য যে সঙ্ঘের তুলনায় ব্যক্তি মানুষের ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রেই ইতিহাসের চালিকা শক্তির নির্ণায়ক হয়ে উঠেছে | সত্যের সন্ধানে যুক্তিকে হাতিয়ার করে এমন কিছু একক লড়াই তাঁরা করেছেন, যার প্রতিপক্ষ ছিল ভয়ঙ্কর রক্ষণশীলতা ও তার ধ্বজাধারী হিংসাপ্রবণ সমাজ | তবুও সে লড়াইগুলোতে তাঁরা জিতে যান | জয় কখনো আসে সেই লড়াকু প্রতিভাদের জীবদ্দশায়, আর তা যদি না হয় সমাজ ও সমষ্টিকে সেইসব ভাবনার কাছে পৌঁছাতে কেটে যায় কয়েক দশক, এমনকি শতাব্দীও |

কয়েকটি উদাহরণ:

গ্যালিলেও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যেদিন বলেছিলেন, "আমি

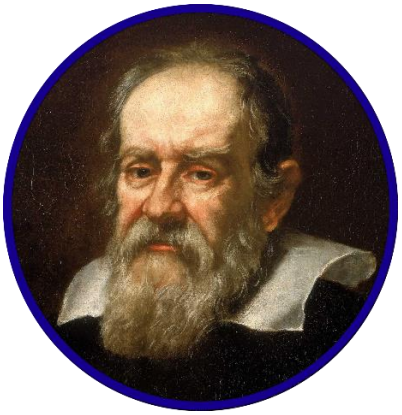

Galileo Galilei (15 February 1564 – 8 January 1642)

আবার বলছি, সূর্য স্থির | পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে | আমাকে শাস্তি দিয়েও, সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ আপনারা বন্ধ করতে পারবেন না, পৃথিবী আগের মতোই ঘুরবে |" সেদিন ওঁর কথায় সবাই হেসেছিল | বিচার সভায় গ্যালিলেও-র শাস্তিও হয়েছিল |

বাকিটা ইতিহাস!

সতীদাহর মতো জঘন্য এক সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় সরবে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন | সদ্য স্বামীহারা অসহায় বিধবাদের জীবন্ত পুড়িয়ে সতীদাহর মতো হত্যালীলার হিংস্র বর্বর প্রথাকে নির্মূল করতে মুষ্টিমেয় দু'চারজন সমমনস্ক বন্ধুর সমর্থন নিয়ে রামমোহন রায় যখন একা লাগাতার প্রচার ও প্রয়াস চালিয়েছিলেন, তখন সেই সময়কার হিন্দু সমাজ (আজকের পলিটিক্যাল হিন্দুত্ববাদীদের পূর্ব'পুরুষ') তাঁর চরিত্রহনন করে, লোক ক্ষেপিয়ে এমনকি খুন করার হুমকি দিয়ে তাঁকে থামাতে চেয়েছিল | বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার কয়েক হাজার সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষ পিটিশন করেন এই আইনের বিরুদ্ধে | তাঁদের মত, ইংরেজ সরকার তাঁদের ধর্মীয় বিষয়ে নাক গলাবার চেষ্টা করছে | ব্যাপারটা লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত গড়ালে রামমোহন রায় উল্টো আইনের পক্ষে পিটিশন করেন |

রাজা রামমোহন রায় (২২ মে, ১৭৭২ – ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩)

প্রিভি কাউন্সিল আইনের পক্ষে মত দেয় |

বাকিটা ইতিহাস!

বিধবা বিবাহের সপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পেয়েছিলেন মাত্র

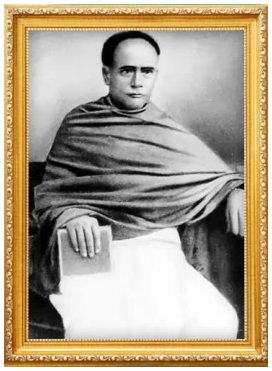

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২০ – ২৯ জুলাই, ১৮৯১)

৯৮৭টি সই, আর বিপক্ষে সই ছিল ৩৬,৭৬৩টি |

সিগনেট থেকে প্রকাশিত বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালী"-র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ "আম আঁটির ভেঁপু"-র জন্য ছবি আঁকতে আঁকতেই সত্যজিতের মনে হয়েছিল, তিনি যদি কোনোদিন

সিনেমা করেন, তবে এটাই হবে তাঁর প্রথম সিনেমা। সিনেমার শুটিং যখন শুরু হয়, তখন শুধু প্রযোজকরাই নন, তৎকালীন বিখ্যাত পরিচালকরাও সত্যজিৎকে নিয়ে হেসেছিলেন।

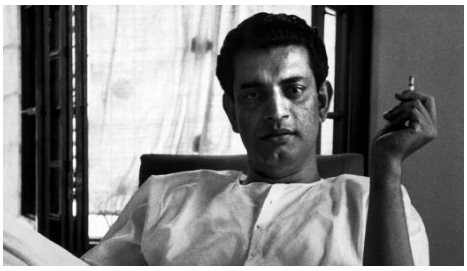

সত্যজিৎ রায় (২ মে ১৯২১ – ২৩ এপ্রিল ১৯৯২)

অনেকে তো ওঁকে পাগল পর্যন্ত বলেছিলেন।

বাকিটা ইতিহাস!

তালিকা দীর্ঘ। প্রাচীন গ্রীসের আর্কিমেডিস থেকে

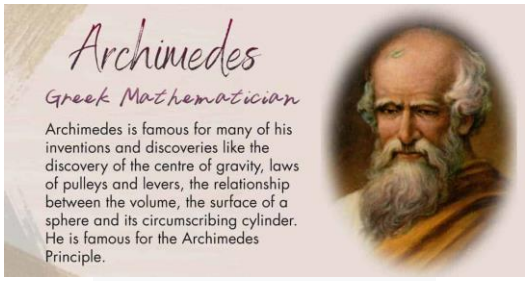

Archimedes (287 BC – 212 BC)

সাম্প্রতিক আত্মবিস্মৃত ও আত্মঘাতী বাঙালির উপেক্ষার শিকার

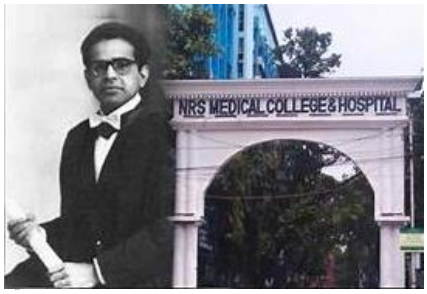

দুই মহারত্ন; যথাক্রমে ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় (নলজাতক মানব জন্মের পুরোধা চিকিৎসক) এবং

ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৬ জানুয়ারি, ১৯৩১ – ১৯ জুন, ১৯৮১)

ডাঃ দিলীপ মহলানবিশ, যিনি শুধু 'ও আর এস্' নামক একটি

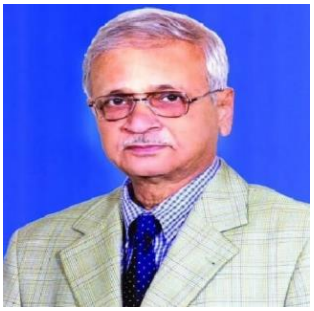

ডাঃ দিলীপ মহলানাবিশ (১২ নভেম্বর, ১৯৩৪ – ১৬ অক্টোবর, ২০২২)

দ্রবণ দিয়ে প্রায় একা হাতে রুখে দিয়েছিলেন ১৯৭১-এ বাংলাদেশ থেকে আগত এক কোটির বেশী শরণার্থীদের ওপর কলেরা মহামারীর আক্রমণ।

বলা যায় বাংলা আধুনিক কবিতার প্রমেথিয়াস (Prometheus) একক এবং অনন্য জীবনানন্দ দাশ।

জীবনানন্দ দাশ (১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯ – ২২ অক্টোবর, ১৯৫৪)

সুতরাং আমরা যখন বলি – লড়াইটা রোজ সন্ধ্যার ওই টিভি স্টুডিওর টিকি আর দাড়ির জন্য নয়; লড়াইটা স্বাধীনতা, রাষ্ট্রবোধ আর নিজের ধর্ম পালনের জন্য – ওরা হাসে আমাদের নিয়ে। ওদের হাসতে দিন। শুধু একটা কথাই মনে রেখে দিন – হাজারটা লোক যদি একটা পুকুরকে সমুদ্র বলে, রাতারাতি পুকুরটা সমুদ্র হয়ে যায় না। তাই প্রশ্ন এটা নয় যে আমরা পরিসংখ্যানে কত শতাংশ বা প্রশ্ন এটাও নয় যে আমরা কতটা নগণ্য!

উত্তর একটাই –

আজ থেকে অনেক বছর পর স্কুল-কলেজে পড়া ছেলে-মেয়েরা যখন মাঠের ধারের বেঞ্চটাতে বসে গল্প করবে, ওরা বলবে – জানিস, আজ থেকে অনেক বছর আগে সবাই যখন টাকার নেশাতে মানুষকে মাতিয়ে রেখেছিল, আমাদের মতো সাধারণদের জন্য তখন ওই ওরাই ঠিক আওয়াজ তুলেছিল।

পৃথিবীর সব যুদ্ধ জেতা যায় না, কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে থাকতে হয় – এটা বোঝানোর জন্য কেউ তো একজন ছিল, কেউ তো একজন শুরু করেছিল, কেউ তো একজন শাসকের চোখে চোখ রেখে বলতে পেরেছিল, "রাজা তোর কাপড় কোথায়?"

জেতা-হারাটা সাময়িক, জীবনে সত্যের সন্ধানটাই আসল।

Truth is nothing but the truth...

নাটকের ইতিকথা ও বাংলা বারোয়ারি নাটকের জন্মকথা

সুমিতা বসু

থিয়েটার বা নাটক সাংস্কৃতিক অন্যান্য মাধ্যমগুলির মধ্যে সবথেকে বেশি এবং সরাসরি দর্শকের সঙ্গে যোগস্থাপন করতে পারে। তাই সমাজ ও সংস্কৃতির যে কোনো পরিবর্তন ও সচেতনতা জনসমক্ষে আনতে নাটকের কোনো বিকল্প নেই। নাটক বাকরুদ্ধকে দেয় ভাষা, নীরবতাকে দেয় সরবতা, অন্যায়কে দেয় প্রতিবাদের অঙ্গীকার। ভবভূতির নবভাব – রতি, হাস, শোক, ক্রোধ ইত্যাদি অভিনয়ের মাধ্যমে নিমেষে নাটকে শৃঙ্গার, হাস্য ইত্যাদি নবরসে রূপান্তরিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বয়ে যায় মঞ্চ থেকে উপস্থিত প্রতিটি দর্শকের হৃদমাঝারে।

ভারতবর্ষে নাটকের ইতিহাস প্রাচীন ও বহু পরিচিত। ভাস, ভবভূতি বা মহাকবি কালিদাসের নাম শোনেননি এমন নাট্যোৎসাহী মানুষ মেলা ভার। ভারতীয় পটভূমিকায় বহু প্রাচীন হলেও পশ্চিমে, বিশেষত ইংল্যান্ডে, ১৩৫০ সাল থেকে নাটক শুরু হয় বাইবেলের গল্প বা কোনো সন্তের জীবনীকে ঘিরে। আসলে জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করা, চার্চের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য এই নাট্যমাধ্যম যে সবচেয়ে কার্যকরী, সেটা উদ্যোক্তাদের মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল নাট্যচর্চা। গ্রীস-নাটক অবশ্য এর অনেক আগে থেকেই যথেষ্ট প্রতিপত্তি করে নিয়েছিল পশ্চিমী দুনিয়ায়।

"That's the magic of art and the magic of theatre:
it has the power to transform an audience,
an individual, or en masse,
to transform them and give them
an epiphanal experience that changes their life,
opens their hearts and their minds
and the way they think."

~Brian Stokes Mitchell

পরের দু'তিনশো বছর অনেক বাধা ও ভাঙা গড়ায় ইংরেজি নাটকে ধর্মীয়, বাধ্যতামূলক নাট্যকাহিনীর পাশাপাশি সামাজিক বিষয়কেও কেন্দ্রীভূত হতে দেখা যায়। ব্রিটেনের প্রথম থিয়েটার নির্মাণ বিষয় নথিভুক্ত হয়েছে লন্ডনে, ১৫৭৬ সালে, নাম 'The Theatre'। জানা যায়, এর পরবর্তী ১৬ বছর ধরে আরো ১৭টি নাটক অভিনয় করার মঞ্চ প্রস্তুত হয় এবং সেগুলি আমজনতার জন্য অবারিত দ্বার ছিল। দর্শকের আগ্রহে ও উৎসাহে মঞ্চ নির্মাণ ও পাশাপাশি নাটক লেখায় প্রায় হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। আসলে শেক্সপীয়ারের (১৫৬৪-১৬১৬) মতো নাট্যসূর্যের উদ্ভাসিত হওয়ার পিছনে এটাই ছিল উষামণ্ডলীর শুকতারা সমেত প্রস্তুতির আভাস। সেই সময় যেসব মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছিল, সেগুলি ছিল গোলাকার। মঞ্চের একদিকে নাটক আর অন্য তিনদিকে

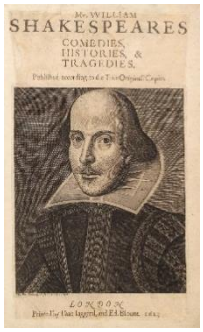

দর্শকবৃন্দ বসে বা দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখত। জনসাধারণেরও অবাধ প্রবেশাধিকার শুরু হয়ে গেল। ইংরেজি নাটকের গোড়ার দিক হলেও, এটিকে স্বর্ণযুগ বলা যায়।

নাটকের আদি খুঁজতে গেলে তার অন্ত পাওয়া যাবে না। মানব সভ্যতার ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকেই যথাযথ অভিধানগত 'নাটক' তকমা না পেলেও, নাটকের জন্ম হয় তখনই। মানুষ সংঘবদ্ধ জীব। আদিকাল থেকে গুহাবাসী আমাদের পূর্বসূরীরা দিনান্তে শিকার সেরে আগুনের চারদিকে বসে সারাদিনের অভিজ্ঞতার গল্প অঙ্গভঙ্গি সহকারে ভাগ করে নিত দলবদ্ধ সকলের সঙ্গে। এদেরই মধ্যে কেউ কেউ ছিল অসাধারণ কথক, কেউ ছিল বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বাকি সকলকে আনন্দ-দুঃখ দেবার পুরোধা।

এই ভাবনা থেকেই আমরা এখানে দেখে নেব, বাংলায় জনসাধারণের নাটকের গোড়ার কথা। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় ব্রিটিশ রাজধানী ছিল কলকাতা। সেটা আঠারোশো-উনবিংশ শতাব্দী – মধ্য, এমনকি অন্ত-মধ্য যুগের ইতি। বাংলা সাহিত্য সবে তখন ভক্তিরসের ব্রীড়াবনতা রূপ ছেড়ে একটু

একটু করে সময়ের সঙ্গে তাল দিতে দিতে সমাজের দিকে চোখ ফেরাচ্ছে | পদাবলীর প্রেম বা ভক্তি নয়, মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের অলৌকিক দৈবীকীর্তি বা রোষ নয়, ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল-এ ঈশ্বরী পাটনী বর চাইছে, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'|

এদিকে, ব্রিটিশদের আধিপত্যে তখন নব্য ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে | এরাই তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের ধারক-বাহক, এরাই নব্য সম্প্রদায়ের প্রতিভূ হয়ে বিদেশী ভাষা, আদব-কায়দা শিখতে ব্যস্ত | গোবিন্দপুর-কালীঘাট ও সুতানুটি তিনটি গ্রামকে নিয়ে যে নতুন শহর 'কলকাতা' তৈরি হয়, সেখানে গ্রাম, শহরতলী থেকে এরা দলে

Calcutta 1865, source British Library

দলে এসে পড়ল | বাংলার নবজাগরণের সেই আদি মুহূর্তে বাংলার নাটকেরও জন্ম| মাতৃস্বরূপা সংস্কৃত থেকে এই নাটকের ভাব, ভাবনা ও আঙ্গিক অনেকটাই আলাদা | চর্যাপদের পর মধ্যযুগের বাংলাভাষা ও সাহিত্য মঙ্গলকাব্য ও পদাবলীর হাত ধরে ভক্তিরসে নিমজ্জিত | বাংলার মধ্যযুগীয় সময়ে আসলে আমোদ বিনোদনের মাধ্যম ছিল পদাবলী গান, মঙ্গলকাব্যের গান, হয়তো কিছু লোকসঙ্গীত; এবং অন্ত-মধ্য পর্বে – যাত্রা, খেউড়, আখড়াই, কবির লড়াই ইত্যাদি| নতুন শহর কলকাতার শিক্ষিত পরিশীলিত বাবু সম্প্রদায়ের পক্ষে একে জাতে তুলে, মেনে ও মানিয়ে নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল | অতএব, চূড়ান্ত বিদেশী অনুকরণ ও অনুসরণ চলতে লাগল, বিশেষত ভাবনা ও আঙ্গিকে | আঠারোশো-উনবিংশ শতকে এর প্রভূত উদাহরণ পাওয়া যায়| রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম পর্যায়ের নাটক, বাল্মীকি প্রতিভা বা কালমৃগয়াতেও এর সুস্পষ্ট নিদর্শন | মঞ্চ বলতে তখন কিন্তু কোনো পেশাদারী ও বারোয়ারি মঞ্চের স্থায়ী ঠিকানা ছিল না| প্রথিতযশা ও ধনী সম্প্রদায়ভুক্ত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি, নবকৃষ্ণ দেব-দের মতো আরো কিছু বিশিষ্ট ধনী গৃহে নাটক হতো এবং তা সীমিত থাকত নিমন্ত্রিত অতিথি অভ্যাগত-দের মধ্যে| জনসাধারণের প্রবেশ সেখানে নৈব নৈব চ|
সেটা শুরু হ'ল ন্যাশনাল থিয়েটারের হাত ধরে | ন্যাশনালের মালিক প্রতাপচাঁদ জুহুরী সেসময় কলকাতার এক ধনী মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী | থিয়েটার তার কাছে অন্য যে কোনো ব্যবসার মতো আর একটা লাভজনক ব্যবসামাত্র; তায় আবার জনসাধারণকে টিকিট বিক্রি করে থিয়েটারের দরজা খোলা!

সালটা ১৮৭০-এর দশক | সেই সময়ের প্রবল নাট্যব্যক্তিত্ব বলতে গিরিশ ঘোষ, অর্ধেন্দু শেখর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ| সেই পেশাদার মঞ্চে নারী চরিত্রে নারী লাগবে, কিন্তু ভদ্র পরিবারের মেয়েরা কিছুতেই অভিনয় করবে না | উপায়? উপায় থাকতেই হবে এবং আছেও | পতিতাপল্লী থেকে নারী চরিত্রে অভিনয়ের উপযোগী অভিনেত্রী নিয়োগ চলতে লাগল | একদিন ব্রজনাথ শেঠ ও পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সুগায়িকা গঙ্গাবাঈয়ের কাছে গান শুনতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন অরূপরতন | কিশোরী বিনোদিনী এসেছিল গান শিখতে | সে কোকিলকণ্ঠী | ব্রজনাথ ও পূর্ণচন্দ্র তখনই তাকে নিয়ে হাজির ন্যাশনালে | দেখা গেল, তার অভিনয় ক্ষমতাও প্রশ্নাতীত | ব্যবসায়ী হলেও মালিক জুহুরী, রত্ন চিনলেন| চেনালেন স্বয়ং গিরিশ ঘোষ|

১৮৬৩ সালে কলকাতার এক পতিতা মায়ের গর্ভে বিনোদিনীর জন্ম, সেই রক্তবীজ তিনি আজীবন বয়ে

চলেছিলেন | ইতিহাসবিদ, গবেষণারত পন্ডিত বা বাংলা নাট্যোৎসাহী সকলেই জানেন নটী বিনোদিনীর কথা| কিন্তু তাঁর অভিনয় প্রতিভা ও অসামান্য আত্মত্যাগের কাহিনী জেনেও, চাঁদের চিরন্তন কলঙ্কের মতো তাঁর বারাঙ্গনা মুকুটটি বাঙালি খুলতে দেয়নি | অথচ তিনি সত্যিই ছিলেন বাংলার 'হেলেন অফ ট্রয়', 'ক্লিওপেট্রা' কিংবা আরো বুক চিরে বলতে গেলে 'পাঞ্চালী'-সমা|

ন্যাশনাল থিয়েটারের তখন খুব রমরমা। সেই কিশোর বয়সে দশ টাকা মাসিক বেতনে ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দেবার পর বিনোদিনী কিংবদন্তি নাট্যপ্রতিভা গিরিশ ঘোষকে গুরু মেনে বাংলা নাটককে এক নতুন পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন। একের পর এক সাফল্য, এককথায় সব সময় প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ থাকত। একধারে সীতা, সতী, উমা – সব চরিত্রেই তাঁর স্বাভাবিক ও সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য। মঞ্চ যেন তাঁর স্বাভাবিক স্থান। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই মালিক জুহুরীর সঙ্গে কলা-কুশলীদের বনিবনা তো হচ্ছিলই না, উপরন্তু মতবিরোধ ঘটছিল ঘন ঘন। লাভের সবটাই জুহুরী নিজের পকেটস্থ করার পর, মাইনে বাড়ানোর কথা শুনলে মাথা গরম হয়ে যেত তার। অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল যতই আস্ফালন করুক জুহুরী মশাই নিশ্চিত জানত, এরা সবাই কাগুজে বাঘ! সকলেরই পকেট ঠনঠনে! 'ইজ্জত ইজ্জত' করে যতই চেঁচাক এরা, এদের হিম্মত নেই, নেই মুরোদ। যাদের তালপুকুরে ঘটি ডোবে না, তাদের ন্যাশনাল ছাড়া গতি নেই।

ঘটনাটা ঘটল অন্যভাবে! সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর প্রবাদপ্রতিম উপন্যাস 'প্রথম আলো'তে লিখেছেন, "সিঁদুরিয়াপট্টিতে একবার এক ধনীর বাড়ির পোষা হনুমান গৃহস্বামীর শয়নকক্ষ থেকে চুপিসারে একটি পেটিকা নিয়ে চিলের ছাদে উঠে পড়ে। সে ভেবেছিল অতি সযত্নে রক্ষিত এ পেটিকায় নিশ্চিত কোনও দুর্লভ সুখাদ্য আছে। কিন্তু পেটিকাটি খুলে আর নৈরাশ্যের অবধি থাকে না, ভেতরে রয়েছে শুধু গুচ্ছ গুচ্ছ শুষ্ক অখাদ্য কাগজ। পরম অবজ্ঞাভরে হনুমানটি সেই কাগজগুলি বাতাসে ওড়াতে থাকে। বলাই বাহুল্য, সেগুলি সব একশো টাকার নোট। সেই উড়ন্ত টাকা সংগ্রহ করার জন্য পথচলতি জনতার হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি, কাড়াকাড়ি এমন একটা পর্যায়ে চলে যায় যে, শৃঙ্খলা ফেরাবার জন্য পুলিশবাহিনী এসে পড়ে।... টাকা ওড়ানোর কথাটা সেই থেকে চালু হয়ে যায়। মনুষ্য শ্রেণীভুক্ত কেউ কেউ ওই হনুমানটির অনুকরণ করে। তখন গুর্মুখ রায় মুসাদ্দি নামে এক মাড়োয়ারি নন্দনের রকমসকমও ওই প্রকার ছিল। তার বাবা গণেশদাস মুসাদ্দি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং হোর কম্পানির প্রধান দালাল। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর আঠারো বছরের ছেলে গুর্মুখ বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। টাকার মূল্য সে বোঝে না, দুহাতে টাকা উড়িয়েই তার আনন্দ। ইয়ার-বকসি-মোসাহেবও জুটে যায় সহজে; সন্ধ্যের পর তারা সারা শহর দাপিয়ে বেড়ায়।

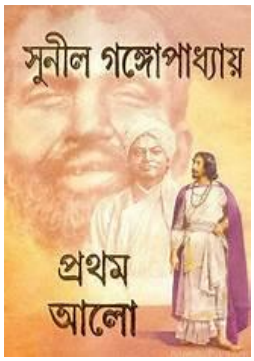

থিয়েটার-নাটকের তখন খুব রমরমা। গুর্মুখ তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে প্রায়ই থিয়েটার দেখতে আসে। তারা সংখ্যায় দশ-বারোজন হলেও টিকিট কাটে পঞ্চাশখানা। সামনের দু'সারিতে কেউ বসতে পারবে না, কারণ তারা ইচ্ছেমতো পা ছড়িয়ে দেবে, নেশার ঝোঁকে আধশোয়া হবে, যখন তখন বিকট চিৎকার করে উঠবে। গিরিশচন্দ্রের 'সীতাহরণ' নাটকটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। সীতার ভূমিকায় বিনোদিনী এক একখানি ফুলের গহনা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছেন, এক সময় মনে হয় সীতা যেন সম্পূর্ণ নিরাবরণ। সুরামত্ত অবস্থায় গুর্মুখ চেঁচিয়ে উঠল, ওই আওরাতের কত কিম্মত? ওকে আমার চাই।..."

বাংলা নাটকের ইতিহাস বলে, বিনোদিনী পালিয়ে, লুকিয়েও আত্মরক্ষা করতে পারেননি। গুর্মুখের পাগলামি যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে, জুহুরী একদিন তার দলকে বার করে দেয়। এর বদলা নিতে গুর্মুখ প্রতিজ্ঞা করে বসল, সেও এক নতুন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করবে, ন্যাশনালের মুখ ভোঁতা করে ছাড়বে। কিন্তু, সেই এক কথা, ওই আওরাত আমার চাই।

সেসময়ের অন্যান্য বারাঙ্গনার মতোই বিনোদিনীরও এক বাঁধা বাবু আছে, অ-বাবু। তিনি খুব আদর যত্নও করেন বিনোদিনীকে। তার বুক ফেটে যায়, সেই বাবুকে ছেড়ে আসতে, প্রত্যাখ্যান করতে! এদিকে দলের আর সকলে, এমনকি তার গুরু গিরিশচন্দ্র বারবার বলেন – বিনোদ বাংলা থিয়েটারের জন্য তুই কি এটা করতে পারবি না? গুর্মুখ কথা দিয়েছে নতুন থিয়েটার হবে, জুহুরীর সব খেলা সাঙ্গ, সেই থিয়েটার হবে আমাদের নিজেদের থিয়েটার... বিনোদ, তুই একটু কথা শোন, বিনোদ তুই একবার হ্যাঁ বল! বিনোদিনীর বুকে পাহাড় কাঁপে, বিনোদিনীর চোখের জলে সাত সমুদ্র উথলে ওঠে, কী করবে সে?

"সকলের অনুরোধে, বিশেষত গুরু গিরিশ ঘোষের কথায় পরের দিন গুর্মুখ এলে বিনোদিনী পরিষ্কার কণ্ঠে তাকে

বলে, ওগো বাবু, আমি থিয়েটারের মেয়ে। থিয়েটার ছাড়া বাঁচব না। তুমি যদি থিয়েটারের বাড়ি গড়ে দাও, তবেই তোমার সঙ্গে রাত্রিবাস করতে রাজি আছি। নইলে তুমি আমাকে কিছুতেই পাবে না।...

সবাই তাকে ধন্য ধন্য করতে লাগল এরপর। গিরিশবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন একটু দূরে। তাঁর ওষ্ঠে তির্যক হাসি। মনে মনে তিনি বললেন, "নদীর ওপর সেতু যখন গড়া হয়, তখন নাকি ভিতের ওপর একটি শিশুকে বলি দিতে হয়। নররক্ত না পেলে সেতু মজবুত হয় না। বাংলা নাটকের স্বার্থে তোকে আমরা বলি দিলাম, বিনোদ।" ('প্রথম আলো')

ইতিমধ্যে একদিন 'চৈতন্যলীলা' দেখতে এসেছিলেন পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ; বিনোদিনীর অভিনয় দেখে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করে গেছেন তাকে। ধন্য বিনোদিনী!

পরের ঘটনা – সেই অ-বাবুর বিনোদিনীকে হত্যা করার চেষ্টার মতো রোমহর্ষক কাহিনী, গুর্মুখের শর্ত মেনে নেওয়া আর নতুন বাংলা মঞ্চ তৈরি। বিনোদিনী দাসী চেয়েছিল তার নামেই হোক নতুন রঙ্গমঞ্চ। সকলে তাকে বোঝাল, সেটা উচিত হবে না, যত বড় অভিনেত্রীই হোক, সে তো আসলে একজন ইয়ে, মানে – বারাঙ্গনা! বেশ, তবে হোক বি-থিয়েটার। সেই কথা হ'ল। যারা গিয়েছিল রেজিস্ট্রেশন করতে, তারা ফিরে এল জয়ের বার্তা নিয়ে, কাজ হাসিল। স্থাপিত হয়েছে বাঙালির নিজস্ব নতুন রঙ্গমঞ্চ যেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে নাটক করতে পারবে তারা। কী নাম? কী নাম? বিনোদিনীর বুক কাঁপে! "স্টার থিয়েটার"। কেন? কেন?

তার সব কৃচ্ছ্রসাধন, সব প্রতীক্ষা, সব মূল্য, সবই কি বৃথা? গুরু গিরিশ ঘোষ এসে দাঁড়ালেন – বিনোদ, এখানে তুই-ই তো

স্টার, তোকে দেখতেই তো এত জনসমাগম, এত জনপ্রিয়তা। তুই আর এ নিয়ে কিছু বলিস না! না, আর কী বা বলার থাকে! মনে না নিলেও মেনে নিতে হয়। জনসাধারণের জন্যে বাংলা থিয়েটারের বিশাল ইমারত তিনি প্রায় একা হাতে গড়েছেন, শুধু অভিনয়কে ভালবেসে, শুধু থিয়েটারের জন্য।

এর কিছুদিন পরেই মঞ্চ ছেড়ে দিয়েছিলেন নটী বিনোদিনী, কিন্তু নিজের আত্মজীবনী 'আমার কথা' বইটিতে নিজের কথা আর বাংলার জনগণের থিয়েটারের আদি যুগের কথা বলতে গিয়ে সারা বই জুড়ে তাঁর জমাট কান্না ও অভিমান

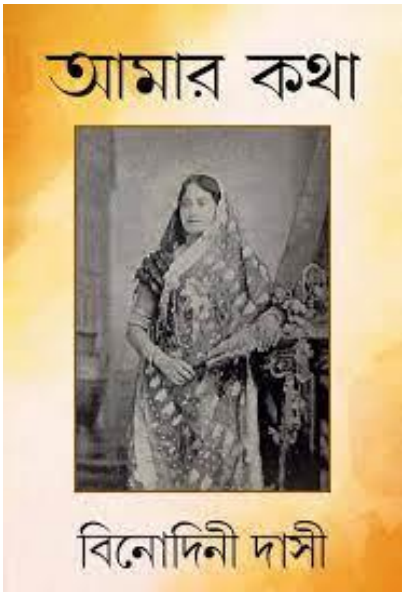

কালো কালির অক্ষরে ফুটে ফুটে বেরিয়েছে। আজ বাংলা থিয়েটার সমৃদ্ধ, ঐতিহ্যপূর্ণ ও জনপ্রিয়। এই থিয়েটারের আঁতুড় ঘরের দিনগুলিকে যেন আমরা বিনম্র শ্রদ্ধায় মনে রাখতে পারি। 'বাঙালির নাইটিংগেল' বিনোদিনী দাসীর মাথায় 'স্টার' মুকুটটি যেন জাজ্বল্যমান থাকে চিরদিন।

বনতামামি

অলোক কুমার চক্রবর্তী

লোহার জোড়া শিক সমান্তরালে বিছানো, রেলপথ যার নাম, টানা চলে গেছে মাটি-জঙ্গল-জলা-পাহাড়ের বুক চিরে – যতদূর দৃষ্টি ছড়াতে পারো তুমি। পথ টানা চললেও সবসময় তা সোজা চলেনি। কখনো ধনুকের মতো বেঁকেছে ডাইনে বা বাঁয়ে দরকার মতো। কখনো বা অল্পস্বল্প মোচড় মেরে চলা হয়েছে সর্পিল – পাহাড়ি এলাকায় উঠতে হলে। আর এই লৌহপথে গড়ায় যে লৌহযান্ত্রিক বাহন – রেলগাড়ি – তারই অনেকগুলি কামরার মধ্যে একটির ভিতর জানালার ধারে আসন নিয়ে বসে আছে শহুরে এক পথিক। সেই বাহন চলেছে তার নিজের মর্জিমতো, কখনো জোরে, কখনো ধীরে, কখনো বা থমকে থেমে। চলেছে সারাদিন – রুখু লাল কাঁকরমাটির জঙ্গলমহলের বুক চিরে – কিংবা একটু কান ঘেঁষে। তারই মাঝে কোথাও কোথাও মাটি ঘেঁষা সবুজের টুকরো – প্রান্তিক জনেদের মরিয়া প্রয়াস কিছু বা খাদ্যফসল ফলানোর। এই রুক্ষ, শুকনো কাঁকুরে জমিতে ওরাই বা বাঁচে কী করে – প্রশ্ন জাগে বুঝি মনে? তা, আছে না তারও ব্যবস্থা! ধরিত্রী মা তো সবারই মা – এই শাল-মহুল-পিয়ালের বন, তাতে বাস করা পাখপাখালি, ত্রস্ত হরিণ, দাঁতাল হাতি, কেঁদো ভালুক, বনশুয়োর, ভীতু খরগোশ, আর – আর ওই যে দু'পেয়ে জীব মানুষের দল – ধরিত্রী মায়ের সবচেয়ে চালাক-চতুর সন্তান – এই সবই তো তারই সন্তান! কাজেই এদের সবাইকে বাঁচিয়ে রাখার দায়ও তো তারই। তাই এই রুখু পাথুরে বেলে-কাঁকরেভরা জমির মাঝেও সিঁথি কেটে বইয়ে দিয়েছে আঁকাবাঁকা বয়ে চলা নানান সোঁতা – কোথাও তার নাম তমাল, কোথাও কুবাই কোথাও বা শিলাই। ওদিক পানে গেলে আরও অন্যদেরও পাবে – সোনা, ঝিরকি, অঞ্জন কতজনা! অপুষ্টিতে ভোগা তাদের বুকেই বা মধু কতটা? তবু তারই মাঝে তাদের সীমিত সামর্থ্য নিয়েও আপ্রাণ চেষ্টায় মাটিতে জল সিঞ্চন করে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সে ধারার খাত এককালে যে ভরন্ত শরীরের যৌবনবতী ছিল, বা চওড়া ছাতির সাজোয়ান – তা বোঝা যায় নদীখাতের প্রস্থ দেখেই। এই শুকনো শীতশেষের দিনে তাদের জল বয় বালুর চরা কেটে, পাথরের ফাঁক গলে, মূলখাতের মধ্যেও কয়েকটি উপখাতে। সহযাত্রী প্রান্তবাসী জনেদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মাটির ভাষায় মাটির কথা জানা যায় – "ই ত সুখা সুখা দেইখছ্যান। বর্ষাদিনে ই লদীই পাহাড়ি জল টান্যে লিয়ে ইমন ভাসাইঁ দিব্যাক ফুল্যে ফাঁইপ্যে উঠ্যা, যে আগুতে মানুষ ত মানুষ, গাড়ি ত গাড়ি, পাখর, গাছ যা কিছু পইড়ব্যাক, কিছু নাই মাইনব্যাক। সব ভাসাঞ্ লি যাব্যাক। ইয়ার রূপট তখুন দেইখতে হয় আজ্ঞা। চিহিনতে লাইরব্যান, হুঁ।"

হ্যাঁ, তা বটে, শোনা আছে হড়পা বানের কথা। তার ভরা রূপের কথা। সত্যিই এখনকার রূপ দেখে তা কল্পনাও করা যাবে না। কোথায় কতদূরে কখন কোন পাহাড়ে বৃষ্টি হ'ল, ক'ঘন্টা পর সেই জল আরও নানান ধারার সঙ্গে মিলে মিশে হঠাৎ লালচে ঘোলা জলের আচমকা তোড় হয়ে সব উড়িয়ে-ধুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। কিছু পরেই আবার শান্ত নরম রূপ। তবে ভরা বর্ষায় মোটামুটি সদাই ভরা।

এ তো গেল নদীর কথা, জলের কথা। আর জঙ্গলের শাল-মহুল-পিয়াল-পাকুড়েরা? পুরনো সবুজ পাতারা আয়ু শেষে এখন হলদেটে হয়ে ঝরে পড়ার অপেক্ষায়, অনেকটা ঝরেও গেছে। জঙ্গলের পথে গাছের গা হাতে নয়, মন দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও যদি, শুনতে পাবে সে পাতাদের দীর্ঘশ্বাস – ছড়িয়ে আছে, মিশে আছে বনের বাতাসে। ওদিকে গাছের মনে পাতাঝরার কষ্টের মধ্যেও উঁকি মারে শীতের আবেশের ঘোমটা সরিয়ে নতুন পাতার কলি ফুটবার খুশি।

শকট তো চলেছে চলতে চলতে, থামতে থামতে। কত সব মনকাড়া নাম সেসব বিরতি-বিন্দুর! চন্দ্রকোণা, গোদা পিয়াশাল, জঙ্গলমহল, ভাদুতলা, পিয়ারডোবা – আরও কত কী! এরই মাঝে কোথাও কি লুকিয়ে আছে দিকশূন্যপুরও? কে জানে? গাড়িতে বসে ওপর ওপর ছুঁয়ে চলে যাওয়ায় মন ভরে না মোটেও। মাটি বড় টানে। মাটিকে না ছুঁলে, গাছ-জল-ঝরাপাতাদের না ছুঁলে কি আর বোধ আসে? চলার পথের অনুমতিপত্র তো নেওয়া আছে অনেকটা দূর অবধি। তাতে কী? ছকে বেঁধেই চলতে হবে নাকি? অতএব, চলো রে মন মনের টানে। এক জায়গায় এসে হঠাৎ মনে ধরে গেল চারপাশটা। তখনি ঝোলা উঠল কাঁধে, পা চলল পথে। হাঁ হাঁ করে ওঠেন হিসেবি মানুষজন, "আপনার স্টেশন তো এখনো অনেক দেরি! এখানে নামছেন কেন? এটা তো আপনার জায়গা নয়!"

কী করে যে বোঝানো যায় কোন জায়গা কার! তোমার মন যেখানে বসতে চাইল সেটাই তো তোমার আবাস! ঠিকানা ধরে চললে তো চলা হয় না, পৌঁছানো হয়, আর পৌঁছে থেমে যাওয়া হয়। তাই শুধু একটু মুচকি হেসে, "ঠিক আছে, দেখাই যাক না একটু" – বলে সঙ্গ ধরা গেল দুই মাটির মানুষ প্রান্তবাসীর। ক'ঘন্টা পথ চলাতেই আলাপ জমে গেল, নিমন্ত্রণও হয়ে গেল এমন ঘরের ভাষায় – তা চলাই যাক না কয়েক কদম একসাথে! দেখার জন্যই তো পথে বার হওয়া। হয়তো বলবে, তা বলে একেবারে অচেনা মানুষের সঙ্গে, একদম অচেনা জায়গায়! তবে বলি, সারাজীবন একসঙ্গে কাটিয়েও কি কাউকে পুরোপুরি চেনা যায়? আর জায়গা? সে তো সমস্তটা মিলে একটাই জায়গা – এই পৃথিবী – একটাই। তবু তো তার একেক জায়গায়, একেক ঋতুতে একেক রূপ। আর মাটির গন্ধ, তিরতির বয়ে চলা জলের গন্ধ, ঘোমটা সরিয়ে সদ্য চোখ মেলা পত্রকলি – সবার গন্ধই তো নতুন!

শহর আজকাল থাবা বসাচ্ছে তো সর্বত্রই। এগিয়ে এসে টান মারছে গাঁয়ের আঁচলে। আব্রু খসিয়ে গয়না পরে গাঁ হয়ে যাচ্ছে শহর – একের পর এক। তারই মধ্যে এই এলাকাটা কেমন করে যেন বাদ পড়ে গেছে। তাই বার হয়ে আসতেই মেঠো সুবাস পাওয়া গেল। এখন কত কত যন্ত্রবাহন চারিদিকে – কেউ ডিজেল-পেট্রোলে চলে, তো কেউ গ্যাসে, কেউ বা আবার ব্যাটারিতে। কিন্তু এই ভুঁয়ে কোনো যন্ত্রবাহন দেখা গেল না। আছে তিনচাকার ভ্যানরিকশা গোটা দু'তিন। না থাকলেই বা ক্ষতি কী ছিল? কিছুদূরে আছে নাকি বাসরাস্তা। রাঙাধুলো উড়িয়ে দাপিয়ে ছোটে নাকি এক মুলুক থেকে আরেক। তা থাক তার দাপট তার জায়গায়, কিন্তু মঞ্জুরি মিলল না পুরো পথ হেঁটে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। পাঁচজনের অংশীদারি ঠাঁইয়ে পা ঝুলিয়ে বসে রওনা দেওয়া গেল। রোদ্দুর এখন একটু হেলতে শুরু করেছে, রোদের তাত একটু নরমের দিকে, একটু শিরশিরে ভাব বাতাসে। হলদেটে সবুজ পাতায়মোড়া জঙ্গলের মাঝখান চিরে গিয়েছে পথ। গাছের গোড়ায় গোড়ায় পোড়া পাতার স্তূপ। ঝরে যাওয়া পাতা জ্বালিয়ে দেওয়া এক শৃঙ্খলাগত অভ্যাস চিরকালের। ভূমি পরিষ্কারও হ'ল ফলপাকুড় কুড়োনোর জন্য, আবার জমিতে সারও হ'ল ছাইয়ের। তাছাড়া, আগুনের তাপে গর্তের ইঁদুর, সজারু, খরগোশ এসব বেরিয়ে এলে তার মাংস খাওয়া হ'ল, আবার সাপখোপ জাতীয় ত্রাসের ব্যাপার থাকলে তা থেকেও মুক্তি। এসব বাপ-পিতেমোর থেকে পরম্পরায় পাওয়া শিক্ষা বেঁচে থাকার জন্য।

দু'পাশে জঙ্গল রেখে পথচলা হঠাৎই যেন চলকে উঠে চমকে দিল। বেশ কিছু দূরে পথ আড়াআড়ি কেটে মাটির খুব কাছ দিয়েই উড়ে যাচ্ছে যেন বলাকার সারি! লালচে পা, সাদা ডানার ফ্লেমিংগো পাখির ঝাঁক? এখানে? এত নীচ দিয়ে? চমক লাগলেও ঘোর কাটতে সময় লাগে না। ওরা ইস্কুলের ছাত্রী, ইস্কুল পোশাকেই সাইকেল সওয়ার হয়ে পঠন-পাঠন শেষে ফিরছে বাপ-মা'র নিরাপদ আশ্রয়ে। তাদের নিম্নাঙ্গের পোশাকের রং লাল, গায়ে সাদা জামা। চলেছে কলকলিয়ে, নিজেদের মধ্যে নানা কথার উচ্ছল বান ছুটিয়ে। ডানদিকে বহু দূরের ইস্কুল সেরে এই রাস্তাটিকে আড়াআড়ি কেটে ওরা ঢাল বেয়ে নেমে গেল বাঁদিকে, আরও দূরে থাকা ওদের গাঁয়ের পানে। রেশ রেখে গেল যা – তা কি উড়ে যাওয়া বলাকার কলকাকলি, নাকি ঝর্ণার উচ্ছল কলতান?

আরও কিছুদূর এগিয়ে এবার ভ্যানরিকশা ছেড়ে দেবার পালা। এপথ তো গেছে সুমুখ দিশায়। তাকে ছেড়ে পা বাড়াও বাঁয়ের লাল মোরাম পথে। দু'পাশের গাছেরা আরও গা ঘেঁষে এসে ঝুঁকে পড়ে ছুঁয়ে দেখতে চাইছে মনে হয় আলাপ করার ইচ্ছেয়। পাতায় পাতায় ফিসফিসানি, শিহরণ তাদের নরম ডালপালায়। অদ্ভুত রোমাঞ্চ জাগে মনে, বৃক্ষরাজির এত ঘন আতপ্ত নিঃশ্বাসে। এই ওপর ওপর শুকনো, লালচে বালি-কাঁকরভরা মাটিতেও গাছেরা কেমন প্রাণবন্ত, সতেজ, সবুজ। শিকড় ছড়িয়ে যায় মাটির গভীরে। আহরণ করা মধুরস জারিয়ে যায় শিরায় শিরায়, পাতায়-ফুলে-ফলে। মধুপেরা মাতাল হয় শাল-মহুয়া-কুসুম ফুলের মধু পান করে। নেশায় নেশায় উড়ে বেড়ায় ফুল থেকে ফুলে, জীবনচক্রের নিয়মে ফুলে ফুলে ঘটে পরাগমিলন, তা থেকে পূর্ণতা লাভে ফল-বীজ-মাটি-বৃক্ষশিশু। এ এক অপরূপ কাব্যকথা। এই কাব্যের রস আস্বাদন করতে হলে বৃক্ষ হও নিজে।

চলতে চলতে ক্ষণিক ছেদ পড়ে পথ চলায়। জঙ্গলের সাময়িক বিরতি। আর সেই বিরতি চিহ্নেই মানুষ খুঁজেছে বসত। চোখে মনে শান্তি এনে দেওয়া নিকানো উঠোন, হাতের আঙুলের ছোঁয়া পরম মমতায় বেয়ে উঠেছে কুটিরের মাটির

দেয়াল আলপনায় সাজিয়ে | পোয়ালের ছাউনি | পাশে বা পিছনে গোয়ালঘর কিংবা ছাগল-মুরগির খোঁয়াড় | কারও বা উঠোনেই | এইসব সংসার-সাথীদের সজীব গন্ধে ভরা চারিদিক | এতক্ষণের গাছ-পাতা-ফুল-রসের গন্ধ ছেড়ে এ আবার অন্য বাসনা | গাঁয়ে থাকা প্রান্তীয় জনেদের চোখের ভাষা ক্ষণিক প্রাথমিক যাচাই-জানকারির পরই বেঁধে ফেলে সহজ সরল আত্মীয়তার বাঁধনে | সন্দেহের, কুটিলতার, অবিশ্বাসের বীজ তো বোনে ভদ্র-সভ্য-শিক্ষিত জনেরাই | মুখোশ খুলে রেখে সোজা মানুষের মুখ নিয়েই বসো না এসে মানুষের মাঝে | আলাপ চলে, কথার স্রোত চলে নিজের ছন্দে | মাটির কথা, জঙ্গলের কথা, মানুষের কথা, টুসু-ভাদু নানান গল্পকথা, আদ্যিকালের কথা – এর কি শেষ আছে? কথা বয়ে যায় নানান ধারায় | দিনের আলো ঢলে, শেষ শীতের হাওয়ায় শিরশিরানি বাড়ে | জঙ্গলের ঝোপঝাড়ে ঝিঁঝিঁ পোকার অবিরাম সঙ্গত | চারপাশের গাছপালায় পাখপাখালির কলকাকলি বাড়ে | সারাদিনের ওড়াউড়ি, খাবার খোঁজা শেষ করে এবার একটু জুড়োনোর পালা – ডালের খাঁজে, পাতার আবডালে নিশ্চিন্ত নিরাপদ আসনটুকুতে রাতের মতো গুছিয়ে বসা ডানার মধ্যে ঠোঁটটি গুঁজে | তারই মধ্যে কত ঝঞ্ঝাট | জায়গা নিয়ে ঠেলাঠেলি, সঙ্গিনীর পাশের জায়গাটা বেদখল করল কেউ, ছানাপোনাদেরও খোঁজখবর করা – কিচিরমিচির কলতানে নিঝুম জঙ্গল এই বেলাশেষে মুখর | খানিক দূরেই আছে নাকি বহতা জলের ছোট এক স্রোতস্বিনী | কাজকর্ম থেকে পুরুষ-নারী, তরুণ-যুবতী নানাবয়সী জন ফেরে দল বেঁধে – স্রোতের জলে সারাদিনের ক্লেদ, মালিন্য সব ধুয়ে | তাদের মিলিত কলতানে ভরে ওঠে ঘর গেরস্থালিও |

সন্ধ্যা নামে | সুয্যিদেব ওপাশের বিশাল বিশাল শাল-মহুয়া-পলাশ-কুসুম-অর্জুন-শিমুলের উঁচু উঁচু মাথা ছাড়িয়ে আরও পিছনে যে কালচেরঙা হাতির পিঠের মতো পাহাড়রাজি দেখা যায় – তারই পিছনে বিশ্রামে গেছেন আজকের মতো | কিন্তু আঁধার নামতে নামতেও নামে না পুরোপুরি | রাতের আকাশের দখল নিয়েছে আরেক অধিপতি – মায়াবি আলোয় ভরেছে চারিদিক – ফেনিল জোছনায় ভেসে যাচ্ছে চরাচর, এই বসত, এই বনমহল | রাত গড়ায়, সারাদিনের ধকল, উদ্বেগ, উত্তেজনা, বঞ্চনা – সব ভাসিয়ে দিয়ে নতুন শ্বাস নিয়ে তরতাজা হয়ে উঠতে প্রয়াস পায় সর্বজন | গোটা দিন খেটেখুটে জোগাড় করা রসদ মিলিয়ে ব্যবস্থা হয় পরিবার-পরিজন-অতিথি সবার জন্যই ক্ষুন্নিবৃত্তির | আহা, কী তৃপ্তি তার আয়োজনে ও গ্রহণে | তার আগেই মায়াবী জ্যোৎস্নার মাতালকরা মায়ায় সুর ওঠে গলায়, তাল ওঠে ঢোলকে, ছন্দে দোলে শরীরও – কাঠ সাজিয়ে ধরানো আগুনের লীলায়িত শিখাকে ঘিরে | মহুয়ার সফেন মমতা তীব্র ঝাঁঝ নিয়ে গলা দিয়ে নেমে যায় কোন অন্তঃস্থলে | ফিনকি জোছনায় ভেসে যাওয়া চরাচরে এ অনিন্দ্য সুখাবেশ আকণ্ঠ ডুবিয়ে নেয় সমস্ত চেতনা | মহুয়ায় মাতাল হয়েছে বুঝি ঢোলকও | তার উদ্দাম তাল মাতিয়ে দোলায় চিকন কালো সুঠাম শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উছল ছন্দে | এর সুর বুঝিবা সেই আদিম দিনের মতোই অবিকল – সেই ধরণী যখন তরুণী ছিল | আজও বুঝিবা তার প্রকৃতি একই | সময় গড়ায় রাতের পানে | নিঝুম হয় দশদিগন্তের সবক'টি বিন্দু | রুপোলি জ্যোৎস্না বুঝিবা বিষণ্ন হয় একটু | কোথা থেকে ভেসে যাওয়া এক টুকরো ছেঁড়া মেঘ টেনে গায়ে লেপ্টে নিয়ে হু হু কাঁপে শীতে গরিব চাঁদ একা ওই বনমহলের মাথায় | নীচের কাঠের আগুন তার সমস্ত উদ্যম নিংড়ে নিঃশেষ করে এখন ঝিমোচ্ছে আংরায় ছাইচাপা হয়ে | তবু তারই ওম নিয়ে তাকে ঘিরে গুটিশুটি ক'টি সারমেয়র সঙ্গে বেতাল শুয়ে জনা দুই উদ্দাম নাচিয়েও | এই খোলা হাওয়ায় মনমাতানো সুরে তালে শরীর মন মিশিয়ে উত্তাল ছন্দ-লহরের পর মন বুঝি আর বাঁধা পড়তে চায়নি ঘর নামক অমন ঘেরাটোপের চৌহদ্দিতে | মাটিতে পোঁতা চারটি শালবল্লির ওপর কাঠের তক্তা ঠোকা, তার ওপর বিছানো নতুন খড়ের ওম | হালকা কম্বল জড়িয়ে, ছাউনির ফাঁক গলে উঁকি মারা জ্যোৎস্নার আদর নিতে নিতে অসীম তৃপ্তিতে মন ভেসে যায় ময়ূরপঙ্খী নাওয়ে সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পার |

হলদেটে লাল মিঠে আলো নিয়ে নতুন সকালে দেখা দেন সুয্যিদেব | বসতে শুরু হয়ে গেছে কর্মব্যস্ততা নতুন দিনের সূচিতে – আবার সমস্ত দিনের জন্য তোড়জোড় রুটিরুজির তাগিদে – হয় একশো দিনের কাজে মাটি কাটা বা পাথর বওয়া, নয়তো জোটাতে হবে অন্য কিছু | পেটে তো দিতে হবে যেভাবে হোক জোগাড় করে |

নতুন দিন শুরু হয় | আবার পা পড়ে পথে | অসীম মমত্বে মন বাঁধা পড়ে থাকে গত বিকেল-সন্ধে-রাতের উষ্ণ

সান্নিধ্যে | আবার চরৈবেতি | সূর্যদেব আড়মোড়া ভেঙে উঠতে উঠতে যখন খানিকটা তেরছাভাবে আলো ও তাপ ছড়াতে শুরু করেছেন, তখনই মাইল দুয়েক দূরের বড় রাস্তায় রাঙাধুলো উড়িয়ে এক 'দিকশূন্যপুর' থেকে প্রচণ্ড তাড়া নিয়ে এসে হাজির হল 'আশীর্বাদ' বাস – মুহূর্তে দাঁড়ানো সকলকে পেটে পুরে আবার ছুটতে শুরু করল এক 'নেই-ঠিকানার' দিকে | পেছনে পড়ে রইল কত কথা, কত অনুভূতি, কত আক্ষেপ, কত আনন্দ-হাসি-গান – সবই উপচে দেয় মনের কোণ, চোখের কোণও | সরলমতি সেই প্রান্তজন কত সরল বিশ্বাসে মেনে নেয়, সয়ে যায় নীরবে সমস্ত প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসভঙ্গ, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি | বনের যে গাছপালা তাদের সমস্ত জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে – তার ফল, বীজ, ফুলের মধু, গাছের কষ, পাতা, কাঠ, গাছে বসা পাখি – এই সবই তো তাদের প্রাত্যহিক জীবনের, জীবনধারণের অঙ্গ | শহুরে অর্থ ও ক্ষমতাবান মানুষের লোভের থাবা কেড়ে নিয়েছে তার অনেকটাই | বনের পুনঃসৃজনের আশ্বাসে গড়ে তোলা হয়েছে ইউক্যালিপ্টাস, আকাশমণির নিষ্প্রাণ জঙ্গল – গাছে হয় না কোনো খাদ্যোপযোগী ফল-ফুল, রিক্ত চেহারার গাছে বাসা বাঁধে না কোনো পাখি, যার মাংস, পালক ওদের কাজে লাগতে পারে | মাটি হয়ে যায় শুকনো, খটখটে, গাছের কাঠও লাগে না নিজেদের কোনো কাজে | তবে হ্যাঁ, শোনা আছে এর থেকে নাকি বড় কারখানায় তেল বার হয়, কাগজ তৈরি হয়! কিন্তু সে তো শহরের লোকেদের জন্য | ওদের প্রান্তীয় জনেদের জীবন তো তাতে চলে না! এসমস্তই মন খারাপের কথাবার্তা |

পথ চলেছে পলাশের গাঢ় জঙ্গল ভেদ করে | ফুল ফোটার সময় আসি আসি করছে | লাল পলাশের বন্যায় চরাচর ধুয়ে যাবে তখন | সে রূপ পাগলের মতো টেনে আনে মানুষকে ঘরের বাইরে, ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায় | তার আগাম মাদল-বোল হৃদ-গহীনে বাজতে থাকে 'দিদিম-দিম'|

বার্ন আউট

বিষ্ণুপ্রিয়া

১

একটা অপরাধ বোধ কাজ করে অপালার | এত করেও মন খচখচ করে | হয়তো যথেষ্ট করতে পারছে না | কিছু না কিছু ত্রুটি থেকেই যাচ্ছে | অপালার এই সিন্ড্রোম থেকে বেরিয়ে আসা খুব দরকার, তা না হলে স্বাভাবিক জীবনযাপন অসম্ভব | মাইগ্রেন লেগেই থাকে, ঘুম তো প্রতিদিন ৩-৪ ঘন্টার বেশি হয়ই না | কয়েক সপ্তাহ ধরে সিস্টলিক বেশ ওপরের দিকে আর সুগারও হাই | আর্থরাইটিসে ডান হাঁটুটাও খুব জ্বালাচ্ছে | পেইন কিলার খেয়েও কমে না | মাঝে মাঝে মনে হয় প্রেশার কুক হচ্ছে টিকিং টাইম বম্ব | অপেক্ষায় আছে, এই ফাটল বলে |

ছোটবেলা থেকে এক ধরনের পারফেকশনিস্ট বোধ তাড়া করে অপালাকে | আশ্চর্য, বাবা মা কিন্তু কখনো কোনো চাপ দেননি; তাঁরা খুব লেইডব্যাক ছিলেন | বেস্ট হবার বা করার তাগিদ ওর নিজের মধ্যেই রাজত্ব বিস্তার করেছে | জীবন যে নিজের তালে চলে, সে কেউ কিছু অ্যাচিভ করুক বা না করুক, সে কথা অপালাকে কোনদিন বোঝানো যায়নি | অপালা এই স্বরচিত আবর্তের মধ্যে তাই ঘুরেই চলেছে |

বছর দুয়েক আগে তথাগতর বাবা অসুস্থ হলেন | তখন থেকে এটা আরো বেড়ে গেছে | বাবার কেয়ার গিভিং-এ যেন কোনও ভুলত্রুটি না হয় | সকালের চা, জলখাবার, লাঞ্চ, বিকেলের চা, ডিনার সব ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় – এক মুহূর্ত এদিক ওদিক হবার জো নেই | সকাল ৭টায় চা আর দুটো মেরি বিস্কুট, ৯টায় একটি ডিমের সাদা দিয়ে লবণ ছাড়া জলপোচ ও ছোট্ট এক বাটি বাড়িতে বানানো লো ফ্যাট দুধের ছানা, ১১টায় একটা আপেল টুকরো করে কাটা, ১টায় মেয়ো বাদে নিজের হাতে তৈরি করা চিকেন স্যান্ডউইচ, স্যালাড এবং লো ফ্যাট দই, ৪টেয় চা এবং একটা ক্র্যাকার, ৭:৩০-৭:৪৫ এর মধ্যে এক পিস গ্রিল্ড বা বেকড তিলাপিয়া, স্যামন বা ফ্লাউন্ডার, একটা হাতেগড়া আটার রুটি অথবা খুব অল্প কালোজিরা চালের ভাত, অল্প ডাল আর কোনো একটা হালকা তরকারি (ফুলকপি কক্ষনো নয়) | প্রেস্ক্রিপশন অনুযায়ী ঠিক সময়মতো ওষুধ দেওয়া | অপালা যেন এক 'নারীবটে' পরিণত হয়েছে, অনেকটা অ্যালেক্সা আর সিরির

মতো, ভুলচুক নেই তৎপরতায়।

২

চাকরি ছাড়তে মানা করেছিল তথাগত, কিন্তু অপালা বলেছিল "পারবই না সবদিক সামলাতে। বাবার দেখাশোনা করব কী করে? না কাজে মন দিতে পারব, না বাবার দেখাশোনা ঠিকমতো হবে। উনি সেরে উঠলেই ফিরে যাব ওয়ার্কফোর্সে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তথাগত ভেবেছিল চাকরি যেন হাতের মোওয়া, চাইলেই পাওয়া যায়। অফিস হা-পিত্যেস করে ওরই জন্য বসে থাকবে যেন। এই অনিশ্চিত বাজারে অবিবেচকের মতো দুম করে রিজাইন করার কোনো মানে হয়? যদি অফিস ডাউন সাইজ করে ফায়ার করত, তবে স্টেটের আনএমপ্লয়মেন্ট পাবার আশা থাকত কয়েক মাস। এমন একটা বয়স যে সোশ্যাল সিকিউরিটির বেনিফিটও পাবে না। তাছাড়া কাজ একটা থেরাপি; কত বিভিন্ন মানুষের সাথে আদান প্রদান, কতকিছুর সাথে মানিয়ে গুছিয়ে চলা। বেশিদিন এক জায়গায় কাজ করলে কর্মক্ষেত্র পরিবারের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। অপালার প্রায় ২২ বছর হয়ে গেল। হঠাৎ বাবার মিক্সড ডিমেনশিয়া ওকে কীভাবে যে ট্রিগার করল, বুঝে উঠতে পারছে না তথাগত। সবচেয়ে দুশ্চিন্তার ব্যাপার সবাই জানে এ রোগ সারে না।

অপালার মতো একগুঁয়ে মানুষকে নিয়ে ঘর করা সহজ নয়। এভাবে কেরিয়ার জলাঞ্জলি দেবার কোনো কারণই নেই। কিছু বলারও নেই। বললে শুনবেও না। একমাত্র ছেলের কথাই বেদবাক্য। আগামী বছরের শেষে তথাগত রিটায়ার করবে ভেবেছিল, বহুদিনের ইচ্ছে নিজের সামান্য entrepreneurship শুরু করার; মাঝখান থেকে সেটা আর সম্ভব নয়। সংসার চালাতে গেলে অনেক কিছু অপছন্দ বা অসুবিধা হলেও মেনে নিতে হয়।

ভাগ্যিস দেবজিতের কলেজ গ্র্যাজুয়েশন, মাস্টার্স, পিএইচডি, পোস্ট ডক সব শেষ হয়ে গেছে। তাও কারনেগি মেলন-এর মতো জায়গা থেকে। খুব গর্ব হয়। দেবজিত অবশ্য মায়ের মেধা পেয়েছে তা জানে তথাগত। ভাল চাকরিও পেয়ে গেছে। এখন কিছু পাঠালেই আত্মসম্মানে লাগে ছেলের। ব্যাসকিং রিজের এই বাড়ির মর্টগেজও দেওয়া হয়ে গেছে ভাগ্যবশত।

অদ্ভুত সব ভাবনাচিন্তা অপালার। সবসময় তথাগতর কাছে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে তার মূল্য আছে এই পরিবারে। কখনো চাকরি করে, কখনো বৃদ্ধ বাবার সেবা-যত্নের সম্পূর্ণ ভার নিয়ে নাওয়ানো, খাওয়ানো, অল্প হাঁটানো, ঠিক সময়ে ওষুধ দেওয়া – সব একা হাতে করে, কারুর ওপর দায়িত্ব দেবে না। স্বামীর কাছে স্ত্রীর মূল্য কি এভাবে হয়? বুঝতে পারে না তথাগত!

৩

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল অপালা। তথাগত ছোট্ট এক বিরক্তিসূচক শব্দ করে পাশ ফিরল। নাইটস্ট্যান্ডে রাখা ওর অ্যাপল ওয়াচে অপালা দেখল ৩:৩০। ঘুম ভেঙে গেছে ডাকাডাকিতে। মোটামুটি রোজই এইসময় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়, রুটিন মাফিক।

শ্বশুরমশাই হুইলচেয়ারে বসে আছেন। নিচের তলায় সানরুমটা ওঁর সুবিধেমতো পুরোপুরি বদলে নেওয়া হয়েছে। বৃদ্ধাবস্থার বিশেষ প্রয়োজনগুলি মাথায় রেখে লাগোয়া একটা বাথরুম তৈরি করা হয়েছে। সানরুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির নিচে হুইলচেয়ারে বসে উনি ডেকে যাচ্ছেন অপালাকে।

- "অপু, ও অপু, কোথায় তুমি অপু? আমার তো কোনো খাবার নেই। কী খাব তাহলে?"

- "এখন তো অনেক রাত বাবা।" সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল অপালা।

- "সবাই কোথায়? কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। কী করছে সবাই?"

অপালা একই উত্তর রোজ দেয়, তাই দিল, "তথাগত ঘুমোচ্ছে, পিটসবার্গে জিত তার গার্লফ্রেন্ড মিশেলের সাথে নিজস্ব অ্যাপার্টমেন্টে এত রাতে নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে। রিচমন্ডে ননদ সুরঙ্গমা আর সৌমিত্র ভালই আছে; আর ওদের মেয়েরা তিন্নি ও রিমি কলেজের ডর্মে ঠিক আছে।"

- "আর নীলিমা? নীলিমা কোথায়?"

- "মা তো নেই বাবা। ছ'বছর হয়ে গেল। আপনি তো জানেন সব।" সামনে ঝুঁকে ওঁর হাতদুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিল অপালা।

- "হ্যাঁ, তাই তো। ঠিক বলেছ। তোমার সব মনে থাকে জানি। আচ্ছা আমি এখন কী করব অপু?"

- "ঘুমিয়ে পড়ুন এবার। আর কয়েকঘন্টা শুলেই সকাল হয়ে যাবে। চলুন, বিছানায় শুইয়ে দিই আপনাকে।"

- "আর তুমি? তুমি কী করবে?"
- "আপনি শুয়ে পড়লেই, আমিও শুয়ে পড়ব।"
- "চোখ বোজার আগে ওই গানটা একবার শোনাবে না মা?"

অপালা জানে বাবা কোন গান শুনতে চান প্রতি রাতে – "চিরসখা হে ছেড়ো না মোরে..." চোখ মুছে হুইলচেয়ার ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে অপালা বলল, "এখন গাইলে যে আপনার ছেলে উঠে পড়বে। কাল ওকে সকাল সকাল কাজে বেরোতে হবে। আমরা বরং দুপুরে যখন ক্রসওয়ার্ড সল্ভ করব, তখন গাইব, কেমন?"

ঠিক ওই মুহূর্তে ওঁর মনে হয় উনি তো বাবা এবং সবাইকে ভাল রাখার দায়িত্ব ওঁরই। জিভ কাটলেন, যেন ভীষণ ভুল করে ফেলেছেন। দু'চোখে শিশুসুলভ হাসি, দুহাত জড়ো করে "সরি, ভেরি সরি" বলে হুইলচেয়ারে বসে সানরুমের দিকে মুখ ঘোরালেন।

- "আমি শুতে যাই। তুমি কিন্তু রাত জেগো না অপু, শুয়ে পড়ো। বাবলা খুঁজবে তোমায় পাশে না দেখলে। ছি ছি কী ঝামেলা রাত দুপুরে!"

প্রতি রাতে মায়ায় ভেসে যায় অপালার বুক। ডিমেনশিয়া আর অলজাইমার বড় নিষ্ঠুর। উনি এখন সেই ছোট্ট দেবজিতের থেকে কোনোভাবেই আলাদা নন। জিতও মাঝরাতে নিজের ঘর ছেড়ে গুটি গুটি পায়ে অপালার বেডরুমে এসে পুচকে হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ত। কিন্তু ডিমেনশিয়া প্রোগ্রেসিভলি খারাপ হয়, মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ঘুমের তপস্যা করা এখন বৃথা। তাই উল-কাঁটা নিয়ে বসার ঘরের রিক্লাইনারে বসল। চারদিকের গাছেরা হেমন্ত ঋতুর নানা রঙে সেজে উঠেছে, অন্ধকারের মধ্যে বসেও কথাটা মনে এল। ঝপ করে শীত এসে পড়বে। কেন যেন বরফ দেখলে বাবা আরো বেশি করে গান শুনতে চান। হয়তো মা'র অভাব বোধে বিষণ্ন হয়ে পড়েন।

৪

বাবার ডিনার শেষ। এবার টিভির সামনে বসবেন কিছুক্ষণ। কী দেখেন, কী বোঝেন কে জানে! পর্দায় শুধুই যুদ্ধের রক্তাক্ত ছবি, তাই চ্যানেল ঘুরিয়ে ছোটদের কার্টুন চ্যানেল চালিয়ে দেয় অপালা। মাঝে মাঝে ওদের কান্ডকারখানা দেখে হাসেন। হয়তো ভাল লাগে।

ড্রাইভওয়েতে একটি উবার এসে থামল। কারুর কি আসার কথা ছিল? মনে পড়ছে না তো!

- "হাই, হাউ আর ইউ মিমা?"
- "ওমা মিশেল যে! হাই মিশেল। হোয়াট এ সারপ্রাইজ!"
- "তোমাকে সারপ্রাইজ না দিলে তো প্রশ্নের ভারে কুপোকাত করে দেবে।" দেবজিত হেসে মাকে জড়িয়ে ধরল। পেছন থেকে মিশেলও এসে হাগ করল।
- "বলিসনি তো! জানা থাকলে তোর আর মিশেলের পছন্দের চিকেন বিরিয়ানি বানিয়ে রাখতাম। এখন এই বেকড ফ্লাউন্ডার আর স্যালাড খেতে হবে।"
- "আমরা এয়ারপোর্টে ডিনার করে এসেছি মম। কাল মনের সুখে বিরিয়ানি বানিয়ো।"
- "থেকে যা না ক'টা দিন বাবাই, পুজো অবধি; রাইট মিশেল?"
- "দ্য প্ল্যান ইজ আনটিল টিউসডে, মিমা।" আবার এসে জড়িয়ে ধরল মিশেল।
- "কাল পিপা আর পিসোও আসছে, বুঝলে? একসাথে জমজমাট উইকএন্ড কাটানো যাবে অনেকদিন পর। উই উইল মিস দ্য গার্লস দো!"

অপালা আশ্চর্য হ'ল যে সবাই মোটামুটি ওর অজান্তেই দারুণ সব প্ল্যান করে ফেলেছে। কিন্তু কী ভীষণ যে আনন্দ হচ্ছে সুরঙ্গমা আর সৌমিত্রও এসে পড়ছে বলে। আহা! ভাগ্নী দুজন বড্ড দূরে, বার্কলের ডর্মে। একজন ব্যস্ত কমপিউটার সায়েন্স নিয়ে, আর অন্যজন ইকনোমেট্রিক্স এবং কোয়ানটেটিভ ইকনমিক্স নিয়ে। খ্রীষ্টমাসের আগে দেখা হবে না ওদের সাথে। তিন্নি, রিমি এলে আনন্দ ধরত না।

৫

সবাইমিলে বিরিয়ানি, টিক্কা কাবাব আর রায়তা খাওয়ার আনন্দই আলাদা। খাবার ঘরের বড় টেবিলের চারপাশে আড্ডা বসল কতদিন পর। এখন এ বাড়িটা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে বাবার অনেক হারিয়ে যাওয়া শব্দের মতো। আজকাল এমন হাসিঠাট্টা, ইয়ার্কির বড় একটা সুযোগ হয় না। রোজকার এই নিথরতা যেন গিলে খেতে চায় সবাইকে।

- "নাউ উই অল নীড টু হ্যাভ দ্য টক।"

জিত সারাক্ষণ সবাইকে নিয়ে যতই ইয়ার্কি ফাজলামি করুক না কেন, ওর এই গলার স্বর অপালা চেনে। অপালা আন্দাজ করতে

পারে কী আলোচনা করতে চায় বাবাই | যার পিএইচডি এবং পোস্ট ডক কগনিটিভ নিউরলজিতে, সে যখন ডিমেনশিয়া বা অলজাইমার্স নিয়ে কিছু বলে, তখন সব কিছু ভুলে তার দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হয়| ধরতে পারে মিশেলের মলেক্যুলার নিউরোসায়েন্সের এক্সপার্টীজও সহায়ক হবে বলেই এই যৌথ প্ল্যান সবাইকে নিয়ে | চিরকাল বাবাই এক অদ্ভুত কম্বিনেশন, প্রচন্ড কৌতুকরসে টগবগ করছে আর তার পরক্ষণেই সাংঘাতিক সিরিয়াস নিজের এবং মিশেলের স্পেশালাইজেশন নিয়ে| সমীহ করার মতো এক্সপার্ট দুজনেই|

- "সারা সকাল দাদানের কাছে ছিলাম মিশেল আর আমি, এবং আমরা দুজনেই একমত যে আপাতত স্লো হলেও অলজাইমার্স ইজ প্রোগ্রেসিং| টেস্ট করলেই বোঝা যাবে| মিশেলকে বারবার পিপার সাথে গুলিয়ে ফেলে ঠামুনের পুরনো কথা জিজ্ঞেস করেছে| তিন্নিকে চিনতেই পারল না দাদান| মাঝে মাঝে কথার ফাঁকে "অপু কোথায়" বলেই যাচ্ছে | জানি সেটা প্রকসিমিটি আর ফ্রিকোয়েন্সির জন্য হচ্ছে | এবার কিন্তু তোমাদের মানসিকভাবে তৈরি হতে হবে | যত ডিক্লাইন হবে ততই মুশকিল হবে চব্বিশ ঘন্টা দেখাশোনা করা|"

- "তাছাড়া মিমা তুমি হচ্ছ ক্লাসিক কেস অফ কেয়ার গিভার বার্ন আউট | শারীরিক ও মানসিকভাবে পুরোপুরি বিধ্বস্ত তুমি| এর পরে ভাইকেরিয়াস ট্রমা বা এস টি এস ডি (secondary trauma stress disorder) সেট ইন করতেও পারে| তোমার সমস্ত সাইন ও সিমটমস্ তাই বলছে |" মিশেলের চোখ দুশ্চিন্তায় ভরা|

- "ঠিক বলেছে মিশেল| বৌদি, আমি কবে থেকে বলছি তুমি কয়েকটা দিন ঘুরে যাও রিচমন্ডে | একটু রেস্ট, একটু বৈচিত্র হবে | ও'কটা দিন দাদা ভার নেবে; তুমি একটিবারও কথা শুনতে চাওনি |" সুরঙ্গমার চোখে উদ্বেগ | "আমি জানতাম জিত, মিশেল একই কথা বলবে|"

- "তাছাড়া মম, তুমি সবার থেকে ক্রমশই আইসোলেটেড্ হয়ে পড়ছ| এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আর মনমরা তোমাকে আগে কখনও দেখিনি| মাঝে মাঝেই মনে হয় স্ট্রেস থেকে হাইপারভেন্টিলেট করছ | ঘুম যে তোমায় ত্যাগ করেছে, সেটা তোমার চোখের কালিই বলে দিচ্ছে| তোমার আঁকা আর গান শিকেয় তুলেছ – দিস আর অল রেড ফ্ল্যাগস্|" মা'র পাশে হাত ধরে বসে আছে জিত|

- "জাস্ট টু মাচ | আমার কোন কথাই তো শুনবে না অপু! মেমোরিয়াল ডে-র উইকএন্ডে বললাম চলো দু'তিন দিনের জন্য লেক জর্জে একটু জিরিয়ে আসি | বাবার জন্য স্টেট রেস্পিটের ইউনিটে কল করে ব্যবস্থা করে যাব| তা, কে কার কথা শোনে|" রেগেমেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল তথাগত|

- "লেটস্ জাস্ট চিল বাবা, রেগে গেলে কোনো সল্যুশন পাওয়া যায় না| টেম্পার লুজ করলে একেবারেই চলবে না|"

- "দেখো বৌদি, এতদিন আমার মা'র ক্যান্সার, সার্জারি, কিমো নিয়ে ওদিকে জেরবার হয়েছি আমি আর রানু; আর এদিকে বাবাকে নিয়ে তোমার যুদ্ধ চলছে| কিন্তু মাকে তো ধরে রাখতে পারলাম না| তাই বলছি এখন আমরাও আছি| ভাগাভাগি করে দেখলে কারুর ওপর বেশি চাপ পড়বে না, তাই না?" সৌমিত্র তাকাল তথাগতর দিকে|

- "যুদ্ধ বলছ কেন সৌমিত্র? আমার সৌভাগ্য যে আমি পারছি বাবার সেবা করতে| কষ্টে বুকটা ভেঙে যায়| কী মানুষ ছিলেন আর এখন..." গলা বুজে এল অপালার|

- "বেশিদিন একনাগাড়ে এমন করে চললে কমপ্যাশন ফেটিগ বলে একটা ফীলিং আসে মম, ওটা তোমায় পুরোপুরি ড্রেইন করে দেবে | তখন তোমার দেখাশোনা করতে হবে আর কাউকে| তুমি তো সেটা চাও না, তাই না?"

- "ইট টেকস্ এ ভিলেজ মিমা | আমরা সবাই কেয়ার গিভিং টীমে থাকতে চাই | প্লিজ না কোরো না!" মিশেল অপালার হাতদুটো ধরে বলল|

সেটা কী করে সম্ভব বুঝতে পারে না অপালা|

৬

বাবাকে চা আর ক্র্যাকার খাইয়ে হুইলচেয়ারে বসিয়ে বসার ঘরে নিয়ে এল অপালা| এবার উনি সুরঙ্গমার হাত ধরে বারবার নাচতে বলছেন | ভাবছেন রিমি দাঁড়িয়ে সামনে, এখুনি ওড়িশি নাচবে বলে প্রস্তুত| অপালা বোঝাল রিমি এখন নাচার জন্যে প্র্যাকটিস করছে, খ্রীষ্টমাসের ছুটিতে দাদানকে 'পল্লবী' দেখাবে বলে| খুব খুশি হলেন শুনে| সুরঙ্গমা চোখে টিস্যু চাপা দিয়ে চেয়ারে বসে কেঁদেই ফেলল|

- "আমাকে চিনতে পারল না বৌদি, আমাকে! দেখলেই বলত তুই তোর মা'র মুখ পেয়েছিস রে মা| ভাগ্যিস আমারটা পাসনি!

কী করে যে এত তাড়াতাড়ি সব এলোমেলো হয়ে গেল!" ফুঁপিয়ে উঠল সুরঙ্গমা।

- "এটা কিন্তু আরো বাড়বে পিপা। ভেঙে পড়লে কী করে দেখাশোনা করবে তুমি? শক্ত হতেই হবে, জানি বলা সহজ, কিন্তু আমাদের উপায় নেই। এই ডিক্লাইন অবশ্যম্ভাবী।" জিত পিসিকে জড়িয়ে ধরে বোঝানোর চেষ্টা করল।

- "আচ্ছা মম, দাদান বারবার সুজাতা কেমন আছে জিজ্ঞেস করছিল। আমি তো কাউকে ভেবেই পেলাম না। তাই সমানে কথা ঘুরিয়ে দিয়েছি। কে এই সুজাতা, মম?"

- "কই আমি তো এ নামে কাউকে চিনি না। কিগো, তুমি চেনো?" অপালা তথাগতর দিকে তাকিয়ে থাকল।

- "আশ্চর্য! মা'র কথা না তুলে, সুজাতাপিসির কথা ভাবছে? মাথা, মন, স্মৃতি বড়ই অদ্ভুত জিনিস।"

- "আরে কে সুজাতা? বলবে তো!"

- "বৌদি, আমি বলছি। পারিবারিক সব খবর কি সবার জানা থাকে নাকি? মা'র কাছে মেয়েরা সবথেকে কাছের হয়ে ওঠে একটা বয়সের পর। অনেক সময় মনের মধ্যে চেপে রাখা ভয়-ভাবনা, দুঃখ-কষ্ট, জটিলতা মায়েরা ভাগ করে নেয় মেয়েদের সাথে। স্বামীকে যা বলা যায় না, মেয়েকে বলা যায়। মেয়ে যে বন্ধু।"

- "কী বলতে চাস রানু? বাড়ির কোনও ব্যাপার কি আমার অজানা?"

- "তা হলে তুমিই বলো না দাদা।"

- "সুজাতাপিসি, মানে সুজুপিসি আমাদের প্রতিবেশিনী। আমরা ছোট থেকে দেখেছি।"

- "ধুর, আসল ব্যাপারটাই তো বললে না দাদা।"

- "আসল ব্যাপারটা কী শুনি।"

- "দাদা ঠিকই বলেছে আমরা ছোট থেকেই দেখে এসেছি সুজু-পিসিকে। অসম্ভব সুন্দর, খুব উচ্চশিক্ষিতা, সাইকলজিতে পিএইচডি। সেই সময়, ভাবা যায়! ভীষণ ভালবাসতেন দাদাকে আর আমাকে, নিজের সন্তানের মতো। পড়াতেন গার্লস কলেজে। অল্প বয়েসে বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে থেকেই কলেজে পড়াতে আরম্ভ করেছিলেন। পরে অবশ্য হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট হয়েছিলেন। কিন্তু রিটায়ার করার এক বছরের মধ্যেই সব ছেড়েছুড়ে কার্শিয়ং-এ একটি ক্যাথলিক মিশনারি স্কুলে পড়াতে চলে গেলেন এবং কাছের একটি অনাথ আশ্রমের সাথেও যুক্ত ছিলেন। বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। মা'র কাছেই সব শোনা।"

- "শী মাস্ট হ্যাভ বিন ভেরি ড্রিভেন, পিপা।" জিতের চোখে সম্ভ্রম।

- "তা তো নিশ্চয়ই। কিন্তু মা'র চিরকালের ইনসিকিউরিটি, অস্বস্তি কোনদিন যায়নি। তাই প্রথম থেকে আমাদের মুখে ভুলবশত সুজুমাসি শুনলেই শুধরে দিত তৎক্ষণাৎ। বলত, 'রানু, সুজাতা কিন্তু তোদের মাসি নয়, পিসি হয়।' তখন এই পার্থক্য যে ভাল বুঝতাম, তা কিন্তু নয়। এখন মনে হয় যেন জোর করে একটা সম্পর্কের চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া তৈরি করে দিতে চাইত মা। অনেক পরে যখন আমি কলেজে, তখন মা বলত, 'তোর বাবার সুজুপিসির প্রতি খুব নিবিড় একটা টান আছে রে, থাকবেও। কত ছোট থেকে একসাথে বড় হওয়া। আমি তো অনেক পরে এসেছি। কিছু করার নেই। আমার কপাল! তোরা কিন্তু কখনো এই নিয়ে কোনও আলোচনা করবি না। নিজেদের মধ্যেও না।' তাই বলছি দাদা, তুমি তো জানো সব। বাবার এই মুহূর্তে পুরনো কথা, মানুষ, সম্পর্ক মনে পড়তেই পারে, তাই না? বল জিত!"

- "ইয়েস পিপা। লেয়ারের পর লেয়ার দিয়ে তৈরি আমাদের মেমারি। এই সারফেসিং কোয়াইট পসিবল। একেক করে পর্দা উঠছে যেন।"

- "সো ইন্টেরেস্টিং, দ্য ওয়ে মেমারি অ্যান্ড কগনিশন ওয়ার্ক, রাইট?" মিশেল জিতের দিকে তাকাল।

- "অ্যাবসল্যুটলি।"

- "ঠিক বলেছ মিশেল। খুব ইনট্রিগিং আমাদের মন। কিছুই ভোলা যায় না পুরোপুরি যা আমাদের খুব কাছের, খুব আপন। যেখানে ভাললাগা বোধ, শান্তি জড়িয়ে থাকে, তা বোধহয় এইভাবেই ফিরে ফিরে আসে। জানো অপু, একবার সুজুপিসি বোধহয় অসুস্থ হয়েছিল পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে, কারুর কথা না শুনে বাবা কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে একাই ছুটে গিয়েছিল ওখানে। সুজুপিসি একটু সুস্থ হতে ফিরে এসেছিল দুজনে। মা''র ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গিয়েছিল তখন। বহুদিন কথাই বলেনি বাবার সাথে। আমাদের মাধ্যমে সাংসারিক আলাপ আলোচনা হতো। মনে আছে তোর রানু?"

- "হ্যাঁ দাদা, মনে থাকবে না? তখন মাঝে মাঝেই মা কেঁদে

ফেলত | এখন হলে সবাই বলত ডিপ্রেশনের চিকিৎসা করানো উচিত | এ নিয়ে কেউই তখন মাথা ঘামায়নি | আমাদের দেশ ছেড়ে এদেশে চলে আসা, সুজুপিসির কার্শিয়ং চলে যাওয়া, এসব ঘটনায় অন্যরকম হয়ে গেল ব্যাপারটা | মা'র আর বাবার মধ্যে একটা গাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গেল চিরকালের মতো | কী আশ্চর্য!"

- "বাব্বা! আর আমি এতদিন কিছুই শুনিনি |" কেমন যেন পর পর মনে হচ্ছিল নিজেকে অপালার |

- "উনি কোথায় এখন? জানো তোমরা?" সৌমিত্র এই প্রথম কথা বলল |

- "না না, আমরা কেউই আর কিছু জানি না | কোথায় আছেন, বেঁচে আছেন কিনা, কিছুই জানি না |" বলল তথাগত |

- "তা খোঁজ নিতে তো কোন ক্ষতি নেই | গুগল সার্চ করে কার্শিয়ং-এর স্কুল, অর্ফানেজ বের করতেই পারি | এবং সুজাতা মিত্রের কারেন্ট ঠিকানা | লেটস্ সি হোয়াট কামস্ আপ, ওকে?" মিশেলকে খুব উৎসাহিত মনে হ'ল | "লেটস্ জাস্ট ডু ইট |"

- "ইয়েপ, নাইকি স্টাইল, রাইট?" বলে জিত অল্প হাসল |

- "খোঁজার পর কী করব আমরা?" দিশাহারা দেখাচ্ছে তথাগতকে |

- "আগে সার্চ, তারপর তো নেক্সট্ স্টেপ বাবা | লেটস্ কীপ চেকিং দ্য টু ডু চেকলিস্ট ওয়ান অ্যাট এ টাইম |"

- "মেকস্ সেন্স | আই উইল টেক কেয়ার অফ ইট | ট্রাস্ট মি |" মিশেল ল্যাপটপ নিয়ে বেডরুমের দিকে যেতে যেতে বলল |

৭

কাল যেন সবার ওপর স্মৃতির এক সুনামি আছড়ে পড়েছিল | কত পুরনো গল্প রাংতামোড়া পুঁটলির বাইরে বেরিয়ে এসে উঁকি দিয়ে গেল | কত হাসি কান্না, কত মান অভিমান | বাবা কিন্তু নিজের ঘোরে, নিজের জগতেই থেকে গেলেন | কী শুনলেন, কী বুঝলেন, কে জানে | হঠাৎ একবার বলে উঠলেন, 'হাসলে সুজুর গালে টোল পড়ে, তখন ওর ঠোঁটের নিচের তিলটা কাঁপে |' সবাই কিছুটা চমকে উঠল | সবটাই যেন একই রকম থেকে গেছে বাবার মনের আয়নায় | বিভেদ নেই কোন স্থানকালের | সময়ের জালে কিছুই চাপা পড়ে দম বন্ধ হয়ে মরে যায়নি যেন! আজ বয়সের ভারে ন্যুব্জ সুজুপিসি সামনে এসে দাঁড়ালে বাবা কি চিনতে পারবেন তাঁকে, আগের সেই উষ্ণ পরশ ফিরে পাবেন কি?

দুপুর নাগাদ মিশেল এসে বলল যে ও কার্শিয়ং-এর যত ক্যাথলিক মিশনারি স্কুল আছে, সবগুলোতে একেক করে কনট্যাক্ট করেছে; জেনেছে মিসেস মিট্রা সেইন্ট হেলেনস্ সেকেন্ডারি স্কুলের সাথে যুক্ত ছিলেন | বহু বছর ওই স্কুলে পড়িয়েছেন | মেয়েদের কাছে উনি শুধু একজন অত্যন্ত ডেডিকেটেড্ টিচারই ছিলেন না, ছিলেন একজন ইন্সপিরেশন | একজন ডিভোটেড্ ওয়ার্কার এবং কাউনসিলর | এখন বয়স-জনিত অসুস্থতার কারণে অবসর নিয়েছেন | আশেপাশের উপকৃত মানুষেরা ওঁর দেখাশোনা করে | উনি সবার চেনা, সবাই শ্রদ্ধার চোখে দেখে ওঁকে |

- "ওয়াও মিশেল, শী ইজ ভেরী মাচ অ্যারাউন্ড দেন; অ্যামেজিং! উই নীড টু গো চেক অন হার | আই অ্যাম সিরিয়াস হানি |"

- "অ্যাবসল্যুটলি, আই উইল কল হার অ্যাট এ মোর ডিসেন্ট টাইম দেয়ার | আই অ্যাম শিওর শি উইল রেস্পন্ড | দিস ইজ সিরিয়াসলি এক্সাইটিং, ডেভ | উই নীড টু লুক ফর টিকেটস্ |" তথাগত আর সুরঙ্গমা বেশ কিছুক্ষণ নিথর হয়ে বসে থাকল | তারপর দুজনেই ঠিক করল আগামী গরমে জিত ও মিশেলের সাথে গিয়ে সুজুপিসিকে দেখে আসবে | বাবাকে ফেলে অপালার যাবার উপায় নেই | সুজুপিসি হয়তো ওর কাছে অধরাই থেকে যাবেন |

৮

- "এবার কিন্তু তোমাকে নিয়ে ভাবার পালা, মম | সেই জন্যেই কিন্তু আমরা সবাই এখানে এসেছি |"

অপালা যেন আকাশ থেকে পড়ল |

- "আমার আবার কী হ'ল? কি যা তা বলিস, বুঝি না আমি | অমন সামান্য হাই প্রেশার, ডাইবিটিজ, আর্থরাইটিস সবার ঘরে ঘরে |

- "তুমি তো পয়েন্টটাই মিস করছ, মম | প্রবলেমটা হচ্ছে দ্য কিউম্যুলিটিভ্ ইমপ্যাক্ট অফ এ শেয়ার্ড এজিং ট্র্যাজেক্টরি |"

- "ওরে বাবা, সেটা আবার কী রে?"

- "ভেঙে বলছি শোনো | তোমার বয়স কমছে না মম, দাদানও এজিং প্রোগ্রেসিভলি | একজন সিনিয়ারের কেয়ার গিভার ইজ অলসো এজিং, মানে তুমি, নিজস্ব কো-মর্বিডিটি নিয়ে | এই কম্বো হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর্স ফর পুয়র আউটকাম | এই জার্নি

ক্রমশই জটিল হবে শুধু দাদানের জন্যই নয়; তোমার জন্যও। তখন আমার আর মিশেলের টু বেডরুম অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে থাকতে হবে...” বলেই হো হো করে হেসে উঠল জিত।

- “এসব ব্যাপারে এত ইয়ার্কি ভাল লাগে না, বাবাই। তাছাড়া যিনি অসুস্থ, তাকে ফেলে আমাকে নিয়ে পড়ার কোনো মানে আছে?”

- “আছে মিমা, এটা হচ্ছে কেয়ার গিভার বার্ন আউট সিন্ড্রোম। তাই আমরা সবাই তোমাকে নিয়ে শুধু ভাবছি না, এর সল্যুশনও ডিসকাস্ করতে চাই।”

অপালা উঠে গিয়ে মিশেলকে জড়িয়ে ধরে বলল, “তুমি কবে এ বাড়ির বউ হয়ে আসবে সোনা?”

- “আবার সেই ক্ল্যাসিক সাইডট্র্যাকিং, স্টোনওয়ালিং। মম, আসল পয়েন্টে ফিরে এসো প্লীজ।”

- “আচ্ছা ঠিক আছে। সরি!”

- “কিছু বিকল্প ভাবাই যায়, যেমন – আমরা সবাইমিলে কন্ট্রিবিউট করে বাড়িতে কয়েক ঘন্টার জন্য অথবা লিভ ইন পেইড কেয়ার গিভার রাখতে পারি। সামারে আর ফলে পালা করে মিশেল, আমি, পিপা, পিসো, ইভন দ্য গার্লস, তিন্নি, রিমি আলাদা আলাদা আসব। তখন তুমি বাবার সাথে কোথাও ঘুরে আসতে পারো। স্টেট রেসপিটেরও ব্যবস্থা করা যায় সাত-দশ দিনের জন্য।”

- “ঠিকই তো। এতে তুমি একটু ব্রেক পাবে, কিছুটা রেস্ট হবে তোমার বৌদি।” সৌমিত্র সহমত।

- “তাছাড়া মম, তুমি পিয়ার সাপোর্টের জন্য মাসে একবার ফ্যামিলি কেয়ার গিভার অ্যালায়েন্স বা কেয়ার গিভার স্পেসের সাথে যোগাযোগ করে অনেক তথ্য জানতে পারো, প্রবলেম শেয়ার করতে পারো। দেখবে এই পিয়ার সাপোর্ট একটা খোলা জানলা।”

- “তা বাদে বৌদি, রেকি করলেও দেখবে খুব ভাল লাগবে। দারুণ রিল্যাক্সিং। হিলিং এনার্জি সব সময় স্বাস্থ্যকর, তাই না? আমি শুরু করলাম শাশুড়ি-মাকে নিয়ে, যখন দুজনেই আমরা ভয়ংকর চাপে থাকতাম, তখন। এখনও করি। সৌমিত্র সুষুম্না ক্রিয়াযোগ করে। করে যাব আমরা। খুব উপকার পাই। তুমি রাজি থাকলে শুরু করতে পারো। প্রথম কদিন গ্রুপে, তারপর নিজের সময়ে, নিজের মতো করে করতে পারো।”

- “কিন্তু দাদানের অবস্থার অবনতি হলে বাড়িতে ইনটেনসিভ্ সাপোর্ট না দিয়ে নার্সিংহোমে ব্যবস্থা করতে হবে। মেমরি কেয়ার রিহ্যাবে রাখা যায়। প্রথম দু’বছর আমরা সবাই চিপ-ইন করলাম, তারপর দাদান মেডিকেড পেয়ে যাবে, আমার বিশ্বাস। ব্যাক-আপ প্ল্যান একটা থাকতেই হবে। তাহলে তুমি কাজে ফিরে যেতে পারো, মম। ভেবে দেখো। আমাদের সবার নিজের প্রতিও কিছু দায়িত্ব আছে, নিজেকে ভাল রাখার দায়িত্ব। নিজে ভাল না থাকলে অন্যকে ভাল রাখা যায় না। ওভারগিভিং কিন্তু ক্ষতিকর; তোমাকে সেটা বুঝতেই হবে, মম।”

- “ঠিক আছে, যা ভাল বুঝিস তোরা সকলে, তাই হবে।”

- “গ্রেট মিমা। তোমার সাথে কেয়ার টীমে আমরা সবাই আছি। তোমার একার যুদ্ধ নয় এটা। পারবে না কিছুতেই। আমি বিশ্বাস করি ইট অলওয়েজ টেকস্ এ ভিলেজ।”

৯

এই চার বছরে কত কিছুই না হ’ল। ভাবলে অবাক লাগে। সবটাই যেন রূপকথা!

অবশেষে গত বছর জিত আর মিশেলের দু’হাত এক করতে পেরে নিশ্চিন্ত অপালা। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হ’ল ওদের বিয়েতে সুজুপিসি এসে উপস্থিত। মিশেল নাকি তিন বছর আগে এত অভিভূত হয়েছিল কার্শিয়ং-এ ওঁর সাথে আলাপ করে, যে আগেভাগেই ইনভিটেশন পাঠিয়ে দিয়েছিল যাতে ভিসা পেতে অসুবিধে না হয়। অপালা যত দেখে আজকালকার ছেলে-মেয়েদের, ততই বিস্মিত হয় ওদের কমিটেড্ কমপ্যাশন আর দূরদর্শিতা দেখে।

সুজুপিসিকে পেয়ে তথাগত আর সুরঙ্গমা আনন্দে আত্মহারা। নিজেদের সেই ছোটবেলায় আবার ফিরে যাওয়া। ভারি চমৎকার মানুষ ইনি, এই বয়সে এখনও লাবণ্যময়ী এবং যথেষ্ট শক্ত ও কর্মঠ। বাবার অনেক অজানা গল্পের ঝুড়ি নিয়ে বসলেন বেশ ক’দিন। সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনল। বাবা কিন্তু চিনতে পারলেন না সুজুপিসিকে। বললেন “সুজুকে বলো তো ওর পড়ার টেবিলের নিচের ড্রয়ারে খাতার মধ্যে লুকিয়ে রাখা সব কবিতা আমি পড়েছি। ও জানে না।”

সুজুপিসি বললেন, “ঠিক আছে ভালদা, বলে দেব।”

হাসি আর কান্নার সহবাস তখন তাঁর চোখে। অপালা খুব আলতোভাবে ছুঁয়েছিল ওঁর কাঁপা কাঁপা হাতদুটো। যেন ব্যথার

সাথে শান্তি পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে রয়েছে। আছে শুধু গ্রহণ করা, মেনে নেওয়া আর মনে নেওয়া।

বিয়ের ঝক্কি মেটার পর সুজুপিসিকে নিয়ে অপালা আর তথাগত কয়েক দিনের জন্য রিচমন্ডে ঘুরে এল। বাবাকে রেখে গেল অ্যাঞ্জেলোর হেফাজতে। সবার যৌথ প্রচেষ্টায় একজন অসম্ভব দক্ষ ও সংবেদনশীল স্টেট সার্টিফায়েড্ ফিলিপিনো লিভ ইন এইড, অ্যাঞ্জেলোকে ওরা পেয়েছিল বছর তিনেক আগে।

আহ্লাদে আটখানা রানু আর সৌমিত্র। তিন্নি ও রিমি নতুন দিদুকে রিচমন্ডের সমস্ত দ্রষ্টব্য ঘুরিয়ে দেখাল। দুজনেরই হাতে এখন গ্র্যাড স্কুল শেষ করা আর চাকরি পাওয়ার মধ্যে কিছু সময় রয়েছে। সুজুপিসিও খুব উৎসাহ নিয়ে দেখলেন ভার্জিনিয়া মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টস, এডগার অ্যালেন পো মিউজিয়াম, আর্টস ডিস্ট্রিক্ট, ক্যানাল ওয়াক মিউরালস, ল্যুইস গিন্টার বোট্যানিকাল গার্ডেনস্, মেইমন্ট গার্ডেনস্, সব! ক্লান্তি নেই একটুও। সৌমিত্র সবাইকে জেফার্সন হোটেলে রবিবারের ব্রাঞ্চ করাল। তাতে জিত, মিশেলও যোগ দিল। অনাবিল আনন্দ! পিটসবার্গে ফেরার সময় জিত আর মিশেল নতুন দিদুকে সঙ্গে নিয়ে গেল পিটসবার্গ পরিদর্শন করানোর জন্য। পরের শনিবার আবার ড্রাইভ করে পৌঁছে দিয়ে যাবে নিউ জার্সিতে। সুজুপিসির চোখে মুখে এক আশ্চর্য আনন্দ ও উদ্দীপনা লেগেই থাকল। তাই পিসি যখন ফিরে গেলেন বাড়িটা একদম ফাঁকা হয়ে গেল। মনে হ'ল যেন সখা চিরতরে ছেড়ে চলে গেল। হোয়াটস অ্যাপে যোগাযোগ রাখবেন বলে চোখের জল আটকালেন নিউয়ার্ক এয়ারপোর্টে চেক ইন করার আগে। অপালাকে জড়িয়ে ধরে বললেন "তোমরা আমার খুব আপন হয়ে গেলে। ফিরে গিয়ে কষ্ট হবে সবার জন্যে। জানি ভালদাকে খুব ভাল রাখবে তোমরা সবাই। একবার যেন ঘুরে যেও কার্শিয়ং-এ, কেমন?"

১০

এতদিনে প্রত্যেকের জীবনযাত্রাই পাল্টে গেছে, বিশেষ করে অপালার।

অ্যাঞ্জেলো কেবল মিষ্টভাষীই নয়, মেমরি কেয়ারেও সে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাই ওর অ্যাপ্রোচটাই আলাদা। কয়েক মাসের মধ্যেই অ্যাঞ্জেলো বাবার নতুন বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। তাকে এখন বাবা চোখে হারান। "অপু"-র বদলে সারা বাড়িময় শুধুই "জেলো" নামের প্রতিধ্বনি এখন। ডাকাডাকি সবটাই এখন অ্যাঞ্জেলোকে ঘিরে। অপালাকে অবশ্যই খানিকটা ভুলে গেছেন বাবা। সেই কারণে অপালা আবার নিশ্চিন্তে কাজে ফিরে যেতে পেরেছে।

সানরুমটা রি-মডেল করে পাশাপাশি দুটো ছোট ঘর করা হয়েছে লাগোয়া বাথরুম নিয়ে; বাবা আর অ্যাঞ্জেলোর জন্য। জিত এসে তদারক করে গেছে সব ঠিকঠাক হয়েছে কিনা শেষমেশ। এখন বাবা আর অ্যাঞ্জেলোর খুব ভাব, মহানন্দে আছেন দুজন।

অ্যাঞ্জেলো ফিলিপিনো, অসম্ভব সঙ্গীত-অনুরাগী। হাতে গিটার নিয়ে যখন ফ্র্যাঙ্ক সিনাট্রার "L.O.V.E" গায়, তখন বাবার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। আর যখন বিটলসের "All You Need is Love" ধরে, বাবা চোখ বন্ধ করে শোনেন। অ্যাঞ্জেলোর পায়ে পায়ে ঘরময় ঘুরে ঘুরে হাত তুলে বাচ্চাদের মতো নাচতে থাকেন, যতক্ষণ না অ্যাঞ্জেলো গিটার নামিয়ে রাখে। অপালার দিকে তাকিয়ে অ্যাঞ্জেলো বলে, "পলা, ইউ নো, মিউজিক ইজ দ্য বেস্ট থেরাপি ফর অলজাইমার্স অ্যান্ড ডিমেনশিয়া। সমথিং বিয়ন্ড মেমরি।"

অপালার এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়। স্মৃতির থেকেও পুরনো সুর আর লয়, একেবারে প্রাইমাল, অর্গ্যানিক! তাই অনেক কিছু ভুলে গেলেও, সুর আর ছন্দ ধুকপুক করেই চলে মানুষের মনের গভীরে। মানুষ দৈনন্দিন অভ্যেস, নিবিড় সম্পর্ক, অতি পরিচিত ভাষা, শব্দ ভুলে যেতে পারে কিন্তু এই সুরবোধের তল পাওয়া যায় না। পৃথিবীর প্রতিটি কণায় সুর আর ছন্দর প্রতিধ্বনি শোনে মানুষ নিজের হৃদয়ে, মজ্জায়। বাবা তাতেই ডুবে আছেন।

স্বাধীনতার রাজধানী – মাদারিপুর

এস এস নেওয়াজ

এই প্রায় বছরখানেক আগে বা তার কিছু বেশি, বেড়াতে গেছি গ্রীসে। পুরনো সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু অ্যাথেন্স শহর, তারপর নীল ভূমধ্যসাগরের দুটো দ্বীপে যাবার কথা। ক্রীট এবং স্যান্টোরিনি। আধা চাঁদের মতো দেখতে আগ্নেয়গিরির দ্বীপ এই স্যান্টোরিনি; যার খাড়া পাহাড়ের উপরে সাদা আর নীল গম্বুজের সারি, আর জলপাইয়ের ঝোপ। সেসব দেখবার বহুদিনের শখ ছিল আমার গিন্নির। প্রথমদিন বিকেলে একটু বেড়িয়ে নিয়ে, অ্যাথেন্সের অজস্র খোলা-আকাশ-রেস্তোরাঁর একটাতে গিয়ে বসেছিলাম। একটা জলপাই গাছের নিচে ছোট্ট টেবিল, কবল স্টোনের রাস্তা, পাশে গ্রীক কলাম আর পুরনো প্রাচীরের অবশিষ্ট। একটু দূরে সর্বোচ্চ পাহাড়ের উপরে দেখা যাচ্ছে অনির্বাণ সময়ের সাক্ষী অ্যাক্রোপলিস (Acropolis)। সন্ধ্যার পড়ন্ত সূর্যের আলোতে দেখা যাচ্ছে হাজার হাজার বছরের পুরনো দেব-দেবীর কারুকার্য করা সারবাঁধা মিনারগুলো। স্লোভাকি আর গ্রীক স্যালাড অর্ডার করে আমি অ আ ক খ পড়বার মতো করে গ্রীক ভাষা পড়বার চেষ্টা করছি। পাই ল্যামডা আলফা কাপ্পা, প্লাকা... আমার যে গ্রীক পড়তে একেবারেই অসুবিধা হচ্ছে না – সেটা যতবারই সাঈদার কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছিলাম ততই বেশি সমস্যায় পড়ে যাচ্ছিলাম।

আমাদের পাশে প্রায়ই বাচ্চারা, বুড়োরা কিছু বিক্রি করতে আসছিল – কেউ বা আনছে ফুলের মালা, কারো হাতে চুইংগাম, কারো বা কাছে হাতে-আঁকা ছবি। চেককাটা জামা আর প্যান্টপরা একটি কালোপানা ছেলে যখন একটা গোলাপ ফুল বাড়িয়ে দিয়ে বিক্রি করবার চেষ্টা করল তখন অভ্যাসমতো বললাম, "না, দরকার নেই।" ছেলেটি ভারতীয় উপমহাদেশের, তাতে সন্দেহ নেই; বয়স হবে উনিশ বা কুড়ি। সাঈদা তার স্বভাবজাত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি বাংলাদেশের?" ছেলেটি ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বুঝাতে লাগল, বাংলাদেশ কোথায় – এই তো ইন্ডিয়ার পাশে। সাঈদা যে বাংলাদেশ শব্দটা ছাড়া আর কিছুই খেয়াল করেনি, তা বোঝা গেল। তাই গিন্নি আবার প্রশ্ন করল, "তোমার বাড়ি কি বাংলাদেশে?"

এবার যেন টনক নড়ল ওর। বাংলা শোনবার স্বপ্ন দেখেনি মনে হয়, তাই থতমত খেয়ে বলল, "আফনেরা বাংলাদ্যাশের, বাংলা কন?"

শুধু যে বাংলা বলি, তা নয়, বাংলাদেশের অলিগলিও আমার চেনা – সেটা প্রমাণ করবার জন্য জেরা করবার ভার এবারে আমি নিজের ওপরে নিলাম।

- "কোথায় তোমার বাড়ি?"

- "হেইডা চিনবেন না, মাদারিপুর।"

মাদারিপুরের সাথে আমার পরিচয় আছে। মনে ছিল বাদামতলি সিনেমা হলের কথা। আব্বার সরকারী দোতলা কাঠের বাড়ি থেকে সেই মাঝে-মধ্যে-চলা সিনেমা হলের দূরত্ব হ'ল একটা শীতের ধানকাটা-শেষ-হওয়া শুকনো জমি। ১৬ উপপাদ্যের সূত্র – ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি সর্বদা দুই সমকোণের সমান – হ্যারিকেনের আলো জ্বেলে দোতলার বারান্দায় মাদুর পেতে বসে সেটা প্রমাণ করবার সময় ভেসে আসত মাইকের গান। অপূর্ব দোল দেওয়া হিল্লোল, 'ভিগা ভিগা হ্যায় সাম...' সেই মাদারিপুরের স্মৃতি আমার মনের মণিকোঠায়; তাই গড়গড় করে আউড়ে গেলাম একগাদা নাম – আড়িয়েল খাঁ নদী, মিলন সিনেমা হল (যা বছরের ছ'মাস বন্ধ থাকে), খাজা নাজিমুদ্দিন কলেজ, নতুন শহর। নদীর ভাঙনের মুখে শহরের দুঃখ।

- "হ হ, এখনও আছে সেই কলেজডা? আমি চাইছিলাম ওইখানে পড়তে।"

নিজের কোনও আত্মীয়কে পেয়ে মানুষ যেমন অনর্গল কথা বলে চলে সেও সেভাবেই বলে গেল – সে ম্যাট্রিক পাস্। বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান। বাবা চর মুগুরিয়ার সব জমিজমা বেচে ছেলের বিদেশ যাবার পয়সা জুগিয়েছে। ভাল করে চেয়ে দেখলাম তাকে। কবি জসীমউদ্দীনের বেদে সোজন! মাথাভর্তি ঘন কালো চিকন চুল, জোড়া ভ্রু, কাজল-কালো চোখ। চোখের মণিতে যে ঝিলিক, তা দেখেছি আমার ছেলে রিফির চোখে বা ইউনিভার্সিটির প্রথম সারিতে বসা ছাত্রদের কৌতূহলী ঝলকে; সপ্রতিভ, উজ্জ্বল।

পড়ন্ত সূর্যের লালচে আলোর আভায় অ্যাক্রোপলিসকে লাগছে রূপকথার রাজবাড়ীর মতো। সে বলে গেল কীভাবে এসেছে গ্রীসে। "ভারত থেকে পাকিস্তান – তা, লেগেছে মাস দুয়েক, সেখান থেকে ইরান। ইরান-তুর্কির বর্ডারে বোচ্ছেন, সবসময়

যোদ্ধ। কামান, ছেলো, মেশিন গান। হেইডা পার করতেই তিন লাখ টাকা দিতি হইছে। আমার অখন এই টাকা বাবারে ফেরৎ পাঠাইতে হইব। আমি তো আর মজা কইরবার লাইগ্যা আসি নাই এইখ্যানে।"

সে বলে গেল প্রায় প্রত্যেক রাতে দুটো-তিনটে পর্যন্ত এই ফুল বিক্রি করে।

- "মাজে মাজে পা দুইডায় খিল ধইরা যায়; হাঁটবার পারি না আর, হাঁটুদুইড্যা ফুইল্যা যায়।"

এরকম অনেক বাঙালি লোক আছে সে জানালো। তাদের কেউ ফুল বিক্রি করে, কেউ গাড়ির জানলা মুছে দেয়। তারা কেউ এসেছে করটিয়া থেকে, কেউ চাঁদপুরের, কারো বাড়ি পাইকগাছা।

- "তা, এখানে কাজ করবার জন্য কোনো কাগজপত্র লাগে না?" প্রশ্ন করলাম।

- "ভাইসাব, আমরা যাইয়া কোই, আমরা আইছি বর্মার থিক্যা। অ্যারা বাংলাদ্যাশ আর বর্মার তফাৎ বোজে না। বর্মার কোন এম্ব্যাসিও নাই অ্যাইখানে; তাই কাগজ দিয়া দ্যায়। আমি আইচি ধরেন চাইর মাস অইল। আরো দুই মাস লাগব কাগজ বাইর করতে।"

বাঁচবার তাগিদে এরা কোথা থেকে কোথায় এসেছে রাস্তায় রাস্তায় ফুল বিক্রি করতে! একটু সুযোগ পেলে এরাও কি পারত না দেশে থেকেই রুজি-রোজগার করতে!

সন্ধ্যার অন্ধকারের সাথে তখন ঝিকমিক আলোর ছড়াছড়ি অ্যাক্রোপলিসে। সেইসব দেখতে দেখতে ছেলেটির কথাগুলো পুরোপুরি মাথায় ঢুকছে কিনা বুঝতে পারছি না।

- "আফনে এই ফুলডা রাখেন আফা।" বলে একটা গোলাপগুচ্ছ সে রেখে দিল সাঈদার সামনে।

আমি পকেটে হাত দিই ওয়ালেটটা বের করার জন্য।

- "না স্যার, আফনাদের থন পয়সা নিতাম না।"

- "আরে না না, তা কি হয় নাকি?" আমি প্রতিবাদ করি।

কিছু করবার আগেই সে দৌড়ে চলে গেল কোন এক গলির ভেতরে। আমি উঠে তার পিছনে যেতে যেতে সে হাওয়া হয়ে গেল। আমরা হতবাক হয়ে বসে রইলাম।

নিজের দেশের দুজন মানুষকে এই বিদেশের মাটিতে কাছে পেয়ে স্বভাবজাত আতিথেয়তায় নিজের জীবিকার কষ্টোপার্জিত ফুল দিয়ে সে আমাদের চিরঋণী করে গেল। আমার কাছে এই ফুলের মূল্য সামান্য হলেও, তার কাছে ইরান-তুরান পাড়ি দেওয়া, বাবার জমি বিক্রি করার মূল্য অনেক বেশি! ছেলেটা তার কী নাম বলেছিল যেন? হয়তো ওর নাম সালাম, রফিক বা বরকত!

ঝুম্পা লাহিড়ী, তুমি এদের নিয়ে একটা গল্প লেখো না কেন? হয়তো আরও একটা পুলিটজার পেয়ে যেতে পারো!...

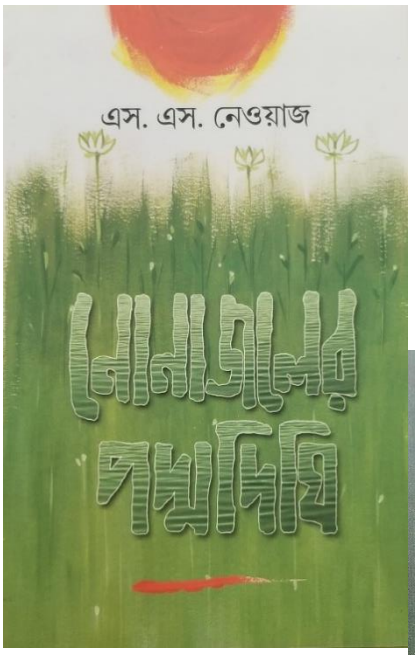

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে *নোনাজলের পদ্মদিঘিতে* যে অপরূপ পদ্মফুলগুলি কোরক মেলেছিল, তারা সাধারণ হয়েও অসাধারণত্বের দাবি রাখে। সুদূর বাংলা থেকে আমেরিকার হিউস্টন শহর পর্যন্ত এর বিস্তৃতি—সময়ের ধারাসূত্রে নয়, খণ্ডচিত্রের নকশি-কাঁথায়। অভিবাসী লেখক এস. এস. নেওয়াজ বড় যত্নে ও আদরে তাঁর প্রাণের টান উজাড় করে, জীবন্ত করে তুলেছেন সেই ফেলে আসা দিনগুলিকে। স্মৃতিময় ভালোবাসা তাই বর্ণময় উজ্জ্বল, বইটির পাতায় পাতায়। অনেক না-জানা, ভুলে-যাওয়া, মুছে-যাওয়া তথ্য গল্পের মোড়কে আকর্ষণীয় হয়ে উপস্থিত, যা বাংলাভাষী সকল পাঠককে নিশ্চিতভাবে আকৃষ্ট করবে।

রূপালি জলের শস্য

চিত্ত ঘোষ

সত্তর বছর বয়সী এক মৎস্যজীবী দাঁড়িয়েছিলেন রূপনারায়ণের সামনে। জল মাপছিলেন চোখের আন্দাজে। এইভাবেই জল মেপে তিনি বুঝতে পারেন নদী ভিতরে ভিতরে তৈরি হচ্ছে ইলিশের জন্য। মধুগুলগুলি বৃষ্টি নামল। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিরই একটা রকমফের। এই বৃষ্টির পর ইলিশেরা উতলা হয়ে হঠে। প্রকৃতির এই ভাষা জানেন সনাতন হালদার। এই অধিবিদ্যা বাপ-ঠাকুরদার থেকে পাওয়া। মামারা থাকতেন সুন্দরবনে। ছোটবেলায় মামার দেশে বেড়াতে গেলে দাদু নিয়ে যেতেন তাকে। কখনও নৌকো, কখনও ট্রলারে। দাদুই বলতেন, ইলিশ ধরতে গেলে জলের মন বুঝতে হয়, জলের গায়ের গন্ধ নিতে হয়।

ইলিশ একা একা থাকতে পারে না। সপরিবার বেঁধে বেঁধে থাকে। ছোট-বড় সকলেই। মামাবাড়ির দাদু বলতেন, 'গন্ধঝাঁক'। ইলিশরা একসঙ্গে থাকলেই জলের উপর দিয়ে একটা আলাদা আঁশটে গন্ধ ভেসে আসে। তখনই বোঝা যায় ইলিশের ঝাঁক আছে নদীর বুকে। আর জলের মন পড়তে গেলে চিনতে হয় জলের রং। তার আবার নানা নাম। ডাব জল, গাব জল, মাছ ধোয়া জল, চখা জল, কালো জল, চেরটা জল। চখা জল চোখের জলের মতো পরিষ্কার। আর চেরটা জলে থাকে অনেক শেওলা। সব জলেই কিছু না কিছু ইলিশ থাকেই। তবে ঘোলা জলে ইলিশ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

স্মৃতিগুলো ঝাঁকিয়ে নিয়ে পাড়ের বাঁধের উপর থেকে নামলেন চরের উপর রাখা নৌকোর কাছে। এই নৌকো করেই প্রতিবার তিনি ইলিশ ধরতে যান। ভালবেসে নৌকোটার নাম দিয়েছিলেন 'সোহাগী'। মাছ ধরতে, ইলিশ মারতে এই আদরের নৌকোই তাঁর সঙ্গী। এবার পৃথিবী কিছু দিনের জন্য বন্ধ ছিল। যারা পৃথিবীটাকে শাসন করত, তারা করোনা-আতঙ্কে ঘরবন্দি রেখেছে নিজেদের। তাই একটু দেরি হয়েছে বেরোতে। আখেরে তাতে লাভই হ'ল। ইলিশ নিজেকে আরও সুস্বাদু করে তুলল।

'মাইগ্রের' একটা ল্যাটিন শব্দ। যার মানে ভ্রমণ। ইলিশ মাছ ভ্রমণপ্রিয়, তাই একে বলে মাইগ্রেটরি ফিশ। কিছুদিন সাগরে, তো কিছুদিন নদীতে। নোনা জলের দেশে থাকে ইলিশ, ওটা তার শ্বশুরবাড়ি। সন্তানের জন্ম দিতে ইলিশকে বাপের বাড়ি আসতে হয়। মিষ্টি জলের নদী ইলিশের বাপের বাড়ি। ইলিশের মা হ'ল গঙ্গা আর মাসি পদ্মা। বছরে দু'বার বর্ষা আর শীতে ডিম ফুটিয়ে সন্তানের জন্ম দিতে ইলিশকে আসতে হয় মা-মাসির কাছে। ঝাঁক বেঁধে সমুদ্র থেকে যখন ওরা ঢোকে নদীর বুকে, তখন তাকেই বলে অ্যানাড্রোমাস পরিযান। গঙ্গা, ভাগীরথী, হুগলি, রূপনারায়ণ, ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী, নর্মদা, তাপ্তী, পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, কর্ণফুলি, ইরাবতী, সবেতেই সাগর উজিয়ে ইলিশ আসে।

গঙ্গা, পদ্মা উজিয়ে যে ইলিশ আসে, তাকে ইলিশ বললেও অন্য নদীতে ইলিশ পাওয়া গেলে, তার আর ইলিশ নাম থাকে না। সৈয়দ মুজতবা আলী 'পঞ্চতন্ত্র'-তে লিখছেন, নর্মদা উজিয়ে যে ইলিশ আসে, ভৃগুকচ্ছের মানুষের কাছে তা 'মদার'। পার্সিদের কাছে তার নাম 'বিম'। সিন্ধু নদ উজিয়ে এলে ওই মাছের নাম 'পাল্লা'। তামিলরা ইলিশকে বলে 'উলম'। গুজরাতিরা পুরুষ ইলিশকে বলে 'পালভো', স্ত্রী ইলিশকে বলে 'মোদেন'। তাছাড়াও ইলিশের অনেক নাম: খয়রা ইলিশ, গৌরী ইলিশ, চন্দনা ইলিশ, গুর্তা ইলিশ, সকড়ি ইলিশ, জাটকা ইলিশ, ফ্যাসা ইলিশ, খ্যাপতা ইলিশ, মুখপোড়া ইলিশ – এমন নানা রকম। বাংলাদেশে যে ইলিশ বিলে পাওয়া যায়, তাকে লোকে বলে 'বিলিশ'। অন্য মাছের তুলনায় ইলিশের কৌলীন্য বেশি।

সাহিত্যিক শঙ্করের কথায় মৎস্য সমাজে ইলিশ একমাত্র উপবীতধারী। তার দু'পিঠে যে দুটো সুতো থাকে, তার নাম পৈতা। আজ থেকে প্রায় ন'শ বছর আগে জীমূতবাহন তাঁর 'কালবিবেক' গ্রন্থে এই বিখ্যাত মাছটির নাম দিয়েছিলেন 'ইলিশ'। আর ১৮২২ সালে মৎস্যবিজ্ঞানী হ্যামিলটন সাহেব এই মাছটির বিজ্ঞানসম্মত নাম দিলেন 'হিলসা'। ১৯৫৫ সালে এই মাছের বিজ্ঞানসম্মত নামটি পাল্টে হল 'টেনুয়ালোসা হিলসা'। এই 'টেনুয়ালোসা' শব্দটি ইলিশেরই উপযুক্ত। শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'টেনিয়াস' থেকে, যার অর্থ পাতলা। ঝরঝরে চকচকে পাতলা শরীরের সুন্দরীর এমন নাম বেশ মানানসই। যা সুন্দর তাতে কাঁটা থাকে, যেমন গোলাপ। ইলিশ-সুন্দরীর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। তার পেটের কাছের কাঁটা দেখে প্রজাতি ঠিক করা হয়। এই কাঁটাগুলো দেখতে ইংরেজি 'ভি'-

অক্ষরের মতো | যাকে 'স্কুট' বলা হয় | এই স্কুটের সংখ্যা অনুযায়ী ইলিশের প্রজাতি পাঁচ রকম | ইলিশের আবার বহুরূপী আছে | ইলিশ-সুন্দরীর মতো দেখতে হলেও স্বাদে-গন্ধে তারা কিন্তু ইলিশ নয় | যেমন, চাপিলা মাছ এবং কই-পুঁটি |

আমাদের রাজ্যে ইলিশের জন্য একটা জল-জঙ্গল তৈরি করা হয়েছে | ২০১৩ সালে রাজ্য সরকারের মৎস্য দফতর তার জন্য একটি আইনও তৈরি করে ফেলেছে | সেই আইনের অধীনে ইলিশের জন্য তৈরি হয়েছে 'ইলিশ অভয়ারণ্য' | গঙ্গার মোহনা থেকে ফরাক্কা পর্যন্ত কয়েকটি অংশ ডিম পাড়ার জন্য ইলিশের বড় পছন্দের | যেমন লালগোলা থেকে ফরাক্কা অংশ, কাটোয়া থেকে হুগলি ঘাট, ডায়মন্ড হারবার থেকে নিশ্চিন্তিপুর গদখালি অংশে ইলিশ ডিম পেড়ে তার বাচ্চাদের বড় করে | আর বাংলাদেশে ছ'টি 'ইলিশ অভয়াশ্রম' স্থাপিত হয়েছে, যেগুলো মেঘনা অববাহিকা এবং পদ্মা-মেঘনার সংযোগস্থলে অবস্থিত | পদ্মা ও মেঘনা নদী ছাড়াও শাহবাজপুর নদী, তেঁতুলদিয়া নদী, আন্ধারমানিক নদীতেও ইলিশ পাওয়া যায় |

ঘটি আর বাঙালদের মধ্যে চিরকালের লড়াই ইলিশ নিয়ে | বলা ভাল, ইলিশের স্বাদ নিয়ে | সমুদ্রে থাকার সময় ইলিশের শরীর ছোট, পাতলা আর কম স্বাদের হয় | নোনা জলের সংসার থেকে মিষ্টি জলের সংসারে ঢোকার সময় থেকে ইলিশ পুষ্ট হতে থাকে | তার স্বাদ বাড়তে থাকে | আর লকডাউন ইলিশকে আরও একটু বেশি স্বাদ দিল | লকডাউনে নদীগুলো জলের গুণমান ফিরে পেয়েছে | গঙ্গাও অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে দূষণ | ইলিশ যেসব খাবার খেয়ে বাঁচে, তারা হ'ল নীল-সবুজ শেওলা, কোপেপড, ক্লাদকেরা, রেটিফারের মতো জলে মিশে থাকা খাবার | নদীর জল ভাল হওয়ায় নদীর জলে মিশে থাকা খাবারও উন্নত হয়েছে | ভাল মানের খাবার খেয়ে ইলিশের স্বাদ বাড়বে, এটাই মৎস্যবিজ্ঞানীদের মত |

ইলিশ নদীর যত গভীরে যায়, তত খাবার খাওয়া কমিয়ে দেয় | তখন সে তার শরীরে জমে থাকা ফ্যাট থেকে শক্তি সংগ্রহ করে | ফলে শরীরে চর্বির পরিমাণ কমতে থাকে | আর ইলিশ নরম এবং সুস্বাদু হয়ে ওঠে | এ ছাড়াও মাছের শরীরে কিছু ফ্যাটি অ্যাসিডের জন্ম হয় ও তার নানা রূপান্তর ঘটে | এর ফলেও বাড়ে ইলিশের স্বাদ ও গন্ধ |

বাঙালি দাম্পত্যজীবনের সঙ্গে ইলিশের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | বাঙালির বিয়ের পরবর্তী অবস্থাকে জালে পড়া ইলিশের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন | আর এক নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনও ইলিশ-প্রেমিক | কলকাতায় থাকলে গঙ্গার ইলিশ তাঁর মেনুতে থাকবেই | সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তো লিখেইছেন, ইলিশের স্বাদ দেড় কিলো থেকে পৌনে দু'কিলোয় | তিনি বিশ্বাস করতেন, 'দুধের স্বাদ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই খাঁটি ইলিশের স্বাদের সঙ্গে অন্য কোনও কিছুর সমঝোতা চলে না' | আবার কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখেছিলেন, 'সপ্তমী পুজোর দিনে আমি সওয়া দেড় কেজি ওজনের এমন একটা সুলক্ষণ ইলিশ মাছ কিনব, যার পেটে সদ্য ডিমের ছড় পড়েছে |' সুলক্ষণ বলতে তিনি সেই ধরনের ইলিশের কথা বলেছেন, যার চেহারা একটু গোলাকার, পেট সরু এবং মাথাটা আকারে ছোটখাটো |

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র একত্রিশটি মাছের উল্লেখ করেছিলেন, যার শেষেরটি ইলিশ | হুমায়ুন আহমেদ মনে করতেন, বাংলা বর্ণমালার শিশুশিক্ষার বইয়ে 'আ'-তে যদি আম হয়, তা হলে 'ই'-তে ইলিশ | পদ্মার অরিজিনাল ইলিশ বোঝার উপায় ইলিশের নাক ভাঙা দেখে | ইলিশ যখন পদ্মায় ঢোকে, হার্ডিন ব্রিজের স্প্যানে ধাক্কা খায় | আর তাতেই ইলিশের নাক থেঁতো হয়ে যায় | সেই সব নাকভাঙা ইলিশই আসল পদ্মার ইলিশ | এদেশীয়রা গঙ্গা ও পদ্মার ইলিশের তুলনা টানলেও, বাংলাদেশের মানুষজন গঙ্গার ইলিশকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না | তাঁদের তুলনার বিষয় হল, পদ্মার ইলিশে বেশি স্বাদ না যমুনার ইলিশে | সুরমা নদীর ইলিশের স্বাদ বাংলাদেশের মানুষ মোটেই পছন্দ করেন না | কারণ সেটা খেতে গভীর সমুদ্রের ইলিশের মতো | এমনই সব গল্প শুনিয়েছে হিমু |

পরিমল গোস্বামী রেডিওতে পড়া এক কথিকায় বলেছিলেন, "গীতায় ভগবান বলেছিলেন যে, আমাকে যে যেখানেই ভজুক আমি তাকে তুষ্ট করি | আর ইলিশ আমাদের বলেন, যে যেমন করেই আমাকে ভাজুক, আমি তাকে তুষ্ট করি |" যম দত্ত মনে করতেন কলকাতার ইলিশের সুগন্ধ বেশি | কমল মজুমদারও তা-ই মনে করেন, পদ্মার থেকে গঙ্গার ইলিশ অনেক ভাল | মজা করে বলতেন, গঙ্গার ইলিশ দু'শ বছর

ধরে কম্পানির (ব্রিটিশদের) তেল খেয়েছে। এই ইলিশকে টেক্কা দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। স্বামী বিবেকানন্দও মাঝগঙ্গার ইলিশ খেতেই বেশি পছন্দ করতেন। এত কিছুর পরেও একটা 'কিন্তু' আছে। লেখক অমিতাভ ঘোষ মনে করেন, কেউ বাঙালি কিনা তার পরীক্ষা নিতে গেলে 'ইলিশ খেতে পারেন কিনা' জানতে চাওয়ার থেকে জরুরি, তিনি পাঁকাল মাছ খান কিনা, শোল-মূলো খান কিনা, এগুলো জানতে চাওয়া। ইলিশ-রুই-কাতলা করে আমরা অন্য মাছগুলো হারিয়ে ফেলেছি। আর অতিরিক্ত চাহিদার চাপে ইলিশের মতো মাছও আজ বিপন্ন।

এই কথাগুলো পড়তে যে সময় লাগে, সেই সময়টুকুতেই ইলিশরা মিঠে জলে ১৫ থেকে ১৮ লাখ ডিম পাড়ল। ডিম ফুটে ছয় থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চারা ১২ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে গেল। এর পর খোকা ইলিশ পাঁচ থেকে ছ'মাস নদীতে কাটিয়ে শুরু করল তার ক্যাটাড্রোমাস পরিযান। মানে মিষ্টি জল থেকে ফিরে গেল ভাটির টানে, সাগর পানে। বড় হয়ে ফের শীতে আসবে বলে।

ঋণ স্বীকারঃ
ইলিশ গদ্য-চালিশার নামটি বুদ্ধদেব বসু নামক পন্ডিত প্রবর লেখক কবি, প্রাবন্ধিক, সমালোচক ও অধ্যাপক মহাশয়ের কাছ থেকে ধার করা।

স্নানের জলে দু'চার ফোঁটা

রিমি পতি

সপ্তমীর সকাল, এইদিন সকাল থেকেই ঘাটে ঘাটে শুরু হয়ে যায় নবপত্রিকার স্নান। হলুদ মাখানো, গাছকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে মূল পুজো মণ্ডপে। মহালয়ার দিন গঙ্গার জলে স্নানসহ পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ, মকর সংক্রান্তির ভোরে স্নান, কুম্ভমেলায় পুণ্যস্নান ইত্যাদি বিভিন্ন তিথিতে আনুষ্ঠানিক স্নানের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে হিন্দুদের দৈনন্দিন জীবনে। নদীর তীর ঘেঁষেই বেশিরভাগ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, কাজেই মানুষের দৈনন্দিন জীবনে, ধর্মীয় প্রকাশে নদী ও জল ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকবে এটা আশ্চর্য নয়। মতি নন্দীর 'কোণি' উপন্যাসে, প্রথম পরিচ্ছেদেই আছে বারুণীর তিথিতে গঙ্গার ঘাটের দৃশ্য। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে বরুণ দেবতার উদ্দেশ্যে গঙ্গায় প্রচুর দান সামগ্রীর ছড়াছড়ি, সেখানে জলের নীচ থেকে উৎসর্গ করা আম তুলে আনতে ব্যস্ত ছিল সাঁতার পটু, ডানপিটে মেয়ে কোণি। আরেকটি বিখ্যাত স্নানযাত্রা হ'ল পুরীতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার স্নানযাত্রা। ১০৮ কলসি জল ঢেলে স্নান করানো হয় জগন্নাথকে।

হলিউডের ছবিতে নায়ক নায়িকার দুর্ধর্ষ স্নানের দৃশ্য কম বেশি আমরা সকলেই দেখেছি। 'সেভেন ইয়ার ইচ' ছবিতে নায়িকা ম্যারিলিন মনরোর একটি ফেনাময় বাথটাবে স্নানের দৃশ্য আজও দর্শককে বিমোহিত করতে সক্ষম। পুরুষের স্নানের দৃশ্য হিসেবে জেমস বন্ড-এর 'ডায়মন্ডস্ আর ফরএভার' ছবির কথা বলাই যায়। বাথটাব ভর্তি সাবানের ফেনা, পছন্দমতো মারটিনি, বাথ ট্রেতে ম্যাগাজিন, হাতে টেলিফোন – কী নেই সেখানে! এ ধরনের দৃশ্য প্রায় সাত-আট দশক ধরে চলছে হলিউডে। অন্যদিকে কিছুটা কৃত্রিম মনে হলেও বলিউড ছবিতে সেকালের দুঃসাহসী নায়িকা জিনৎ আমান বা আজকের করিনা কাপুররা পাল্লা দিয়ে চেষ্টা করেছেন তাদের ধারাস্নানের দৃশ্য সেলুলয়েডে অমর করে রাখতে। সুরেলা গান, জলপ্রপাত, লেক, নদী, নায়িকার স্বচ্ছ, স্বল্প বেশবাস সঙ্গত করেছে যথাসাধ্য।
তবে বাস্তব দুনিয়ায় ছবিটা এতটা মনোগ্রাহী নয়। আপামর ভারতবাসীর প্রাত্যহিক স্নানে অতিরিক্ত বিলাসিতা তো দূরস্থান,

ইচ্ছেমতো জল খরচের স্বাধীনতাও নেই | অনেকেই টিউবওয়েলের জলে, রাস্তার কলে বা জমিয়ে রাখা দু-এক বালতি জলেই কাজ সারেন | উচ্চ মধ্যবিত্তরা হয়তো ধারাস্নান করতে পারেন তবে দেশের বেশিরভাগ জায়গাতেই আজও কল খুললেই পাশ্চাত্য দেশের মতো ঠান্ডা ও গরম দুই ধারার জলের ব্যবস্থা নেই, অগাধ জল খরচও সম্ভব হয় না |

কিন্তু মানুষ যে চিরকাল সর্ব যুগে, দুনিয়ার সব জায়গায় এতটা স্নান-বিলাসী ছিল, এমন কিন্তু নয় | প্রাচীন গ্রীসে বাথ-হাউস ছিল একটি সামাজিক মেলামেশার স্থান | সেখানে স্নানের জলে সুগন্ধি ভেষজ খনিজ পদার্থ, ওষধিযুক্ত তেল মেশানো হতো ব্যথা উপশম হওয়ার জন্য | ছাই, মাটি, ঝামা পাথর এবং ঠান্ডা ও গরম জলের ব্যবস্থাও ছিল | এইসব বাথ-হাউসে শুধুমাত্র শুচিশুদ্ধ হওয়া নয়, মস্তিষ্ক সঞ্চালনের কাজও চলত | নানা রাজনৈতিক, দার্শনিক, সামাজিক আলোচনার কেন্দ্রস্থল ছিল গ্রীক বাথ-হাউস বা বালনিয়াম | প্রাচীন রোমেও ছিল বাথ-হাউসে স্নান করতে যাওয়ার রীতি | দেবী সুলিস মিনারভা ছিলেন স্নান ঘরের উপাস্য দেবী | নারী, পুরুষের স্নানের ব্যবস্থা সাধারণত আলাদা ছিল | সে সময় অন্যের ব্যবহৃত জল বা শরীর থেকে নির্গত স্বেদকে হানিকারক মনে করা হতো না | সাবানের প্রচলন হয়নি তখনও, তবে অলিভ তেল ও পিতলের তৈরি কাস্তের মতো বাঁকানো স্ট্রেজিল নামক মার্জনী দিয়ে যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন হওয়ায় বাধা পড়ত না | আরো আগে প্রাচীন মিশরেও স্নানকে একটি রোগ উপশমের উপায় হিসেবে মনে করা হতো | রানী ক্লিওপেট্রার গাধার দুধে স্নানের কিংবদন্তি সবাই শুনেছেন | প্রাচীন চীনে, হান বংশের রাজত্বে প্রতি পাঁচদিনে একদিন স্নানের জন্য বরাদ্দ ছিল এবং সেদিন সরকারী দপ্তরে ছুটি থাকত |

গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলোতে স্নানের প্রচলন চিরকালই ছিল | সূর্যের দাবদাহ থেকে রক্ষা পাওয়া, অতিরিক্ত স্বেদ ইত্যাদির মোকাবিলায় স্নানের বিকল্প নেই | উষ্ণ জলহাওয়া থাকার ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের বেশিরভাগ মানুষ কোনোদিনই তেমন স্নান-বিমুখ হয়নি | প্রাচীন পুঁথিতে দিনে তিনবার স্নান করার বিধান আছে | ইসলামেও স্নান বা গোসল একটা পবিত্র কর্তব্য | এই গোসলের নানা নিয়ম আছে | ফরজ গোসলে পুরুষের দাড়ি ও উভয় লিঙ্গেরই চুলের গোড়া পর্যন্ত জলে ভেজাতে হবে | গোসল করার সুউন্নত পদ্ধতি অনুযায়ী শরীর তিনবার ধৌত করা, দুটো হাত কব্জি অবধি ধোয়া, পা ধোয়া ও মাথায় জল ঢালা, নাকের ভেতর জল দেওয়া এইমতো বিধান আছে | মোট কথা শরীরে জল না ঠেকিয়ে পূজাপাঠ বা নামাজ আদায় কোনটাই যথাস্থানে পৌঁছাবে না, এমনই আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস |

ইহুদী ধর্মে 'মিকভে' বা একটি সার্বজনীন জলাশয় অত্যন্ত জরুরী বলে মানা হয় | এই মিকভে বা রিচুয়াল বাথে মাথা সম্পূর্ণ ভিজিয়ে স্নান না করা পর্যন্ত বিবাহিত নারীদের ঋতুস্রাব, বা গর্ভ অবস্থার অশুচিতা কাটত না | ঘরে ঘরে নিজস্ব বিলাসবহুল স্নানের ঘর থাকতেও এই মিকভে আজও রক্ষণশীল ইহুদী সমাজে ব্রাত্য হয়ে যায়নি | 'ইয়মকিপুর'-এর আগে পুরুষদেরও মিকভেতে ডুব দিয়ে স্নান করার রেওয়াজ আছে | কেউ কেউ প্রতি 'সাবাথ'-এ এই ধর্মীয় আচার পালন করে শুদ্ধ হন | এত স্থান বদল, এত বঞ্চনা, এত অত্যাচার সয়েও এই প্রাচীন নিয়মগুলো আজও বহাল আছে দেখে অবাক হতে হয় |

প্রাচ্যে, বিশেষকরে মধ্যপ্রাচ্যে স্নানের জন্য ছিল 'হামাম' | আধুনিক প্লাম্বিং আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত এই হামাম ছিল জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা | এই হামামগুলিতে প্রথমে একটি অভ্যর্থনা কেন্দ্র, তারপর বাষ্পস্নান, অবশেষে সাধারণ তাপমাত্রার জলের স্নানকক্ষ থাকত | আমির, উমরাওদের প্রাসাদের মধ্যেই নিজস্ব হামামের ব্যবস্থা ছিল | এখন আধুনিক টার্কিশ হামামে বা অন্য কোন বাষ্পকক্ষে প্রবেশের আগে একটা ন্যূনতম ধারাস্নান আবশ্যক | মুঘল আমলে হারেমের অধিবাসী রানী ও অন্যান্য নারীদের বিলাসবহুল স্নানের আয়োজন আজকের পশ্চিমী কায়দার 'স্পা' সংস্কৃতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাতে পারে অবলীলায় |

খ্রীষ্টান ধর্মে ব্যাপ্টিজম একটি সুপরিচিত বিধি | সম্পূর্ণ শরীর জলে নিমজ্জিত করা বা সামান্য জল মাথায় ছিটিয়ে শুদ্ধ করা দুভাবেই করা হয়ে থাকে | তবে ইউরোপে মধ্যযুগে খ্রীষ্ট-ধর্ম অবলম্বী রাজা, রানীদের স্নানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় | কথিত আছে ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুই মাত্র তিনবার স্নান করেছিলেন সারা জীবনে | সেকালে ফরাসী রাজ পরিবারে এবং তাদের অভিজাত অমাত্যগণের মধ্যে একগোছা সুগন্ধী লতাপাতা, ফুল সর্বদা কোঁচড়ে নিয়ে রাখার প্রথা ছিল | এতে শরীরের দুর্গন্ধ কিছুটা ঠেকিয়ে রাখা যেত | বলা বাহুল্য ফরাসীদের স্নানে অনীহা

ও সুগন্ধ প্রীতি সুবিখ্যাত এবং পরবর্তীতে সুগন্ধি ব্যবহারকে সমগ্র নারীপুরুষের সাজসজ্জার অঙ্গ করে তোলায় সহায়ক | সাধারণ অবস্থার মানুষ অবশ্য বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে কম মূল্যে সহজলভ্য সুগন্ধি হাতে পেয়েছে |

"There must be quite a few things
a hot bath won't cure,
but I don't know many of them..."

Sylvia Plath, The Bell Jar

স্নান করলে রোমকূপ দিয়ে রোগ প্রবেশ করে – এই ধারনা থেকেই মধ্যযুগে স্নানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় | শীতপ্রধান দেশে প্রায় ১৯০০ শতক পর্যন্ত নিয়মিত স্নানের সুব্যবস্থা ছিল না | শয়নকক্ষে একটি সরুগলা পাত্রে জল নিয়ে সেখান থেকে ছোট পাত্রে ঢেলে, একটি শুকনো কাপড় সেই জলে ভিজিয়ে নিয়ে হাত, মুখ মুছে নিলেই দিব্যি কাজ চলে যেত | সপ্তাহে একটাই দিন সম্পূর্ণ স্নানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল | সেদিন জল গরম করে রান্নাঘরের আগুনের সামনে একটি বড় কাঠের বা লোহার গামলায় বাড়ির সব কয়জন সদস্য স্নান সেরে নিতেন | সর্ব কনিষ্ঠ সদস্যটির পালা আসত সবার শেষে, এরপর সেই বহুল ব্যবহৃত জল বাইরে ফেলে দেওয়া হতো | এই কারণে "বাচ্চাকে চানের জলের সঙ্গে বাইরে ফেলে দিও না" এই প্রবাদ বাক্যটি চালু হয়েছে |

পুরুষদের মাথার চুল তৈলাক্ত লোশন, চিরুনি ও বুরুশেই পরিচ্ছন্ন হতো; জলের বালাই ছিল না | এই সেকেলে পরিষ্কার-পদ্ধতি নিজের উপর প্রয়োগ করে দেখেছেন 'হাউ টু বি আ ভিক্টোরিয়ান' বইয়ের লেখিকা শ্রীমতী রুথ গুডম্যান | তিনি দেখেছেন যে আধুনিক সাবান, শ্যাম্পু সহকারে প্রতিদিন স্নানের অভ্যাসকে বর্জন করেও নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব |

১৮৪০-এর পর মাসে এক আধবার মাথার চুল ধোওয়ার অভ্যাস আয়ত্ত করলেন বিলেতের বাসিন্দারা | মেয়েরা মাথা নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে একটি জগ থেকে জল ঢেলে বেসিনের মধ্যে চুল ধুতেন | রোজমেরি পাতার জল দিয়ে চুল ধোওয়া জনপ্রিয় ছিল তখন | সেসময়ের তৈরী সাবান ছিল অতিরিক্ত অ্যাল্কালাইন ও ক্ষারযুক্ত, সুতরাং সাবধানতা অবলম্বন না করলে রুক্ষ চুলের সমস্যা হতো | আলাদা ওয়াশ বেসিন বা স্নানের ঘর অপ্রতুল, কাজেই রান্নাঘরেই যাবতীয় শরীর বা মাথা ধোওয়ার কাজ সারতে হতো | গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মতো পাশ্চাত্য দেশে বাড়ির পেছনে খিড়কির পুকুরের জলে একটি ডুব দিয়ে স্নানপর্ব সেরে আসার উপায় ছিল না |

ভারতের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পুষ্করিণী বা নদীতে স্নান করতে যেতেন সবাই | রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' বইতে চাকরদের তদারকিতে স্নানে যাওয়ার কথা খুব সুন্দরভাবে বলা আছে | এর কয়েকটা লাইন আজও মনে পড়ে যায়, "নটা বাজে | বেঁটে কালো গোবিন্দ কাঁধে হলদে রঙের ময়লা গামছা ঝুলিয়ে আমাকে নিয়ে যায় স্নান করাতে" – ছুটির দিন তাঁকে কমলালেবুর খোসাবাটা, বাদামবাটাসহ সর-ময়দা মাখানো হতো যাতে গৌরবর্ণ মেটে না হয়ে যায় | আজ উচ্চ মধ্যবিত্ত বাড়িতে তো বটেই, সাধারণ ছাপোষা ঘরেও শ্যাম্পু, সাবান ব্যবহার করছে প্রত্যেকে | লিরিল সাবানের সেই জলপ্রপাতে অফুরন্ত ফেনার বিজ্ঞাপনের পর লাইফবয় বা সানলাইট সাবান ব্রাত্য হয়েছে, নানা কৃত্রিম রাসায়নিক ও সুগন্ধিযুক্ত প্রসাধনী ব্যবহারের ঝোঁক বেড়েছে | এতে স্বাস্থ্য বা শুচিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এমনটা নয় |

বিগত এক শতকে আমরা হাজার হাজার বিজ্ঞাপনের প্রভাবে প্রতিদিন স্নান ও বিশেষ সাবান, শ্যাম্পুর ব্যবহারকে একটা অবশ্য কর্তব্য মনে করেছি | ইদানীং গত কয়েক বছর ধরে কিছু কিছু সমাজ মাধ্যমের প্রভাবশালী তারকারা অন্য সুর ধরেছেন | তাঁরা 'নাথিং শাওয়ারে' জানিয়ে দিচ্ছেন যে শুধু গরম বা ঠান্ডা জলে ধারাস্নান করছেন, বিনা সাবানে | এই অভিজ্ঞতা তাঁদের 'স্পিরিচুয়াল' শান্তি এনে দিচ্ছে | ওদিকে আবার কোন কোন রূপবান বিখ্যাত হলিউড তারকা প্রতিদিন স্নান করছেন না, শ্যাম্পু ব্রাত্য | এসব ব্যক্তিগত বিষয় তাঁদের অগুন্তি ভক্তের কানে পৌঁছাতে দেরী হচ্ছে না সমাজ মাধ্যমের দৌলতে | শিশুদেরও রোজ স্নান আবশ্যক মনে করছেন না এই তারকারা; এতে ত্বক ভাল থাকে, নিজের মাইক্রোবায়োম (microbiome) সুরক্ষিত থাকে, মাথার ত্বক শুষ্ক হয় না – ইত্যাদি নানান সুবিধে হয় | পরের বছর হয়তো অন্য হ্যাশট্যাগযুক্ত বিশেষ কোনও স্নান বা বিনা স্নানের কায়দা কৌশলের হুজুগ উঠবে |

কাজেই নিজস্ব সার্বিক সুস্বাস্থ্য রক্ষা করতে স্নানসহ অন্যান্য বিষয় কতটা উচিত বা অনুচিত সেসব নির্ধারণ করার দায় পাঠকের |

ধারণা

রামেশ্বর কাম্বোজ
অনুবাদ: বেবী কারফরমা

আমি এই শহরের কিছুই চিনতাম না | অনেক দৌড়াদৌড়ি করার পর এই এলাকায় একটা বাড়ি খুঁজে পেয়েছিলাম | পরশুদিন থেকে সপরিবারে থাকতে শুরু করেছি | কথায় কথায় অফিসের সবাই জানতে পেরেছে যে পাশের পাড়ায় আমি সপরিবারে থাকতে শুরু করেছি | বড় সাহেব আশ্চর্য হয়ে বললেন, "আপনি পরিবার নিয়ে ওই পাড়ায় থাকতে পারবেন?"
- "কেন, কিছু গণ্ডগোল আছে নাকি ওখানে?" আমি ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম |
- "একটা নোংরা জায়গা, রোজ কিছু না কিছু ঝামেলা লেগেই থাকে, একটু সতর্ক থাকবেন |" সাহেবের মাথায় চিন্তার ভাঁজ দেখা গেল | তিনি বললেন, "পাড়াটার খুব বদনাম আছে, প্রায়ই মারপিট হয় ওখানে |"
আমি নিজের চেয়ারে এসে বসেছি, তো এক কলিগ এসে বললেন, "স্যার! আপনি ওই নোংরা পাড়ায় ঘর নিয়েছেন?"
- "বুঝতে পারছি, একেবারেই ঠিক করিনি |" আমি অনুতাপের সুরে বললাম |
- "হ্যাঁ স্যার, ঠিক করেননি | ওই মহল্লা থাকার উপযুক্ত নয় | যত তাড়াতাড়ি হয় অন্যত্র উঠে যান |"
তার চোখের ভাষা আমায় আরও চিন্তায় ফেলল | আমি বেশ মুষড়ে পড়লাম | বাড়ির সামনে পান, লজেন্স বিক্রেতার উপর নজর পড়ল | কালো-মোটা চওড়া গোছের লোকটাকে দেখে পুরো গুন্ডা মনে হ'ল | তার উপর কচর কচর করে পান চিবাচ্ছে, তাতে তাকে আরও বীভৎস দেখাচ্ছে |

সত্যিই খুব খারাপ জায়গায় এসে উঠেছি | সারারাত ঘুমোতে পারছিলাম না | ছাদে যেন কার লাফিয়ে পড়ার আওয়াজ পেলাম | আমার দম বন্ধ হয়ে এল | আমি ভয়ে পা টিপে টিপে বাইরে এলাম | বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করতে লাগল | কার্নিশের দিকে তাকাতেই দেখলাম একটা বিড়াল বসে আছে |
আজ দুপুরে বাজার থেকে ফিরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম | কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দরজায় খটখট আওয়াজ, দরজাটা খোলাই ছিল | আমি ধড়মড় করে উঠে বসে পড়লাম |
সামনে ওই গোঁফওয়ালা পানের দোকানদার দাঁড়িয়ে | দুপুরে চারিদিক শুনশান | আমাকে খুন করে পালালে কেউ তো জানতেও পারবে না!
- "কিছু বলবে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম |
- "মনে হচ্ছে, আপনার ছেলেই হবে, লজেন্স নিতে এসেছিল আমার কাছে | ও আমাকে এই নোটটা দিয়েছিল |" বলে সে আমার দিকে একটা একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিল | আমি চমকে উঠলাম, আরে এই নোটটা তো আমার জামার পকেটে ছিল! আমি জামাটা দেখলাম, পকেট খালি | বুঝলাম সোনু চুপচাপ নোটটা পকেট থেকে বের করে নিয়েছে |
- "লজেন্সের দাম কত হয়েছে?"
- "মাত্র পঞ্চাশ পয়সা, পরে দিয়ে দেবেন'খন |" বলে সে পান চিবাতে চিবাতে হাসল | ফিরে যাওয়ার আগে বলে গেল, "আচ্ছা বাবু, নমস্কার"|
আমি এবার একটু হালকা বোধ করতে লাগলাম |

মন-উড়ান

অনিন্দিতা রায় বিশ্বাস

কথায় আছে বাঙালির নাকি পায়ের তলায় সরষে! ভ্রমণ-রসিক পরিবারে জন্ম ও বেড়ে ওঠার সূত্রে ছোটবেলা থেকে কাছে ও দূরের অনেক জায়গাতেই ঘুরে আসার সুযোগ হয়েছে। বিয়ের পর স্বামীর কর্মসূত্রে কলকাতা থেকে প্রথমে যাই হায়দরাবাদে, তারপর অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ও সেখান থেকে আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা ঘুরে আপাতত আমরা অ্যারিজোনার মরু-শহরের নিবাসী। আমাদের দুজনের জীবনদর্শনে একটি বিষয়ে বিশেষ মিল – এই সুন্দর পৃথিবীর বুকে জন্মেছি, যতটা পারি তার সৌন্দর্য দেখে যাব! তাই বিয়ের পরে মধুচন্দ্রিমা থেকেই শুরু হয়েছিল আমাদের একসাথে ঘুরে বেড়ানো। প্রথমদিকে সাধ্যের একটু অভাব ছিল ঠিকই, কিন্তু সাধ ও সদিচ্ছা যদি থাকে, সৃষ্টিকর্তা কোনও না কোনো উপায় জুটিয়েই দেন। তাই আস্তে আস্তে আমাদের নতুন জায়গা দেখার পরিসর বাড়তে থাকল।

এই ইঁট কংক্রিটের শহরে প্রকৃতির সব সৌন্দর্যের সঠিক পরিমিতি বুঝতে পারি না সব সময়। কখনো কখনো হয়তো অতি কাছের অনেক জিনিসকে না জেনেই জীবন কেটে যায়। বাড়ির পাশের চেরিগাছটা যখন বসন্তে একরাশ সাদা মেঘের ভেলার মতো সাদা ফুলে ভরে ওঠে – আমি টের পাই না, সামনের ছোট্ট লেকটায় হঠাৎ বর্ষায় যখন মেঘ গর্জনের একটা ভীষণ সুন্দর জলছবি ফুটে ওঠে – তখনও হয়তো সেভাবে খেয়াল করে দেখার সুযোগ হয় না। রোজকার দিনলিপিতে ব্যস্ততার ভিড়ে কত কী মণিমুক্তো এভাবে অদেখা থেকে যায়! তাই তো মাঝে মাঝেই সময় করে ছুটে যেতে হয় প্রকৃতির কোলে। নদী-বন-পাহাড়-ঝর্ণা-সমুদ্র... এই সবকিছুর গন্ধ নিতে গেলে তাদের কাছে যেতে হয়। অদেখা, অচেনা প্রকৃতির ভেতরে জীবনের এক মাতোয়ারা গন্ধ পাওয়া যায়। আজকের গল্প সেইরকমই কিছু খুব ভাল লাগার জায়গা নিয়ে।

জীবনের গল্প স্মৃতিমেদুরতায় মাখামাখি। প্রথমেই বলি ১৫ বছর আগে ২০০৯ সালের কথা; খুব কম বয়সেই যখন একসাথে পথ চলা শুরু করেছিলাম দুজনে, ঠিক করেছিলাম নিজেদের স্বল্প সাধ্যেই একে অপরের হাতে হাত রেখে হেঁটে আসব এক নির্জন পাহাড়ের বুকে।

'উটি' একটি জনপ্রিয় জায়গা, কিন্তু আমরা খুঁজছিলাম নিরিবিলি কোনো শৈলশহর – একটু কম বাণিজ্যিক পর্যটনকেন্দ্র। এভাবেই পছন্দ হয়ে গেল 'কোদাইকানাল'।

মাদুরাই জেলার উত্তর পশ্চিমে পালানী পাহাড়ের প্রায় ৭০০০ ফুট উচ্চতায় ২১৪৬ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে এই মনোরম পাহাড়ি শহর। 'কোদাই' শব্দটির অর্থ 'অরণ্যের উপহার'। সবুজ গাছপালা, রঙিন ফুলেভরা কোদাই লেককে কেন্দ্র করে কোদাইকানাল শহরের গোড়াপত্তন করা হয় ১৮৪৫ সালে। 'কোদাই রোড' স্টেশন থেকে গাড়িতে পাহাড়ি সর্পিল পাকদণ্ডী পথ বেয়ে প্রায় ২-৩ ঘন্টায় কলা আর ইউকালিপটাস গাছের জঙ্গল পেরিয়ে পৌঁছে যাই আমাদের গন্তব্যে। পাহাড়ের ঢালে কফির ক্ষেত, সঙ্গে আঙুরের চাষও হচ্ছিল জায়গায় জায়গায়। গাড়ি যত ওপরে উঠছে ততই একটা ঠান্ডা শিরশিরানি ছুঁয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন ভিউ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে মেঘের সাথে লুকোচুরি খেলতে খেলতে ছবি তোলার চেষ্টা।

লেক ছাড়াও কোদাইকানালে আরো অনেক দর্শনীয় জায়গা আছে – ব্রায়ান্ট পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, সিলভার ক্যাসকেড ফলস্, কোকার্স ওয়াক, পিলার রকস্, গুনা কেভস্, বিয়ার শোলা ফলস্, পাইন ফরেস্ট, ডলফিন নোস্, কুরিনজি মন্দির, সোলার অবসার্ভেটরি ইত্যাদি সব জনপ্রিয় ট্যুরিস্ট স্পটস্। তবে আপনি কতটা নির্জন সৌন্দর্য ভালবাসবেন, আর কতটা আকর্ষণীয় জনবহুল জায়গায় গাইডের সাথে ঘুরবেন, তা পুরোটাই নিজস্ব পছন্দের ওপর নির্ভর করছে। আমাদের কথা যদি বলি – ঝর্ণার ধারে বসে অনেকক্ষণ জলের কলতান শোনা, পাহাড়ের গা বেয়ে হাত ধরে হাঁটা, লেকে বোটিং করা বা লেকের

চারদিকে দুজনে মিলে সাইকেল নিয়ে ঘুরে আসার স্মৃতি এতদিন পরেও একঝলক টাটকা বাতাসের মতো মন জুড়ে রয়ে গেছে।

এরপরে চলে আসি ২০১১ সালে | আমরা তখন থাকি অস্ট্রেলিয়ার কসমোপলিটান শহর, মেলবোর্নে | এখানকার দর্শনীয় স্থান তো অনেক; ইয়ারা ভ্যালি প্রকৃতির অমলিন সৌন্দর্য ভান্ডার – আঙুরের ক্ষেত, ফসলের মাঠ, গ্রামের হস্তশিল্পের বুটিক, ঢেউখেলানো উপত্যকায় অস্ট্রেলিয়ান জার্সি গাইয়ের পাল... এইসব দেখার জন্য পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে পর্যটকরা ছুটে আসেন | আমরাও তার ব্যতিক্রম ছিলাম না | অস্ট্রেলিয়ায় অভিনব বন্য প্রজাতির সমাহার | এমু, কোয়ালা, প্ল্যাটিপাস, তাসমানিয়ান ডেভিল ও আরও কত পশুপাখি ও গাছপালা নিয়ে অনেক ছোট-বড় রক্ষণশালা রয়েছে | তার মধ্যে অন্যতম ইয়ারা রেঞ্জের পাদদেশে Healesville Sanctuary. এছাড়া আরো একটি বিশেষ আকর্ষণ, সাগরপাড়ে ফিলিপ আইল্যান্ডে সূর্যাস্তের সময় হাজার হাজার পেঙ্গুইনের মিছিল করে বালির ঢিবির ঘরে ফিরে আসা | এখনো মনে আছে ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে আমরা দেখেছিলাম সেই অদ্ভুত মজার দৃশ্য | কম আলোর কারণে আমাদের সাধারণ সোনি সাইবারশট ক্যামেরায় তাদের বাড়ি ফেরার গান আর বন্দী করতে পারিনি | তবে স্মৃতিপটে সেই ছবি আজীবন উজ্জ্বল রঙে আঁকা থাকবে!

এবার বলব অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে পুরনো ও সংরক্ষিত বাষ্পচালিত ট্রেন Puffing Billy-র কথা, যা এখন বেলগ্রেভের জঙ্গলে প্রায় ২৫ কিমি রাস্তা পর্যটকদের ঘুরিয়ে আনন্দ দেয় | এর একটা বিশেষ মজার বিষয় আমরা সকল যাত্রীই ট্রেন চলাকালীন খোলা জানলা দিয়ে পা ঝুলিয়ে বসে দু'পাশের সৌন্দর্য উপভোগ করেছিলাম | আজও একই ব্যবস্থা অব্যাহত আছে |

শেষে বলি পোর্ট ক্যাম্বল ন্যাশনাল পার্কের প্রধান আকর্ষণের কথা, যা হ'ল ১২টি বিশালাকার পাথরের স্তম্ভ,

যেগুলো প্রকৃতির খেয়ালে সাগরের বুকে কত যুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে! গ্রেট ওশান রোড অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল হেরিটেজ | এটি অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল বরাবর ১৫০ মাইল রাস্তা, যা সমুদ্র সার্ফিং, অবিশ্বাস্য বন্য প্রাণী, প্রাচীন রেইনফরেস্ট ও সর্বোপরি এই ১২টি স্তম্ভের (The Twelve Apostles) জন্য বিশ্ব-বিখ্যাত | আমরা লোকাল ট্যুর বাসে মেলবোর্ন থেকে day trip বুক করে গিয়েছিলাম | বলাই বাহুল্য পুরো দিনটাই ছিল একটা স্বপ্নের মতো | এতকাল সিনেমার পর্দায় যে সমস্ত জায়গা মুগ্ধচোখে দেখতাম, সেদিন সেসব চাক্ষুষ দেখে মনে হ'ল সত্যি যেন জীবনের পরিধি হঠাৎ করে বিস্তৃত হয়ে গেছে | মেলবোর্নে থাকার পুরো সময়টা আমাদের এরকমভাবেই মন্ত্র-মুগ্ধের মতো কেটেছিল!

এরপর আমরা ২০১৩ সালে আমেরিকায় চলে আসি | পৃথিবীর এই সর্বউন্নত দেশটি আজ আমাদের মতো বহু বাঙালিরই কর্মভূমি | কিন্তু কর্মের সাথে নিত্য নতুন জায়গায় ভ্রমণ হ'ল বাঙালির আরেক ধর্ম | সেই পথ ধরেই ধীরেসুস্থে নায়াগ্রা ফলস্, হাওয়াই, Yosemite, গ্রান্ড ক্যানিয়ন এবং আরো অনেক জায়গা ঘোরার সৌভাগ্য হয়েছে; তবে আজ শুধু তিনটে জায়গার গল্প বলব |

২০১৭ সালে পা রেখেছিলাম লেক তাহোর তীরে | এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমে সিয়েরা নেভাডা অঞ্চলের একটি বৃহৎ সুমিষ্ট জলের হ্রদ | সমুদ্র সমতল থেকে ৬,২২৫ ফুট (১,৮৯৭ মি) উঁচুতে ক্যালিফোর্নিয়া ও নেভাডা অঙ্গরাজ্যের সীমানার উপরে এই সুবিশাল লেকটির (আয়তন ১২২,১৬০,২৮০ acre.ft) অবস্থান | আমেরিকার দ্বিতীয় গভীরতম এই হ্রদটি কাঁচের মতো স্বচ্ছ জল এবং চারপাশে ঘিরে থাকা অরণ্যাবৃত পর্বতগুলির জন্য সুপরিচিত | লেক তাহো নেভাডা ও ক্যালিফোর্নিয়া উভয় রাজ্যের জন্যই একটি প্রধান পর্যটক আকর্ষণ |

আমরা স্যাক্রামেন্টো নামে একটি পার্শ্ববর্তী শহরের হোটেলে ছিলাম | সেখান থেকে ঘন্টাদুয়েক জার্নি করে পৌঁছে গিয়েছিলাম এই বহু প্রতীক্ষিত গন্তব্যটিতে | তারপর যে কী

দেখলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন! প্রকৃতি যেন বড় এক দোয়াত নীল কালী উপুড় করে ঢেলে দিয়েছে হ্রদের একূল ওকূল জুড়ে! এখনই যেন কলম ডুবিয়ে লিখে ফেলা যাবে তার অপার্থিব সৌন্দর্যের উপমা | আকাশে সাদা মেঘের গালিচায় দিগন্তবিস্তৃত নীল ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস, তীরের বালুরাশিতে বিকেলের সোনাগলা রোদের ঝিকমিক আলোর খেলা আর একটি একান্তই নির্জন গোধূলিবেলা – মনে হয়েছিল স্বর্গ বুঝি একেই বলে! আমার দেখা সবথেকে সুন্দর জায়গাগুলির মধ্যে একটি এই লেক তাহো – সমুদ্রের রুদ্ররূপের বাইরেও জলের বিশালত্ব ও গভীরতা মনে এতটাই ছাপ ফেলতে পারে তা লেক

তাহোর শান্ত নিবিড় ছায়ায় না এলে হয়তো অজানাই থেকে যেত |

বিখ্যাত পরিবেশ-রক্ষক জন মুইর বলেছিলন, “Climb the mountains and get their good tidings. Nature’s peace will flow into you as sunshine flows into trees. The winds will blow their own freshness into you, and the storms their energy, while cares will drop away from you like the leaves of Autumn.”

২০১৮ সালে ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের বোর্ড-ওয়াকে হাঁটতে হাঁটতে ঠিক এই কথাটাই মনে এসেছিল বারবার | প্রকৃতির এক সম্মোহক বিস্ময় আমেরিকার এই জাতীয় উদ্যানটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭২ সালে | অসংখ্য উষ্ণ প্রস্রবণ, হ্রদ, উপত্যকা, ঝর্ণা, ক্যানিয়ন, নদী, বন্যপ্রাণী – কী নেই এখানে! পার্কটির ব্যাপ্তি প্রায় নয় হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে | গ্র্যান্ড টেটনের প্রবেশপথ দিয়ে আমরা ঢুকেছিলাম ইয়েলোস্টোনের বিচিত্র বাস্তুভূমিতে | আর ওল্ড ফেথফুল লজের ফ্রন্টিয়ার কেবিনে ছিলাম চারদিন | এখানে সারাবছরই পর্যটকের ভিড় |

সবিকছুই ভীষণ সুন্দরভাবে সংরক্ষিত এখানে | এই নাতিউচ্চ জলাভূমিতে কোথাও টিলা, কোথাও ছোট ছোট লেক, যার মধ্যে থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে | ওল্ড ফেথফুল গাইজারের গরম জলের গগনচুম্বী ফোয়ারা দেখে প্রকৃতির অতুলনীয় নৈসর্গিক খেয়ালের কথাই মাথায় আসে! আসলে ইয়েলোস্টোনের নিচে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আর বাইরের শীতল আবহাওয়ায় এইসব অবিস্মরণীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় | এখানে দ্রষ্টব্য এত বেশি যে সবকিছু দেখে শেষ করা মুশকিল | মাটি, ম্যাগমা, লাভা সব মিলেমিশে অদ্ভুত সব রঙ ও চরিত্রের ভূমিস্থল এখানে – তার

ওপর কাঠের পাটাতন পাতা, সেই পাটাতনের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে দেখে আসতে হয় বিস্কিট বেসিন, স্যাফায়ার পুল, গ্র্যান্ড প্রিজম্যাটিক স্প্রিং, নরিস গাইজার বেসিন, ব্লু মাড স্টিম ভেন্ট, ম্যামথ হট স্প্রিং ও আরো কত কী | অ্যাসিড থাকায় জলের রঙ কোথাও ঘন নীল, আবার কোথাও রামধনু রঙের বাহার! এই কারণে ও জীবের নির্বিঘ্ন জীবনযাত্রার জন্য জলে হাত দেওয়া বা নিচে নামা একেবারেই নিষিদ্ধ | কোথাও কাদা টগবগ করে ফুটে

ধোঁয়া বেরোচ্ছে, তো কোথাও অ্যাসিডের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ | প্রকৃতির এই অদ্ভুত, অস্থির ও জীবন্ত রূপ বুকে নিয়েই জেগে আছে ইয়েলোস্টোন পার্ক! এছাড়াও ক্যানিয়ন ভিলেজে লাঞ্চ, আপার-লোয়ার ফলসে বেড়ানো, হেভেন ভ্যালির সূর্যাস্ত দেখা আর মাঝে মাঝে রাস্তায় বাইসনের পাল ভিড় করায় গাড়ি আটকে যাওয়া – এইসব রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা মিলেমিশে ইয়েলোস্টোনের ম্যাজিক্যাল ল্যান্ডে ভ্রমণ আমাদের |

এরপরে ২০২২ সালের কথা | Covid পরবর্তী সময় – তখন আমরা ছিলাম ওহায়োর সিনসিনাটি শহরে | সেখানে বাড়ি

থেকে ঘন্টাদুয়েক দূরত্বে হকিঙ হিলস্ স্টেট্ পার্কের ছায়াসবুজ হাতছানি | ২৫ মাইল জুড়ে এই বনের গুহা, নদী, জল, গাছের পাতা, হাওয়ার গতি, ফুলের বুনো গন্ধ সবিকছু যেন কানে ফিসফিস করে বলে যায় – এই তো জীবন! সে তার রূপ, রস, রঙে পরিপূর্ণ; শুধু দরকার তার ছায়ায় এসে দু'দন্ড বসার | নাম না জানা পাখির মিঠে শিস, আকাশের আবিররাঙা আলো, ঝর্ণার জলের কলতান, যেদিকে দু'চোখ যায় শুধু প্রাণজুড়োনো সবুজ, শুকনো পাতার মর্মরতান আর পাহাড়ের লম্বা পাকদণ্ডী বেয়ে মেয়ের সাথে আমাদের হারিয়ে যাওয়া | তিনজনে একসাথে হাতে হাত ধরে গেয়ে উঠি –

"তাই, দুলিছে দিনকর চন্দ্র তারা,
চমকি কম্পিছে চেতনাধারা,
আকুল চঞ্চল নাচে সংসারে,
কুহরে হৃদয়বিহঙ্গ |"

সত্যি! কী যে সে মুক্তি, কী যে সে আনন্দ! এই মুহূর্তগুলোর জন্যই বোধহয় বেঁচে থাকা | স্মৃতিপটে আঁকা হয়ে যায় রবিঠাকুর, আঁকা হয় পদচিহ্ন রেখে যাওয়া, আঁকা হয় সন্ধ্যে নামার আগে ব্যাকুল আলোয় মাখামাখি স্বপ্নদেখা চোখের মায়াকাজল! এভাবেই কত নতুন স্মৃতি জুড়ল এই জীবনের পাতায়, কত মানুষের সাথে আলাপ হ'ল, আবার কত মানুষের সাথে হয়তো এই জীবনে আর দেখাই হবে না | প্রতিটি জায়গার অভিজ্ঞতা শিখিয়ে দিয়ে গেছে কতকিছু!

স্মৃতির পাতা ঝেড়েমুছে আজকে আপনাদের সঙ্গে এই গল্পগুলো শেয়ার করে নিলাম | অন্য কোনদিন আবার খুলে বসব গল্প-গাছের ঝুড়ি | আপাতত আমার এই মরু শহরে নেমেছে আকাশ ঝেঁপে বৃষ্টি | জানালার ঘষা কাঁচ আরো ধূসর হয়ে আসছে | বাইরে ল্যাম্পপোস্টের আলো সেই কাঁচ বেয়ে গলা মোমের মতো চুঁইয়ে পড়ছে আমার ঘরের মেঝেয়; ঠিক যেভাবে নস্টালজিয়া ছড়িয়ে থাকে আমাদের মনন ও অস্তিত্ব জুড়ে | জীবন সুন্দর!

{এই রচনায় ব্যবহৃত ফটোগুলি লেখিকার স্বামী,
শ্রী প্রাণজিৎ বিশ্বাসের ক্যামেরায় তোলা~}

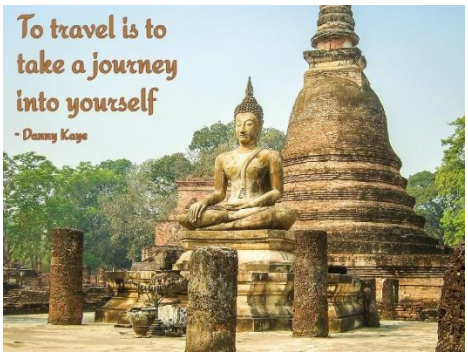

বাস্তব

আনন্দিতা চৌধুরী

ক্লান্ত হাতে চাবি ঘুরিয়ে ফ্ল্যাটে ঢোকে চন্দন | সেই সাত-সকালে বেরিয়ে এত দেরিতে ভিড় বাসে ধাক্কা খেতে খেতে বাড়ি ফিরতে আজকাল জীবনীশক্তি তলানিতে এসে ঠেকে | মলির একমাত্র বিনোদন ছোট্ট টিভিতে সান্ধ্যকালীন সিরিয়াল দেখা | আজ সেই পরিচিত ধুম-তানা-নানা-নানা শব্দ না পেয়ে একটু অবাকই হয় চন্দন | তাকে আরো অবাক করে দিয়ে ভিতরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে রাজা | সাধারণত কলেজের পরে রাজা রাত অবধি কোথায় না কোথায় টো টো করে বেড়ায়, চন্দন বা মলি জিজ্ঞেস করে করেও জানতে পারেনি | আজ সে ছেলে ঘরে!

- "মা কোথায়?"

রাজা বলে, "পাশের বাড়ির কাকিমা ডেকেছে, কী যেন পুজো আছে |"

পুজোয় গেছে | তার মানে হাতে করে ফুলমিষ্টি নিয়েই গেছে | মাসের শেষে আবার বাড়তি গচ্চা! উফফ্, পাই পয়সার হিসেব আর এই জন্মে তার পিছন ছাড়বে না! চন্দনের মাথাটা টিপ টিপ করছে, একটু চা পেলে হতো | রান্নাঘরের দিকে যেতেই কানে আসে... "চা খাবে বাবা?"

রাজার প্রশ্নে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে চন্দন | হ'ল কি আজ ছেলের!

একটু পরে চায়ে চুমুক দিয়ে প্রায় বিষম খায় চন্দন | অতি অখাদ্য, কিন্তু রাজার প্রত্যাশাভরা মুখের দিকে চেয়ে বলে, "বাহ্ বেশ হয়েছে | চা করতে পারিস জানতাম না তো!"

একটু লাজুক হেসে রাজা আমতা আমতা করে, "বাবা একটা কথা ছিল..."

মুখের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও তেতো হয়ে যায় চন্দনের | আবার কী চায় ছেলে! চাওয়া মানেই তো সেই...

সাদামাটা মেয়ে মলির চাহিদা চিরকাল খুবই কম | শুধু যেদিন ভাড়াবাড়িতে জল তোলা নিয়ে চূড়ান্ত অপমানিত হ'ল, সেদিন সন্ধ্যায় চন্দনের কাছে কেঁদে পড়েছিল, "যে করেই হোক নিজেদের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই জোগাড় করো, আর কোনোদিন কিচ্ছু চাইব না |"

তার ফলস্বরূপ বড় রাস্তার থেকে বেশ ভিতরে এই ছোট্ট দু-কামরার ফ্ল্যাট | কিন্তু এর লোন শোধ করতে করতেই কেটে যায় মাইনের অনেকটা | "দেখো, আমি বাকি টাকায় ঠিক সংসার চালিয়ে নেব"... খুশিতে ঝলমল করতে করতে বলেছিল মলি | চালায়ও | সকাল থেকে রাত অবধি খাটে মলি সংসারের পিছনে, সন্তানের পিছনে, তার পিছনে | সব রকম বাড়তি বিলাসিতা বাদ দিয়েছে চন্দনও | কিন্তু রাজা যেন সম্পূর্ণ অন্য দুনিয়ায় বাস করে; রাজার মেজাজ রাজার মতোই, নিত্যনতুন চাহিদা তার | কলেজ যাতায়াতের জন্য বাইক আদায় করেছে বায়না করে করে অতিষ্ঠ করে | সে ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই রাজার দাবি নতুন মোবাইল | চন্দন রোজ বাড়ি ফেরামাত্র শুরু হয় সেই এক অশান্তি | আজ কি সেইজন্যই রাজার বাড়িতে থাকা, চা করে আনা? এত হিসেবী, এত কুচুটে হয়ে গেছে ছেলেটা এই বয়সেই! মনটা যেন বিষিয়ে যায় চন্দনের |

কিন্তু, এ কী বলছে রাজা!

- "বাবা, আমি ফুড ডেলিভারির কাজ নেব? বাইকটা তো আছেই... কলেজের পরে কয়েক ঘন্টা কাজ করব বাবা? আমার খরচটা উঠে যাবে | আজকাল অনেকেই তো করে | মা রাজি হবে না, তুমি মাকে বোঝাও | কাজ করা তো ভাল, তাই না বাবা? করি?"

বিস্ময়ে হতবাক চন্দন তাকিয়ে থাকে ছেলের দিকে |

চন্দন জানে না, আজ রাজার আর বাবার ফেরা অবধি তর সয়নি; অধৈর্য হয়ে নতুন মোবাইলের টাকা আদায় করতে বাবার অফিসেই চলে গিয়েছিল সে | ঢুকতে গিয়েই সে থমকে গিয়েছিল | দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখেছে... বাবার বস কী যাচ্ছেতাই অপমান করছে বাবাকে... কি নাকি টার্গেট পুরো হয়নি, জঘন্য ভাষায় সেই নিয়ে শাসাচ্ছে বাবাকে, অফিসশুদ্ধ লোকের সামনে মাথা নীচু করে শুনছে তার অসহায় বাবা | কতদিন পরে যেন আজ ভাল করে তাকিয়ে দেখেছে রাজা তার বাবার দিকে, দেখেছে বাবার শীর্ণ হয়ে যাওয়া দেহ, কোটরে ঢুকে যাওয়া চোখ, ঝুঁকে যাওয়া মেরুদন্ড!

চন্দন জানে না, রাজা আজ বাস্তব দুনিয়ায় পা রেখেছে |

চন্দন জানে না, আজ বড় হয়ে গেছে রাজা |...

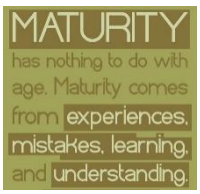

আমার কথা

দীপশিখা দাস

আমার কথা

নমস্কার, আমার নাম দীপশিখা দাস। আমি ভারতের মুম্বাই শহরে জন্মেছি, আমার বাবা-মা সুভাষ আর মালবিকা দাস, তারপর আমি England আর Africa-তে থেকেছি, ২০০৭ সালে ৮ বছর বয়সে Houston-এ এসেছি। Georgia-তে কলেজ শেষ করে Houston-এ Phillips 66-এ Data Analyst হিসাবে কাজ করি, আমি ১১ বছর ওড়িশী শিখেছি, ২০১৮ সালে আমার Rangaprawesh হয়েছে, এছাড়াও আমি আঁকতে, music করতে আর পড়তে ভালবাসি।

আমি এখন বাংলায় পড়তে, লিখতে আর বলতে শিখছি, আমি কী করে আরও ভাল বাংলা বলা যায়, সেটা শিখছি, ভাষাটা শেখা খুব কঠিন, কিন্তু খুব মজার, আমি বাংলা class করতে খুব ভালবাসি, আর আমি অনেক কিছু শিখে গেছি, আমি বাংলা ভাষাটা আরও শিখতে চাই।

দীপশিখা দাস
হিউস্টন

শিল্পী: আরাত্রিকা পাল, বয়স ১৮ (Contributor: "We Amra" প্রজেক্ট) (https://weamra.org)

ভিন্ন নববর্ষ

ডাঃ নিবেদিতা গাঙ্গুলী

আমি যেখানে ইচ্ছে যাব নিশ্চিন্তে,
দাঁড়াব, ফুল ফুটাব পায়ে পায়ে।
মেঘ সাজাব আকাশে, আনব বৃষ্টি,
কেবল প্রয়োজনে তুলব ঝড়।

বারুদের গন্ধ পাও বাতাসে?

বারুদের ধোঁয়া সরিয়ে একদিন সূর্য দেখব,
ভালবাসব আর একটা মানুষকে নির্দ্বিধায়।...
ছড়াব ফুলের গন্ধ নিশ্ছিদ্র আবর্জনার স্তূপে
অন্ধকার ঘরে, বন্ধ গলির আনাচে কানাচে,
মাটি দিয়ে, ভাবনা দিয়ে গড়ব শিশুদের,
নামহীন, গন্ধহীন, স্বপ্নহীন পরিত্যক্ত শিশুরা...

দেখেছি কি সেই ঘোলাটে চোখ?

সেই চোখে যদি দিতে পারি এক টুকরো আলো,
একটু জীবনের গতি, একটু বাঁচার স্বপ্ন?...
সেই হোক আমার নব বরষের শুভেচ্ছা

সেই হোক আমার ভিন্ন নববর্ষ।

হে নূতন

বৈশাখী চক্কোত্তি

অন্ধকারময় পঙ্কিল, নিঃঝুম, নিস্তরঙ্গ পৃথিবী
বোধবুদ্ধি এখন স্থবির, বিবেক, সত্যধর্ম, সব জড়
শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতির কপাট এখন হয়েছে রুদ্ধ
বিশ্বাস আর সততার স্থান হ'ল শুধুমাত্র কবর।

বড় চেনা দৃশ্য, অভুক্ত শিশুর কলরব
ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে অস্তিত্বের চিৎকার
রাত বাড়লে ফুটপাথে অবলার শরীরে
প্রশাসনিক উল্লাসের রোষ আর শীৎকার।

শিক্ষিত বেকার ও পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি
নাগরিক জঞ্জালে উভয়ের সমান মূল্য
তথাকথিত সমাজসেবীর কপট মুখাবরণ
সত্যের সঠিক সন্ধান আজ অতি দুর্মূল্য।

"সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়"
কালচক্র আবর্তিত অক্ষিপলক ক্ষেপণ ন্যায়
নাগরিক জঞ্জাল আর নালীর পূতিগন্ধময় কীট
কোনোকিছুই রুখতে নারে, নববর্ষ আবির্ভূত আলয়ে।

অন্ধকার পঙ্কিলতার ছায়ায় হঠাৎই আসে ভেসে
কোথা হতে যেন বেলি, চামেলির সুগন্ধিত বাতাস
ভোরের অরুণ পুবদিগন্তে লাল আবিরের রেশে
মুহূর্তে নিঃশেষিত কর্দমাক্ত, ক্লেদাক্ত সামাজিক হাহুতাশ।

"হে নূতন", দেখা দিও এইভাবেই বারংবার
নতুন ঊষা, নব দিনমণি, মাস ও বর্ষরূপে
ক্লেদাক্ত, কর্দমাক্ত সামাজিক কীটের হোক নাশ
কালিমা ঘুচিয়ে, অশ্রু মুছিয়ে, মুমূর্ষুরে দাও আশ।

বৈশাখ আনো নবপ্রভাত, বৈশাখ এনো নতুন গান
বৈশাখ আনো নবস্বপ্ন, হেসে উঠুক সদ্যোজাত প্রাণ।

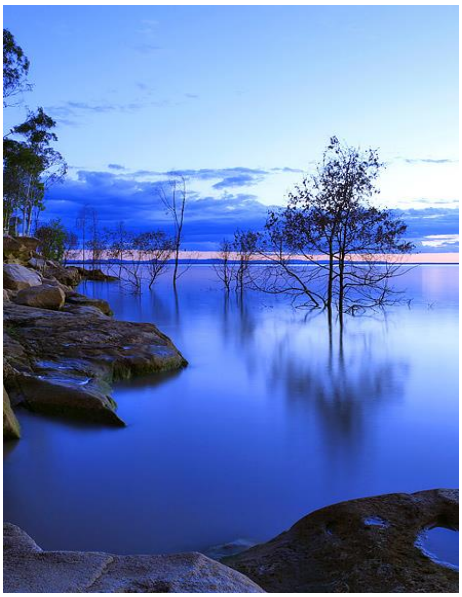

আত্মিক

ডাঃ নিবেদিতা গাঙ্গুলী

আত্মার আত্মীয় কে? যে বন্ধু হতে পারে?
আত্মিক সম্পর্ক বলে নাম দেব কারে?
জ্যোৎস্নার আলো হয়ে যে দাঁড়াবে পথে...
আগুন জ্বালাবে যে অন্ধকার রাতে,
সেই মহা আত্মীয় মহাবিশ্বে থাকে
মহাকাশ দূরত্বে ঠিকানাটা রাখে।
ঠিক যেন সূর্যালোকে লক্ষ-কোটি তারা
নিদ্রিত থাকে তবু নিদ্রাহীন যারা...
আত্মিক যোগসূত্রের নেই অস্বীকার
কালসূত্রে কর্মসূত্র মহা অঙ্গীকার
লোকারণ্যে বিক্ষিপ্ত চেতনার ব্যথা
প্রতিক্ষণ মন্থনে লেখে সেই গাঁথা
যাহা সত্য নয় তাহা কোনদিনই না
সজ্জিত সম্পর্কে আত্মা সাজতে জানে না।

অনাথ

শান্তনু মিত্র

সেদিন গহন গভীর সে বন
চাঁদের আলোয় ঢাকা।
এক অসহায় শিশু চারপায়
ঘোরে ফেরে একা একা।

দুধ পিপাসায় সেই শিশু হায়
শুধু ডাকে তার মাকে।
সে হতভাগিনী হয়তো বাঁচেনি।
ছেড়ে চলে গেছে তাকে।

এ ভয়াল বনে আছে প্রতি কোণে
জীবন মরণ পণ।
কতটুকু তার সুযোগ বাঁচার?
হয়তো কিছুক্ষণ!

ভয় জড়সড়, কাঁপে থরথর,
ঐটুকু দেহ নিয়ে।
খোলা মাঠে এসে শুয়ে পড়ে শেষে
নিয়তির পথ চেয়ে।

রাত্রি ঘনায় কত না ভাষায়
জেগে ওঠে চারিধার।
কালো কালো ছায়া ছোট বড় কায়া
ধীরে কাছে আসে তার।

হঠাৎ দৌড়ে এল যেন চিরে
অন্ধকারের জাল
সে এক বেচারা, সন্তানহারা,
দুখিনী বন-বিড়াল।

অসীম মায়ায় আগলে দাঁড়ায়
বুঝি বা অশ্রু ঝরে।
কত না আদরে, নিয়ে মুখে করে
লুকালো অন্ধকারে।

শুরু হ'ল খেলা বিধাতার লীলা।
মিশে গেল দুটি প্রাণ।
সব কেড়ে নিয়ে যে দেয় ফিরিয়ে
তারই নাম ভগবান।

ভুলে সব ব্যথা বনের বিমাতা
ভরে নিল তার কোল।
এক অসহায় পেল আশ্রয়,
মায়ের স্নেহ-আঁচল।

গেল তারপর মায়ের উপর
কত না ঝঞ্ঝা ঝড়।
মা করে উজাড় সব কিছু তার।
বেঁচে যায় চরাচর।

প্রাণ পেল ফিরে বড় হ'ল ধীরে
সে বালক চঞ্চল।
বোঝেনি কখনও তাকে দেখে কেন
মা'র চোখে আসে জল।

মা কোন কারণে বলে কানে কানে
"যাসনে দীঘির পাড়ে।
জল পিপাসায় যাবি ঝর্ণায়
অথবা নদীর ধারে।"

মা অন্তপ্রাণ সেই সন্তান
রাখেনি প্রশ্ন মনে।
সে এক বিভোর নবীন কিশোর
হ'ল যেন দিনে দিনে।

মা'র তবে আজ সারা সব কাজ
কোথাও হয়নি ত্রুটি।
সে বড় ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত।
শরীর চাইছে ছুটি।

শেষের সে দিন আকাশ রঙ্গিন
তখনও গোধূলি আলো।
মা বলে ছেলেকে কাছে নিয়ে ডেকে
"তাহলে থাকিস ভালো।"

বিহ্বল ছেলে বলে "তুই গেলে
আমার কী হবে বল্?"
মা বলে "এবার যা দীঘির পাড়।
এনে দে একটু জল।"

কীভাবে আনবে সে কথা না ভেবে
জীবনে প্রথমবার
সবকিছু ফেলে দৌড়িয়ে ছেলে
এসেছে দীঘির ধার।

শান্ত স্থির জল সে দীঘির।
নেই কোনও আলোড়ন।
এ কাকে দেখছে? ঐ চেয়ে আছে
এ কার প্রতিফলন?

রূপ মনোহর। কী ভয়ংকর!
সারা গায়ে কালো দাগ।
সে নয় বিড়াল, সে এক বিশাল
শক্ত সবল বাঘ।

ক্ষোভে অভিমানে দিশাহারা মনে
ছুটে আসে মা'র কাছে।
"এ কোন বিচারে রাখলি আঁধারে?
মাগো, কী কারণ আছে?"

মা হেসে তখন বলে "ওরে শোন
আমার ক্ষমতা কই!
যে থাকে গোপনে মনের পিছনে
আমি তো সে জন নই।

তাকে জাগাবার তোরই ছিল ভার।
বাকি পথ যাবি একা।
ধরে রাখ বুকে সেই শক্তিকে।
আমার পাবি না দেখা।"

গোধূলির আলো নাচে এলোমেলো
নব কিশোরের দেহে।
এবার সে ছেলে, রাজকীয় চালে,
চলে বনপথ বেয়ে।

উঠে তারপর টিলার উপর
সোজা রেখে শিরদাঁড়া।
দেয় হুংকার "আমি দুর্বার"
দু'চোখে জলের ধারা।

ডায়াস্পোরা

সুজয় দত্ত

এই পৃথিবীর গোলকধাঁধায় অনেক বছর কাটিয়ে শেষে
সাত সাগর আর তেরো নদী, পথ-প্রান্তর পেরিয়ে এসে
হঠাৎ সেদিন শুনতে পেলাম পুরনো এক চেনা গলায়
ডাক দিল কেউ, বলল "থামো | অন্তবিহীন এ পথ চলায়
শ্রান্ত তুমি | একটু জিরোও | একটু তাকাও পিছন ফিরে |
অনেক হ'ল | এবার খানিক কাটাও সময় আপন নীড়ে –
যেখান থেকে যাত্রা শুরু | স্মৃতিমেদুর, স্বপ্নমাখা,
ফেলে আসা দিনগুলো সব যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখা
নিজের শহর, নিজের বাড়ী, ছেলেবেলার খেলার মাঠে –
গলির মোড়ের আড্ডাতে আর মুখচেনা সব দোকানপাটে |"
যেই না শোনা, উঠল নেচে বুকের খাঁচায় বন্দী পাখী
ঘরে ফেরার নেশায় মাতাল, সাধ্য কী তায় আটকে রাখি?
অগত্যা এক দিন সকালে তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে,
সব পিছুটান ছিন্ন করে, হিসেবনিকেশ মিটিয়ে দিয়ে
রওনা দিলাম জন্মভূমির উষ্ণ আলিঙ্গনের আশায় |
থাকব কাছে আপনজনের, বলব কথা নিজের ভাষায় –
এই ভেবে মন উথাল পাথাল, সয় না সবুর নাগাল পেতে,
অতীত সুখের টুকরো ছুঁয়ে খুশীতে চায় উঠতে মেতে |
নামল যখন হাওয়াই জাহাজ, যা দেখি সব মধুর লাগে |
পুরনো সব ভাললাগাই নতুন রঙে আবার জাগে |
হারিয়ে পাওয়ার বিচিত্র এক অনুভূতি হৃদয় জুড়ে |
হৈহুল্লোড় হাসি মজায় কখন সময় যাচ্ছে উড়ে –
হয়নি খেয়াল | ঘরের দেয়াল ক্যালেন্ডারের পাতায় নজর
হঠাৎ করে পড়ল যেদিন, আচমকা এক ধাক্কা সজোর
লাগল বুকে, ব্যাজার মুখে তাকিয়ে দেখি লম্বা ছুটির
মেয়াদ তো শেষ | স্বপ্ন-আবেশ এক নিমেষে চক্ষুদুটির
মিলিয়ে গেল | ধরল ঘিরে রূঢ়, কঠিন বাস্তবতা –
এড়াই তাকে কেমন করে? পালিয়ে বাঁচার রাস্তা কোথা?
নিত্যদিনের ইঁদুর দৌড়, প্রাত্যহিকের ব্যস্ততারা
ডাকছে নিঠুর হাতছানিতে | কাজ জমেছে | ভীষণ তাড়া |
কাজের টানে মন উতলা, আবার পাড়ি দূর প্রবাসে |
তাকাই ফিরে অতীত-পানে, জীবনটা যেই শুকিয়ে আসে |
হাওয়ায় ভাসা পরাগরেণু – শিকড় ভুলে বাঁচব মোরা?
হেথায় আধেক হোথায় আধেক – এই আমাদের ডায়াস্পোরা!

বালার্ক

সুজয় দত্ত

যে দেশেতে তাল-তমালের বনে
অশ্বত্থ আর হিজল-বটের ছায়া,
শাপলা ফোটা দীঘির শ্যামল পাড়ে
দোয়েল কোয়েল পাখীর গলায় মায়া,
যেইখানে ভাই মেঘনা নদীর পানি
আকাশ থেকে নীলটা শুষে নিল,
সেইখানেতে সবুজ ধানের মাঠে
লাল টুকটুক সূর্য উঠেছিল |
সেই নবারুণ কীসের রঙে রাঙা?
বলব কী আর, সে যে অনেক কথা |
পাঁচটি দশক বুকের মাঝে জমা
বিষাদ-গ্লানি, গৌরবেরই গাথা |
বাহান্নে যে ভাষার লড়াই শুরু,
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শেষ |
লাখ শহীদের আত্মবলিদানে
আজকে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ |
অর্ধশতের পূর্ণ কলস স্মৃতির
প্রেরণা দেয়, শেখায় শপথ নিতে –
যা আছে যার, ঢালতে উজাড় করে
মাতৃপূজার পুণ্য অঞ্জলিতে |

ক্ষুদ্রকাব্য

শেলী সাহাবুদ্দিন

ছিন্নলতা

চলে গেল লতা, ছিঁড়ে গেছে সুরবীণ
ভারতবর্ষ যাতনায় প্রাণহীন।

কাফের

কিনেছে আমারে ধর্মের নামে চাবুকের ইসলাম,
প্রতিবাদ করে পেয়েছি ফতোয়া, পেয়েছি 'কাফের' নাম।

বিদ্রোহী রমণী

আমিও নমিত হই বিদ্রোহী রমণীর পায়ে,
একদিন, মানবতা মুক্ত হবে তাহাদের রায়ে।

যুদ্ধ না শান্তি

যখন প্রশ্ন ওঠে যুদ্ধ না শান্তি?
পশ্চিমে উত্তর, "যুদ্ধে প্রশান্তি;
যুদ্ধে মুনাফা সুখ, ভালবাসি যুদ্ধ,
প্রাচ্য তো বেয়াকুব, গৌতম বুদ্ধ।"

সমুদ্র চোর

কুকুর পুকুর চোর, নদী চোর শালা,
এবার সমুদ্র খা, শেষ সব জ্বালা।

নিয়তি

কেটেছে শৈশবকাল ক্ষুধার তরাসে,
যৌবন কেটেছে খেটে অর্ধ উপবাসে,
এখন পেয়েছি যেই ভাঁড়ারের চাবি,
"খাওয়াটা বন্ধ করো" বয়সের দাবী।

পরম্পরা

পিকনিকে, আড্ডায়, চায়ের গন্ধে আর বাংলাভাষায়,
আমিও তো সারাক্ষণ ছিলাম সেখানে, তবু দেখোনি আমায়।
প্রাচীন উদ্ভিদ আজ, একদিন এইসব বাঙালি উৎসব,
গড়েছি নিজের হাতে, ভালবেসে দিয়ে যাই তোমাদের সব।

প্রবাসীর মন

লাউয়ের বাকল ভর্তা, লতি চচ্চড়ি,
দেখি নাই কতকাল, বাঙলার বড়ি,
বহুকাল বৃষ্টিহীন এসবের আশে,
মনের মৃত্তিকা যেন চৌচির প্রবাসে।

প্রবাসে প্রবীণ

প্রবাসে নীরব সদা প্রগলভ প্রবীণ,
বোবা বুঝি, ভাবে এক চৌকস নবীন।
মাটি খোঁজে প্রবীণের ছিন্ন শেকড়,
কণ্ঠরোধ হয়, দেখে কঠিন প্রস্তর।

গাঁটকাটাদের ভায়রাভাই

গাঁটকাটাদের ভায়রাভাই গাছকাটাদের কাজে,
পুড়ছে জগৎ উষ্ণায়নে, বিশ্ব ভয়ের মাঝে

গাছ কেটেছি, দেশ ভেঙেছি, বেশ করেছি, বেশ,
আমার আরো মুনাফা চাই, খাব সকল দেশ।

গাঁট কাটাদের ভায়রাভাই গাছকাটাদের বংশ,
গাছের টাকায় বিশাল অসুর, করবে বিশ্ব ধ্বংস।

মরণোত্তর পুরস্কার

যে গুণীজন সারাজীবন লাথি খেয়ে বাঁচে,
মরণোত্তর পুরস্কারে কী মূল্য তার কাছে?

কলপ

বার্ধক্য লুকোতে গিয়ে বুদ্ধি হারায়,
ময়ূরের পুচ্ছপরা দাঁড়কাক প্রায়।

মানুষের মুখ

মানুষের হাসিমুখ, প্রদীপ জ্বালায়,
তারে দেখে মহাকাল থমকে দাঁড়ায়।

স্মৃতির ক্ষত

হারানো দিনের স্মৃতি।
ছবির নীরব গীতি।
শুধু এই মনে,
সুদূরের স্তব্ধ এই ক্ষণে,
সংসারের অজস্র কাহিনী,
মৃত্যুহীন স্মৃতির বাহিনী,
বাঁধভাঙা প্লাবনের মতো,
আমারে ভাসায় স্মৃতির উন্মোচিত ক্ষত।

কাকের জীবন

তুই তবে কাক।
মর তুই, থাক পড়ে থাক।
শোকের পাথর বুকে, প্রিয়মুখ মনে আজীবন,
সুখের নিশ্বাস টেনে, কাক করে ওপারে গমন।
ময়ূর, কোকিল হয়ে, আমরা তো আজীবন বদলাব সুখ,
তারপর, সবশেষে দেখি, আমরা চিনি না কারো মুখ।
হায় সুখ! জীবন বিলিয়ে দিয়ে প্রজাপতি সুখে,
বড়জোর ঢুকি শেষে কাকেদের মুখে।

শেষ সম্পদ

এখনও আনন্দ পাওয়া যায়?
খানিক দেবে কি আমায়?
বিনিময়ে,
এই ঘোর দুঃসময়ে,
আমার যা আছে, সব দিয়ে দিতে চাই;
বলো, বলো, কত দিতে হবে ভাই?
তাতে না কুলোয় যদি তবে,
এ জীবনে উপায় কী হবে?
নেবে কি আমার শেষ সম্পদ,
আমার দুঃখের দিনের, বুকের রক্তে লেখা পদ?

দখল

কৃষ্ণা গুহ রায়

দেশভাগের পর কলকাতা শহরের
একটা স্যাঁতসেঁতে চার কামরার একতলা বাড়ি
অল্প কিছু টাকার বিনিময়ে কিনে নিয়েছিল
ওপার বাংলার ছিন্নমূল হয়ে আসা পুত্রকন্যাসহ
বিধবা রমলা রানী।
দুই ছেলে পড়াশোনা শিখে সরকারী চাকরি পেল,
মেয়েদেরও সব বিয়ে হয়ে গেল,
ছেলেদের বিয়ে হবার পর
নাতি নাতনিদের নিয়ে সংসার যখন পরিপূর্ণ
তখন তিনি চোখ বুজলেন।
গরিব ঘরে চোদ্দ বছর বয়সের পরমা সুন্দরী
শান্ত স্বভাবের বড় ছেলের বৌ
বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বাচ্চা বিয়োয়
চাকরির ওইকটা মাইনেয় বড় ছেলের তখন হিমশিম অবস্থা,
ওদিকে ছোট ছেলের দুই মেয়ে
বৌও পড়ালেখা জানা গুছানো সংসারী,
বড় দাদাকে সাহায্য করতে গিয়ে
ছোট ভাইয়ের ভাঁড়ারে টান পড়ে
তাই ইচ্ছে থাকলেও জমি কিনে বাড়ি করা
স্বপ্নই থেকে যায়।
সময়ের ধারাপাতে দুই ভাইয়ের ছেলে মেয়েদের বিয়ে হয়
বয়সের ভারে তারাও একে একে গত হয়,
এখন বাড়ির শরিক দুই ভাইয়ের ছেলে মেয়েরা।
চার কামরার বাড়ির পলেস্তারা খসে
বৃষ্টি হলে ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ে
জানালা দরজায় উইপোকা বাসা বাঁধে
তবু শরিকদের মধ্যে বিবর্ণ বাড়ির দখল নিয়ে
চলে বিবাদ।

ঘুম

প্রভাস দাস

সবচেয়ে লোভনীয় কী?
বকরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্নটা করিনি|
করলে একটা জ্ঞানী উত্তর পাওয়া যেত
আমি জানলে সব ছেড়ে সবার আগে তা নিয়ে
দিন রাত এক করে লড়ে যেতাম
অবশ্য তাকে তুমি কাজের লড়াই বলবে না তা জেনেও |
তাহলে তোমাকে বলতে হবে
নদীর স্রোতে ভেসে থেকে কী লাভ|
কী লাভ তোমাকে বলে, ‘চলো গাছের কথা শুনি
ওরা কীভাবে ভালবাসার কথা বলে
কী করে ঝগড়া করে
কী দুঃখে কাঁদে!’

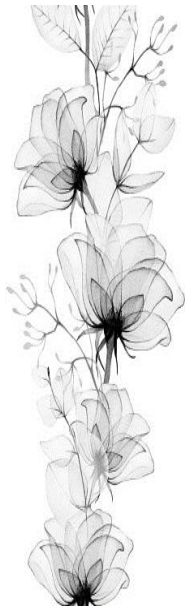

চারিদিকে ধুন্ধুমার ধোঁয়াশায়
হারিয়ে গেছে আলো
হৃদয়ের মন্থন
পচনে গলনে কিলবিল কৃমিদের
খেলার মাঠ হয়ে
দিব্য আছে সে
তুমিও কি তাই?

প্লিজ তুমি ‘না’ বলো,
চীৎকার করে জানিয়ে দাও
তুমি জানো নক্ষত্রের রং
কেন কালো হয়ে গেছে
আকাশময়?
কেন আমাদের যেতে হবে
একদিন প্লুটোর আবহে উড়ে
কেন পার হতে হবে
মানুষের আত্মধ্বংসের
দীর্ঘতম ফাঁদ!

কোনো ট্র্যাফিক থাকবে না তখন আমাদের মাঝে
সীতার মারীচ লোভ তুড়ি মেড়ে উড়িয়ে
রামকে বলব ফিরে যেতে
আসল ভালবাসার কাছে|
ভাবতে ভাবতে শব্দের জন্ম
হয়, না বলা কথার,
বাড়তে থাকে অপেক্ষা
শ্যাওলার আলপথে
পড়ে যায় বেলা
সন্ধ্যার গ্রহণে ডুবে যায়
সৌরজগৎ|
তোমাকে ঘিরে ধরে
জন্মান্তরের ক্লান্তি
অবসন্ন নদী
কর্কশ পাহাড় ও চোরামাটি|
তোমার খোলা চোখে
এ ছবি দেখেছি বহুবার আমি
দেখেছি আমরা শুয়ে আছি
অবয়বহীন
জাগতে যদি নাই পারো
ঘুমিয়ে পড়ো
ঘুমিয়ে থাকো
যতদিন মৃত্যু আমাকে
না জাগায়|

অভিসার

মণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

সুন্দরকে অনেক খুঁজেছি
দেয়ালের ছবিতে,
চীনা ফুলদানি, ক্যাকটাস,
আর সোফার রঙিন গদিতে।
দুধ-সাদা চিকনের পর্দা
আর মনোহারী গালিচার মোহে
দেখিনি কখন শরতের নীলাকাশ
আর অরণ্যের বসন্ত গেছে বহে।
জয়পুরের সুরাপাত্র, বীরভূমী বাঁশের রমনী
আসক্ত করেছে অতিথিরে,
হায়, রেশমের শালে আর পশমী চপ্পলে
তৃপ্তি দিতে পারিনি শুধু আমার 'আমি'রে।

জলসার সুরস্রোত হতে,
সাধ করে যন্ত্রচক্র ভরেছি সঙ্গীতে।
সেতারের রিনিরিন্
আমারে করেছে উদাসীন।
সুন্দরকে খুঁজেছি নিত্য –
ছুঁতে তবু পারিনি তো তারে,
মন রয়ে গেছে রিক্ত।

আজ অকস্মাৎ…
সারাদিন অবিরাম বর্ষণের শেষে
বাতি নিভে গেল চারিধারে,
চেতনা ছড়িয়ে দিই
আঁধারের দিগন্ত-বিস্তারে।
স্তব্ধ হয়ে থেমে গেছে বেতারের অবোধ উল্লাস
আর উন্মত্ত আলোর আস্ফালন,
যেন অলক্ষ্যে করেছে কেউ
তর্জনী ধারণ।
বিধাতার প্রথম দান – আলো
আঁধারের তল থেকে জানকীমাতার মতো
উঠে এসে অন্তরে মিলালো।

একান্ত স্নেহের ডোরে
টেনে নিল নিঃসীমের ক্রোড়ে।
ঝুরুঝুরু স্বর্গস্নেহধারা
পাতায় পাতায় তোলে মৃদঙ্গের সাড়া,
তারও নীচে পথডোবা জলে
জলতরঙ্গ বেজে চলে;
যন্ত্রচক্রে সঙ্গীতের কথা
একযোগে বয়ে আনে হাসি আর ব্যথা।
লুপ্ত হয়ে গেল মনে কৃত্রিম সাজের পসরা,
ভেঙে গেল সভ্যতার অন্ধতার কারা,
খুলে গেল চোখ,
সুপ্তির ওপার থেকে ভেসে এল 'প্রত্যুষের আলোক'
আজ মোর অভিসার শেষ –
প্রত্যক্ষ করেছি মনে সুন্দরের অভিনব বেশ।

{শ্রীমতী মণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
হিউস্টনবাসী বলাকা ঘোষালের মা~}

জীবন ছবি

কমলপ্রিয়া রায়

জীবনে চলার পথে
প্রকৃতির খেলার সাথে
কত ফুল প্রস্ফুটিত
কত ফুল ধুলায় লুটায়।

ভুলিনি কোনো কারোকে
রেখেছি যত্ন করে
ভরেছি স্মৃতির কোণে
আমারি মণিকোঠায়।

তারা আজ দেয় দোলা দেয়
সহসা দোল খেলে যায়
কোনোদিন ফাগুনরাতে
কোনোদিন প্রভাতবেলায়।

ধরণী ভরছে সাজি
ফুলসাজ পরছে আজি
অপরূপ রঙের সাজে
মন মোর ছন্দ মেলায়।

আজি এই বর্ষারাতে
অবিরাম বৃষ্টিপাতে
পড়ছে আবার মনে
যা আছে স্মৃতির পাতায়।

তারা সব ভালই আছে
কেউ বা তারার দেশে
কেউ বা নিজ গৃহে
জীবনের বিহান বেলায়।

ছলছল চূর্ণি নদী

পৃথা চট্টোপাধ্যায়

ছলছল চূর্ণি নদী
দুই পার কথা বলে একা
বিরহের অনন্ত যাপন
শীর্ণ শরীরে তার রুপোলি ঝালর
দুলে ওঠে বসন্ত বাতাসে

নিরিবিলি ঘাটে নৌকা বাঁধা
আকন্দ, ডুমুর, বট, অশ্বত্থের গাছ
ডাল নুয়ে ছুঁয়ে থাকে জল
ঝোপেঝাড়ে ভাঁটফুল

চেনা অচেনার ভীড়ে গমগম করে ঘাট সকাল বিকেল
একই ছবি বারোমাস
নৌকা জানে কারা পারাপার হবে
নদী জানে মানুষের হাঁড়ির খবর
মাছরাঙা পাখির ডানায় বিকেলের রোদ ম্লান হয়ে
সন্ধ্যা নামে
দূরে দূরে দ্বীপগুলি জোয়ার ভাঁটার টানে
টিমটিমে আলো বুকে জেগে থাকে
অনিশ্চিত জীবন সংসার
নদী একা বয়ে চলে স্তব্ধতার ভার

খনন

শঙ্কর তালুকদার

সাতদিন হয়ে গেল পার
তেমনি অন্ধকার
ঘড়ি নেই হাতে
টিক টিক কয় না কথা
হেলমেটের আলো গেছে নিভে
খিদেবোধ যুদ্ধ করে ক্লান্ত
তবু বেঁচে আছি।
খবর হচ্ছে মোদের রোজ
হেথা হোথা কাটছে মাটি
কত শত যন্ত্রপাতি
মন্ত্রীরাও খবর নিচ্ছেন
দিন রাতি,
নিরাশায় আশা তাই ধুঁকছে।
যদি আবার দেখি আলো
মা'র জন্য সোয়েটার
বউয়ের জন্য আলোয়ান
খুকুর জন্য কী যেন বলেছিল –
মনে আসছে না কেন?
আমরা কেউ নই
এই রাজ্যবাসী –
কখনও সেতু, কখনও প্রাসাদ
কখনও পাথুরে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে
কিছু রোজগার
সেই আশায় আসি।
বিধি কেন রুষ্ট হ'ল
কেন ধরল ভাঙ্গন
এঞ্জিনিয়ারদের নানান কথার
আমরা বুঝি না কারণ।
আর কতদিন চলবে
উদ্ধারের কাজ
শেষ অবধি নেব কি
নীল আকাশে শ্বাস
দেখব পরিবারের হাসি,
দু-চোখে জল নিয়ে
কেটে যায় রাতি।

কোন দীপাবলি

শঙ্কর তালুকদার

হাজার আলো জ্বেলে
দেখছ তাদের শোভা
একটু এগিয়ে দেখো
বইছে কারা বোঝা।
আলোর সাথে শব্দ দূষণ
লাগিয়ে দেয় তাক
শিশু শ্রমিক, শিশু শ্রমিক
সেথায় করে বাস।
এত আলোর মাঝে
অন্ধকারের রাজ
পর্দাখানি সরিয়ে দেখো
কেমন তাদের সাজ।
জ্বলছে আলো, জ্বালো তবে
ওদের কাছে ডেকে
তোমার হাতের প্রদীপ
যেন ওদের হাতে ওঠে।
আর যে আলো
নিভে গেছে
মিথ্যা অনাচারে
ভয়ের তরে খোঁজ রাখিনি
কোথায় তারা জ্বলে।
একটু আলো ধার করো
সেই মহান প্রাণের থেকে,
হৃদয় মাঝে আলোর ছটা
আপনি উঠবে জেগে।

বর্তমান সংবিধান

মালবিকা চ্যাটার্জী

ভয় পাচ্ছ, ভাবছ বুঝি
কোপ মারব আজই?
নাঃ, না না না –
তা হবে না,
দেখতে হবে পাঁজি |
দিনটি দেখে
আট বেঁধে আর ঘাটটি বেঁধে
এগোলে নেই গোল
তা না হলেই
তোমার দলে উঠবে সোরগোল |
তোমরা বাবা সহজ তো নয়
সরল আমার মতো!
ঘোল ঢালতে ওই মাথাতে
হয়রানি হয় যত |
এখান খুঁজি ওখান দেখি
সবখানেতেই শূন্য
তাই না রে ভাই
জমিয়ে তুলি
মিথ্যে বোঝার পুণ্য!

এ সংসারে সামলে চলা
হারিয়ে গেছে কবে
সবাই মিলে কোমর বেঁধে
কোঁদল করি গর্বে
কী যে হবে যায় না জানা
হুঁশ কারো নেই তাতে
কথার তোপে তাতিয়ে জগৎ
দন্ড আপন হাতে!
আবহাওয়া বদলে গেছে
বদলেছে সুবিচার
বদলে গেছে বিবেক-বুদ্ধি
শূন্য অন্তঃসার |

লড়াই মোদের মোদ্দা কথা
লড়তে ভালবাসি
এলোপাথাড়ি কথার তোড়ে
চারদিকে বানভাসি
এই না হলে কলির দশা!
ভাবতে লাগে ভয়
কী জানি কোন কোপের বশে
যুদ্ধে হবে জয়!

তারপরেতে –
ভাবতে বসো ‘কী হ’ল রে ভাই’?
চিন্তা কীসের, সংবিধানটাই
বদলে গেছে তাই!

কৃপণ

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

কৃপণ কেন মন রে – ওরে
সবটা খুলে বল না,
আনন্দ বা দুঃখ কী তোর
সব শুনি আয় – চল না।

আনন্দকে ভাগ না করে
হয় নাকি তা পূর্ণ?
সবাই মিলে না পেলে সে
রইবে যে অপূর্ণ!

দুঃখ কী তোর – আয় না শুনি
সইবি কেন একা?
বন্ধু কেন বলিস তবে,
কেনই হ'ল দেখা?

মানছি কিছু দুঃখ আছে
যা আপনার আপন,
বন্ধু বলেই করব দাবি,
করিস নে আর গোপন!

দুঃখ বলে – দেখিস কেমন
মন হয়ে যায় হালকা,
ব্যথার সে ভার বন্ধু যে নেয়
ছাড়িস নে সেই মওকা!

বন্ধু কিছু বললে শুনিস
থাকিস না রে চুপচাপ,
মনকে কৃপণ করিস নে তোর
থাকুক না সে নিষ্পাপ।

মন্দ, ভাল যা মনে হয়
বলিস খুলে সামনে,
বন্ধু বলেই বলছি এমন
কৃপণ কভু হোস নে।

তিরিশ হ'ল পার

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

যুগল প্রাণের প্রেমের পথে
মিলল পরশ যাঁর,
তাঁর আশিসে যাত্রা দোঁহের
তিরিশ হ'ল পার!

তিরিশ হ'ল কেমন করে
বিস্ময়েতে ভাবি,
এই তো সেদিন আদান-প্রদান
মনের কিছু দাবি।

তারপরে তো লুকিয়ে দেখা
বন্ধ চিরতরে,
মিলত দেখা সবার মাঝে
মনের গোপন ঘরে!

কোথায় কবে জানিয়ে যবে
বাইরে হতো দেখা,
দুটি হৃদয় কোন গভীরে
মিলিয়ে যেত একা।

মনে পড়ে সেই অনুভব
সাঁঝের চলার পথে,
গভীর শ্বাসে নাম দিয়েছি
"নির্জন সৈকতে"।

তারপরে তো পড়ল হৃদয়
সাতপাকেতে বাঁধা,
ধন্য হ'ল জীবন দোঁহের
পেরিয়ে সকল বাধা।

চন্দ্র রবির আলোর ছোঁয়ায়
জীবন হ'ল তাঁর,
যাঁর আশিসে যুগল যাত্রা
তিরিশ হ'ল পার!

তুমিই তো শব্দ শেখালে

অজয় সাহা

এখানে নীল সামিয়ানা দশ খুঁট দশদিগন্তে বাঁধা
এখানে পাখিদের অবাধ গলাসাধা
এখানে ওড়ার ঠিকানা লেখা ডানা
এখানে পাথরেরা শুয়ে আর কখনও জাগে না
এখানে শব্দহীনতার বিপুল চাঙর নিশ্চুপ নিথর চরাচর
এখানে নীরবতা আসলে পৃথিবীর প্রাচীনতম ঘুমের স্বাধীনতা –

আমরাও হতাম যদি স্তব্ধতার এই উপনিবেশ
আর তার দাসানুদাস
হয়তো আমাদেরও এমনই হতো এই চিরচুপ দশা –
যদি না তোমার
এলোচুল ভরা-কোটালের আলো মেখে নিত
যদি না তোমার
উষ্ণ ঠোঁট শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদে চুমু এঁকে দিত
যদি না তোমার
বিস্ফারিত স্তনজোড়া ঈশ্বরের যোগনিদ্রা ভেঙে দিত
যদি না তোমার
রজঃস্বলা যোনীমূল জয় করে নিত পৃথিবীর যাবতীয় পুরুষকার
যদি না তোমার
আনাগোনা শস্যের আবাদ আর অরণ্য অবাধ অধিকার
যদি না অলকানন্দার তীরে দেখা হতো তোমার আমার

বসন্ত বিলাপ

সফিক আহমেদ

বসন্ত আজ পলাশ আভরণে রক্তে রাঙা।
প্রেম ফাগুনে হিমেল বাতাসে স্পর্শের ওম।
শেষ সূর্যের অভিমানী বিদায় আরক্ত মুখে,
চাঁদ ভেসে ওঠে কুয়াশা জড়িয়ে সূর্যাস্ত পটে।

চাঁদনী রাতে কবিতারা আজও যৌনতা খোঁজে,
বিনিদ্র রাতে ফেরিওয়ালা আসে স্বপ্ন বেচতে,
জ্বরের ঘোরে কামুক স্বপ্ন রক্তরাঙা চোখে,
গনগনে আগুন স্পর্শের ওম কাঁপানো শীতে।

আসঙ্গ লিপ্সা সঘন নিঃশ্বাস আর সেই সোহাগ,
তোমার স্পর্শে বেজে ওঠে আজও রাগ বেহাগ।
বিনিদ্র রাতে রাতজাগা তারা করে আলাপ,
স্বপ্ন সুখের বাগিচায় ফোটে লাল গোলাপ ।

কালের করাল গ্রাসেতে স্বপ্ন হয় বিলীন,
হারানো সুর রঙিন আকাশে আনে বিষাদ,
স্তব্ধ শহর হারিয়ে যাওয়ার শোকে আকুল,
ভগ্ন হৃদয়ে সাঁঝবাতি আজ হয়েছে ম্লান।

চাতকী লিপ্সায় চড়া রোদ্দুর সুনসান দুপুরে
অতৃপ্ত আত্মা অবলুপ্ত প্রেম খুঁজে খুঁজে ফেরে,
কুয়াশা মেখে ভালবাসা থাকে শৈল শহরে
আর মেহেক আনে শুকনো ফুল স্মৃতির বাসরে।

বৃদ্ধাশ্রম

সন্তোষ অ্যালেক্স

অনুবাদ: বেবী কারফরমা

দু'বেলা
বাধ্যতামূলক প্রার্থনা করতে হয় এখানে
ছোট বৃদ্ধাশ্রমে নিজের
কাজ নিজেকেই করতে হয়
বড়গুলোতে উর্দিপরা সাহায্যকারী থাকে
জন্মদিন পালন করতে আসা পরিবারের
ছেলে বৌমা খুঁজে বেড়ায় তাদের ভিড়ের মধ্যে
বৃদ্ধদের হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকা উদাসীনতা
কোন ক্যামেরাই বন্দি করতে পারে না।
খায় খাওয়ায়
সময় কাটায়, ফটো তোলে
চলে যায় অতিথি
পরের দিন আবার
ঈশ্বরের গুণকীর্তন করে
কাঁপা আওয়াজে প্রার্থনা সেরে
নিজের নিজের থালা নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে বৃদ্ধ
খাবার পর
আবার সেই উদাসীনতা আর অস্থিরতা
হলঘরের নিস্তব্ধতা ভাঙে
কারোর কাশির অথবা গুমরে কাঁদার

একদিন সমুদ্র সৈকতে

নূপুর রায়চৌধুরী

মাথার উপরে সূর্যটা,
আকাশ ভাসাচ্ছে গনগনে আলোয়।
সাদা বালি উঠছে পড়ছে,
আমার পায়ে, গায়ে,
ঘিরে ধরছে আমার চারপাশ।
চমকে উঠে ঘাড় ফেরাই,
কেউ নেই আর কোথাও,
শুধু অবুঝ সবুজ নীল নীল জল।
নাগরিক কোলাহল সব বোবা এখানে,
কিন্তু শব্দের কোনো বিরতি নেই।
গভীর ঢেউ তীরে এসে ধাক্কায়,
জল ভাঙে ছড়ছড়, সরসর,
শোঁ-শোঁ করে গুমরায় বাতাস,
দূরে দূরে ডাকে শঙ্খচিল।
নোনা জলের আঁশটে গন্ধ,
বাতাসের আঁচল বেয়ে বেয়ে,
সেঁধিয়ে যায় অলিন্দের কোণে কোণে।
সূর্যের তাপে,
আমার পিঠ পোড়ে,
ভ্রূক্ষেপ করি না।
অজানা লবণ হাওয়া,
আমাকে শীতল করে,
আঙ্গুলের ফাঁকে জাগে,
অস্থির বালিয়াড়ি,
আমি জেগে উঠছি,
আদিম মানুষের মতো,
একটু একটু করে,
মেকি সভ্যতার মুখোশ ঠেলে ফেলে,
যেমন করে জাগে,
সোনালী উপল জল সরে গেলে।

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা

রঙ্গনাথ

অবরুদ্ধ দুর্বল দেশ! দেশের মানুষ অধিকার থেকে বঞ্চিত
তারা ঠাসাঠাসি করে থাকে; প্রতি পদে পদে পায় অবিচার;
যখন তখন উচ্ছেদ হয়ে তারা হারায় জমি, গাড়ি, বাড়ি-ঘর;
লাভ যদিও নেই, তবু ক্ষণে ক্ষণে দাবী করে ন্যায্য অধিকার।
যারা ক্ষুব্ধ হয়ে করে প্রতিবাদ, যায় সবল দেশের কারাগারে;
যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায়, দুর্বলরা বেশী মরে; তারা মেনে নেয় হার।
ব্যাপারটি বেশ চমৎকার!

হেথা যুদ্ধ চলেছে যুগ যুগ ধরে; এবারেরটি অন্য রকম
দুর্বলরা সবলদের করেছে হামলা – শাস্তি পাচ্ছে হানাদার!
বোমা পড়ছে ঘর বাড়িতে, স্কুল-অফিস, হাসপাতালে
মসজিদ-গির্জা যায়নি বাদ; শহর গ্রাম হচ্ছে চুরমার।
যেদিক থেকে দেখি না কেন, নেই কিছু আর আগের মতো
সহস্র সহস্র টন বোমা বর্ষণের ধ্বংসলীলাটা কদাকার!
এবার ধ্বংসকান্ড চমকদার!

অভাগা সবাই প্রাণ বাঁচাতে ছুটছে এদিক থেকে ওদিক
কোথাও তাদের রক্ষা নেই, সর্বত্র বন্দুক – বোমার হুঙ্কার!
চলছে হত্যাকান্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ – শোনা যায় আহাজারি
মরছে সন্তান, মাতা-পিতা; কেহ হারাচ্ছে গোটা পরিবার!
ধ্বংসস্তুপে শত শত মৃতদেহ, অসংখ্য সব আহতরা
হতভাগাদের গুণতে গেলে তারা হয় হাজার হাজার!
গণহত্যা সবার থেকে পাচ্ছে ধিক্কার!

শত্রু মুক্ত যারা চায়, জানে না তাদের শত্রু কোথায়
ফেলছে বোমা এলোপাথাড়ি, এধার থেকে ওধার!
হঠাৎ হঠাৎ হুকুম আসে, 'যাও এপাশ থেকে ওপাশ'!
জনগণ ছোটে দিগ্বিদিক; সব আদেশ মেনে চলা ভার –
বেজায়গায় আশ্রয় নিয়ে, পালাতে গিয়ে হাঁটার সময়
গুলি আর বোমার আঘাতে তারা হত-আহত বার বার।
ঘোষণাগুলো শুধু অপপ্রচার!

ক্ষুব্ধ সবলরা হন্যে হয়ে শত্রু খোঁজে দুর্বল দেশ জুড়ে –
জনগণ তাড়া পেয়ে পেয়ে হচ্ছে মহা ভোগান্তির শিকার;
নেই বাড়িঘর, খোলা মাঠে তারা থাকে গাদাগাদি করে;
কোণঠাসা মানুষ আধমরা; পায় না জল, পায় না খাবার।
মরছে শিশুরা অনাহারে; খাবার না পেয়ে মরিয়া সবাই!
সবলরা থোড়াই কেয়ার – শত্রুদের তারা করছে সাবাড়!
বর্বরতার জয় জয়কার!

একবিংশ শতাব্দীতে এমন কান্ড, ভাবতে ভীষণ কষ্ট হয় –
কী করে এখন সবলরা করতে পারে এমন অত্যাচার?
এ মারামারি চলতে থাকবে যত দিন না দু'পক্ষ শান্ত হয় –
রক্তেরাঙা দেশের মাটি, দুর্বলরা কি মেনে নেবে হার?
সবল পক্ষ ঘেরাও করে বোমার আঘাতে বেধড়ক মারছে –
তারা কীভাবে এ গণহত্যার অপরাধ থেকে পাবে পার?
হেথা চরম দশা মানবতার!

হত্যা, নৃশংসতা, বর্বরতার অপরাধে দু'পক্ষই কম বেশী দায়ী।
এ যুদ্ধের হিংস্রতা, হত্যাকান্ড দিয়ে পাচ্ছে কি কেহ উপকার?
যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা চাই না আর!

একাকীত্বের নেই কোনো বিপরীত

আলী তারেক

"মিলন তো দু'জন, একা আর একা।
দুটি সঙ্গীতের ক্ষণিক অনুরণনের নির্লজ্জ কাকতাল।"
অন্ধকারের যেমন আলো –
তবু মাঝে মাঝে গোধূলির সদয় ওকালতি
ঘৃণার যেমন ভালবাসা –
তবু সময়ে সময়ে অভিমানের কোমল দালালি
একাকীত্বের তেমন নেই কোনো বিপরীত –
শুধু মাঝে মাঝে ভুলে যাওয়া,
শুধু আলোর গোধূলিকে ভুল করে ভাবা সঙ্গ
শুধু প্রেমের অভিমানকে ভ্রমবশতঃ চেনা সাহচর্য।
একাকীত্বের নেই কোনো বিপরীত –
আছে শুধু নিঃসঙ্গতা ভুলে থাকার একসারি
মুহূর্তগুচ্ছ –
হ্রস্ব বা দীর্ঘ।
তবু জ্যোৎস্নায় বসে পাশাপাশি
ধরিত্রীর দেহে মাখনের প্রলেপ যদি নিরাময় দেয়
সহাবস্থানের ঘর্ষণে সূচিত ক্লান্তি ক্ষুধা ক্ষতে,
যদি অপত্যস্নেহ মাঝে মাঝে টেনে ধরে
অদৃশ্য রজ্জুর কঠোর মায়ায়, তবে
মাঝে মাঝে বিস্মৃত হওয়া –
একা আর একার মাঝখানের সেই অলঙ্ঘ দেয়াল –
এমন কিছু অকিঞ্চিৎকর প্রাপ্তি নয়।
তবু যদি জাগে অভিযোগের ক্ষোভ,
বাজে অনুযোগের অভিমান,
তবে সঙ্গহারা সঙ্গীর সাথে কলহের কুচকাওয়াজ কি
হতে পারে নৈঃসঙ্গের নিকটতম প্রতিমুখ?

যেতে পারো না

সুব্রত ভট্টাচার্য

তুমি যাবার জন্য অপেক্ষা করে আছ
অস্তরাগের ধূসর আকাশের
পথপানে চেয়ে
আমি তো ভেবেছিলাম তুমি
আমার কাছে থাকবে
সবকিছু কাজ গুছিয়ে।
তুমি তো সহজিয়া হয়ে আসোনি
পথের ধারে কিংবা জঞ্জালে
নদীর পাড়ে কুড়িয়ে পাইনি
বিলম্বিত লয়ে কান্নার সুরে
নিজেকে হারিয়ে আসোনি ।
আমি তো তোমায় পেয়েছি
অনেক নির্বিবাদ সাধনায়
অনেক আরাধনায়
প্রতিটি দিন তিলে তিলে
আমার অমর ভালবাসায়।
তুমি যাব বললেই চলে যেতে পারো না
বৃত্ত সেরে নৌকা ফিরে আসে
যেমন নিজের ঘাটে
আমিও তেমন তোমার কাছে ফিরে আসি
দিনান্তের আধাঁরে।
তুমি যেতে পারো না
চলে যেতে চাও?
সেটা কোনোদিন ভাবিনি
আমাকে ছেড়ে যাবার মালিকানা
তোমার হাতে নেই
সেই অধিকার তো তোমায়
আমি দিইনি।

কবিতারা গিয়েছে মৌন মিছিলে

সুব্রত ভট্টাচার্য

চিলগুলো অবমুক্ত, মৃত ভাগাড়ে ঠোকরাচ্ছে,
কবি দৌড়াচ্ছে কবিতার খাতা হাতে নিয়ে,
কালির বদলে রক্তাক্ত হাত তার,
খাতার পাতায় রক্তের স্রোত
খোলা চৌকাঠ, কেহ নেই –
চাবির থোকা পেরেকে ঝুলে
হালকা বাতাসে পেন্ডুলাম
সময়ের বার্তা দেখো, দেখো –
কিন্তু কে দেখবে!

আর কবির হাতে সাদা খাতা –
লিখছে পর পর শব্দের বাঁধনে পতনের কবিতা
উত্থান, সে তো কবেই মরে গেছে।
কবির কলম বিধাতার কাছে প্রার্থনা করে
চিলগুলোর কথা লিখতে দাও,
অসহায় মানুষদের কথা লিখতে দাও,
মরা জন্তুদের কথা লিখতে দাও,
আর যারা বিগত দিনের ক্ষতবিক্ষত –
তাদের কথা লিখতে দাও,
এখন মৃত, ভাগাড়ে পড়ে আছে তাদের কথা লিখতে দাও।
হঠাৎ বৃদ্ধ এক চিল বলে ওঠে
সব অখাদ্য, দুর্গন্ধ খাচ্ছি আমরা,
তবুও ঠুকরে চলে চিলেরা,
শেষ নির্যাসটুকু নিয়ে নেবে।
নির্জীব, নিস্তব্ধ হয়ে ঢলে পড়ে
এরাও, বিষাক্ত পৃথিবীর বুকে।
নির্লিপ্ত চোখ বন্ধ অন্ধকার হয়ে আসে।
ভাগাড়ের শুকনো রক্তভেজা ঘাসের ডগায়
তপ্ত দুপুর নেমে আসে।
কবি লিখছে অ, আ, ক, খ।
সাদা-থান-শাড়ি মুড়ে নতুন বউটা দাঁড়িয়ে দেখে
ভোকাট্টা ঘুড়ি, লুটিয়ে দলাপাকানো সুতো
কবি তাকিয়ে, সে তাকিয়ে –
কতগুলো মৃত চোখ চেয়ে আছে
নির্বাক প্রশ্নের জবাব অপেক্ষায়,
আজ বোবা নির্বাক কবির জন্মদিন
কবিতারা গিয়েছে সব মৌন মিছিলে।

তোমার চিঠি

উদ্দালক ভরদ্বাজ

তারপর
পুরনো চিঠির বাক্সে একদিন
ঢুকে পড়ে একটা ছোট্ট হলুদ পাখি
ঘাড়ের কাছে লাল রোঁয়া
খুঁটে খুঁটে চিঠিগুলো তুলে
রেখে আসে তার সদ্য-বানানো বাসায়

আমি দেখি,
তোমার চিঠি
উড়ে যাচ্ছে ফাল্গুনি হাওয়ায়
তোমার চিঠি, বাসা বাঁধছে
অসীমের ডালে

যদিও তুমি বলোনি...

দীপান্বিতা সরকার

যদিও তুমি বলোনি –
লিকার চা, চিনি কম,
ছুটে চলা হরদম –
বাতের ব্যথা, হাতের মালিশ
ঠিক করে দেওয়া, চাদর বালিশ –
কখনো শোনা হয়নি,
তবুও মুখ ফুটে কিছু বলোনি!

চুপ নিশ্চুপ পাশে বসে থাকা,
ছেলেমেয়ে নেই, ঘরগুলো ফাঁকা!
ব্যস্ত জীবন, হাঁফছাড়া দিন
মোবাইল মেসেজ, আশা তবু ক্ষীণ –
বুককাঁপা ভয়, তোমার অভয়
অপচয় নয়, নয় পরাজয়
ক্যালেন্ডারের পাতা ওল্টানো, দিনগুলো গোনা হয়নি –
যদিও তুমি বলোনি।

খুব বেশি নয়, একটু আধটু
রান্নাবান্না, সংসারী পটু
হালকা মসলা, পাতলা ঝোল
হজমের কথা, নয় হবে গোল –
চোখে চোখে কথা, বুঝেসুঝে চলা
মান অভিমান, কথা না বলা –
কখনো তো সাড়া দাওনি,
যদিও কিছু বলোনি।

কত ঝড় জল, ঝগড়া বিবাদ
সাতপাকে বাঁধা, তোমার শপথ
মিথ্যে কথার আভরণ দিয়ে
সত্যের ভান হয়নি...
যদিও কিছু বলোনি!

আত্মীয় স্বজন, নয় প্রিয়জন,
সম্পর্ক সেথায়, শুধু প্রয়োজন
বুঝতে, বোঝাতে সময় ফুরাল...
অঘুমের রাত, পাশ ফিরে শুলো –
সন্ধি আপস হয়নি,
যদিও কিচ্ছু বলোনি।

হাজার চেষ্টা, বাঁচার লড়াই
উঁচু করা মাথা, স্বল্প কামাই,
নিজে না কিনে, অন্যকে দেওয়া,
এখনো তো শেষ হয়নি।
যদিও কিছুই বলোনি!

কিছু কথা নয়, না-বলাই থাক,
দুটো মন শুধু পাশাপাশি থাক
কথার উপর কেবল কথা
সুখের খোঁজে, কেবল ব্যথা
এই চলা বেশ, ধীরে সুস্থে
কখনো তো, তাড়া দিইনি!
যদিও তুমি বলোনি।
আজও শোনা হয়নি!

নরক

অযান্ত্রিক

আমি দেখেছি নরকে নেমেছে চাঁদ,
হ্যাঁ শুধু আমি একলাই দেখেছি।
কবিদের নাকি অমন চোখ থাকে,
কিন্তু আমি অন্ধ, কিছু দেখতে পাই না।
অথচ, কেমন নির্লজ্জের মতো দেখেছি।
তার উন্নত গ্রীবা, পেলব ফর্সা মসৃণ ত্বক,
আমি দেখেছি।
আর কেউ দেখেনি।
মেঘেরা কানাকানি করেছিল,
নরক! সে আবার কী?
খায় না মাথায় মাখে!
আমি, হ্যাঁ হ্যাঁ আমিই চিৎকার,
আর মিথ্যে প্রতিশ্রুতি শুনতে শুনতে,
নোয়ানো মাথার বছর গুনতে গুনতে,
বদ্ধ কালা হয়ে গিয়েও শুনতে পেয়েছি।
যেমন মঞ্চে কবিতা পাঠরত নবীন কবি,
চেয়ার ছেড়ে উঠে যাওয়া, গল্প করা চা খাওয়া,
পাঠকের মধ্যেও শুনতে পায় তার সৃষ্টির বাহবা।
তেমনি শুনতে পেয়েছি।
ভুঁইফোঁড় পত্রিকার সমূল্য স্মারকে,
দেখতে পায় স্বীকৃতি।
আমিও সেইভাবেই দেখেছি, চাঁদ নেমেছে নরকে।
খিদের উল্টোদিকে সততাকে,
হারিয়ে যেতে দেখতে দেখতে।
ক্ষমতার লোভের চায়ের কাপে,
চুমুক দিয়ে যমকে বলেছি,
‘আগামী সম্মেলনে আমার বাপের নামে স্মৃতি
পুরস্কার দেব, নিয়ে এসো কয়েকটাকে ধরে’
সে হেসে জানিয়েছিল,
‘আপনি যা বলবেন’
কেউ শোনেনি, কেউ দেখেনি,
সবাই ভাবছে স্বর্গে আছে।
ওরা তো জানেই না এটা নরক,
তাই তো এত মিথ্যে, রক্ত, পুঁজ, আর রেষারেষি।
আমি জানি, তাই দেখতে পাই শুনতে পাই।

কুহুর ফিরে যাওয়া

শান্তনু চক্রবর্তী

ট্রেনটা ছাড়তে এখনো মিনিট বারো দেরী আছে। কুহু জানলা দিয়ে তাকিয়ে প্ল্যাটফর্ম দেখছিল। বিশ্লেশভাইয়া ওর জানলা থেকে কোনাকুনি প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরের একটি স্টলে দাঁড়িয়ে সিগারেটে টান দিতে দিতে এক ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে। কুহু জানে ওটা কোনো সিনেমার ম্যাগাজিন নয়, সম্ভবতঃ খেলার ম্যাগাজিন। বিশ্লেশের খুব ইচ্ছে ছিল বড় ক্রিকেটার হওয়ার। আজন্ম মুম্বাইতে মানুষ বিশ্লেশ লোখান্ডে যদি ক্রিকেটার হতে চায়, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। উইকেট কিপার হবার ইচ্ছে ছিল ওর। কিন্তু ও যেন ভুল করেই চলে এসেছে এই ফিল্ম লাইনে; গত প্রায় ছ-সাত বছর ধরে প্রখ্যাত ভিডিওগ্রাফার সঞ্জয় শাস্ত্রীর অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করে যাচ্ছে। হয়তো কোনদিন বড় ভিডিওগ্রাফার হয়ে যাবে বিশ্লেশভাইয়া। ক্রিকেটার হওয়ার বয়স ও পেরিয়ে এসেছে, তবু আজও ছুটিছাটায় ও গ্লাভস্-প্যাডস্ পরে মাঠে নেমে যায়। আর যখন এরকম খুচরো ব্রেক পাওয়া যায়, তখন ক্রিকেটের খবর উল্টেপাল্টে পড়ে। তবে ওর সময়জ্ঞান খুব টনটনে। তাই কুহু জানে, ট্রেন ছাড়বার ঠিক আগে বিশ্লেশভাইয়া একবার দেখা করতে আসবেই।

কুহু ফিরে যাচ্ছে। ফিরে যাচ্ছে ওর নিজের শহর কলকাতায়। একজন মানুষের একাধিক নিজের শহর থাকতে পারে। কুহুও চেয়েছিল কলকাতার মতো এই মুম্বাই শহরটাও ওর নিজের হয়ে যাক। গত সাত বছর মুম্বাইতে থেকে এখানকার খাওয়াদাওয়া, ভাষা-সংস্কৃতি, আদবকায়দা, সর্বোপরি মানুষজন সবাইকেই ও আপন করে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। অনেকটা সফলও হয়েছিল। কিন্তু আসল জিনিসটাই যদি না হয়, তাহলে তো এখানে থেকে কোনো লাভ নেই। তাই এই শহরটাকে শেষ পর্যন্ত বিদায় জানাতেই হচ্ছে। চলে যেতে হচ্ছে সব ছেড়ে। এর জন্য ওর কষ্ট যে হচ্ছে না, তা নয়। খুবই কষ্ট হচ্ছে। দিন কুড়ি আগে যখন ও এই সিদ্ধান্তটা পাকাপাকিভাবে নিয়েছিল, তখন প্রথম তিনদিন ও খুব কেঁদেছে। যখনই একা হয়েছে, তখনই কেঁদেছে। কিন্তু মনকে দুর্বল হতে দেয়নি। নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে এবং ট্রেনের টিকিট বুক করে নিতে দেরী করেনি।

কুহুর সহযাত্রীদের যারা সী অফ করতে এসেছিল, তারা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। বিশ্লেশকেও দেখা গেল এগিয়ে আসতে। এসি কম্পার্টমেন্ট হওয়ায় জানালায় দাঁড়িয়ে কথা বলা যাবে না, তাই কুহুও দরজার দিকে এগোল। বিশ্লেশ দরজায় এসে বলল, "ঠিক সে জানা, বেহেনা! বীচ বীচ মে ফোন করতে রেহনা। আগর কোই চীজ কী জরুরত হো তো বেঝিঝাক লিখনা। চলতা হুঁ। হ্যাভ এ সেফ জার্নি!" বলে এক গাল হেসে চলে গেল বিশ্লেশ ভাইয়া। কুহুর চোখে আবার জল এসে গেল। দ্রুত চোখ মুছে চলে এল নিজের সীটে। এই বিশ্লেশভাইয়ার সঙ্গে কুহুর পরিচয়ের বয়সও প্রায় সাত বছরই বলতে হয়। সেই প্রথম দিনের শুটিং থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিশ্লেশের সঙ্গে এই সম্পর্কে কোনোদিন চিড় ধরেনি। যখন যা দরকার হয়েছে, কুহু সবসময় ওর সাহায্য পেয়েছে।

ট্রেন ঠিক সময়ে ছেড়ে দিল। প্ল্যাটফর্ম আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে বিশ্লেশভাইয়াকেও আর দেখা গেল না। কুহুও জানালা থেকে ভেতরে চোখ ফেরাল। ওর সঙ্গে চলেছে একটি গুজরাটি পরিবার। একজন পুরুষ, দুটি মহিলা আর তিনটি বাচ্চা, দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ছেলে দুটি হবে ১২-১৩ আর ৮-৯, মেয়েটি ৫-৬ মতো। ট্রেন ছাড়বার মিনিট কয়েকের মধ্যেই দুই মহিলার মধ্যে একজন তাঁর সঙ্গের ঝোলা ব্যাগটি থেকে তিন-চারটি খাবারের বাক্স বার করে ফেলেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ-ছটি থালা। এরপর নিপুণ হাতে থালায় থালায় খাবার বাড়তে শুরু করেছেন। কুহু একটু আগেই খেয়ে বেরিয়েছে। ওর সঙ্গে খাবারও নেই, আর আজ রাতটা খাবার অর্ডার করবারও কোনো প্ল্যান নেই। কুহু দেখল এই পরিবারটির ওর দিকে তাকিয়ে দেখার কোনোরকম ইচ্ছে বা চেষ্টাও নেই। একজন অকেশন্যাল সিরিয়ালের সাপোর্টিং অ্যাক্ট্রেসকে কারুর পক্ষে চিনতে পারাটা অত সহজ নয়। তাই চেনবার চেষ্টা করে কোনো লাভও নেই। এই পরিবারটির কথা ছেড়ে দিলেও আর যারা আসতে যেতে এদিকে তাকাচ্ছে এবং হয়তো এদের কারুর সঙ্গে কুহুর চোখাচখিও হচ্ছে, তারাও ওকে ঠিক চিনতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না। এমনটাই কুহু আন্দাজ করেছিল আর সেজন্যই মুম্বাই মেলের এসি থ্রী টিয়ারে টিকিট কাটতে দ্বিধা করেনি। প্লেনের টিকিটও যে কাটা যেত না তা নয়, কিন্তু এখন আসন্ন ভবিষ্যতের

কথা ভেবে পয়সাকড়ি একটু বাঁচানো দরকার|

নিজেকে সিরিয়ালের সাপোর্টিং অ্যাক্ট্রেস বলাটাই বর্তমানে কুহুর সঠিক পরিচয় | 'মেরে দিল কা রাজা' ছবিটি তো আর কোনোদিন রিলীজ করবে না! আশায় আশায় অনেকগুলো বছর কেটে গেল | অনেকবারই ভেবেছিল এই বুঝি প্রোডিউসার-ডিস্ট্রিবিউটারের ঝামেলা মিটল, এই বুঝি ঠিকঠাক থিয়েটার হল পাওয়া গেল, এই বুঝি উপযুক্ত রিলীজের ডেট পাওয়া গেল, কিন্তু সব সময়ই একটা না একটা বাধা এসে ছবি আটকে গেছে | কুহুর পরে ছবি করতে এসে কত ছেলেমেয়েই বেশ দাঁড়িয়ে গেল বলিউডে | এদের কেউ কেউ তো ইতিমধ্যেই সুপারস্টার, যেমন ঐশ্বর্য্য রাই বা প্রীতি জিন্টা বা রাণী মুখার্জী | ছেলেদের মধ্যেও ববি দেওল, অক্ষয় খান্না, ফারদীন খান – এরা ইতিমধ্যেই এস্টাব্লিশড | এমনকি 'মেরে দিল কা রাজা' ছবিটিতে যে হিরো ছিল, সেই বিনীত সচদেবেরও আরও গোটা দুই ছবি রিলীজ করেছে এবং মোটামুটি ব্যবসাও করেছে | কুহুরই আর কোনো ছবি হ'ল না! ভেবেছিল বিনীতের মতো সেও অন্য ফিল্মের জন্য ডাক পাবে| ডাক আর আসেনি| বদলে কিছু কিছু সিরিয়ালে ছোট ছোট চরিত্র করবার জন্য মাঝে মাঝে ডাক পাচ্ছিল| তাও বিঘ্নেশভাইয়া ছিল বলে! নাহলে তাও জুটত না| এসব ছোটখাটো রোল করে ও নিজেকে ব্যস্ত রাখছিল আর অপেক্ষা করছিল ওদের ছবিটি রিলীজ হওয়ার জন্য | যখন তা হ'ল না, তখন ও বিনীতের মতো নতুন ফিল্মে চান্স পাবার আশায় ছিল| তাও হ'ল না| শেষমেশ যখন এ বছর 'কহো না পেয়ার হ্যায়' সুপারহিট হ'ল এবং বলিউড হৃতিক রোশন ও আমিশা প্যাটেলের মাধ্যমে আরও এক জোড়া সুপারস্টার পেল, তখন নিজেকে বলতেই হ'ল, "আর নয়, অনেক হয়েছে!" অথচ কুহুর শুরুটা যেভাবে হয়েছিল, তাতে ওর নিজেকে বেশ ভাগ্যবানই মনে হয়েছিল| সেটা ছিল '৯৩ সালের জুলাই মাস| বিএ ফাইনাল দিয়ে তার দু-তিনদিনের মধ্যেই ও ওর বাবা-মা'র সঙ্গে ট্রেনে চেপে বসেছিল| সঙ্গে ওর ছোট দু'ভাইবোন টিকলু আর টিকলি | টিকলু টুয়েলভ দিয়েছে, আর টিকলি দিয়েছে টেনের পরীক্ষা| এসে উঠেছিল বাবার বন্ধু লাহিড়ীকাকুর বাড়ী| লাহিড়ীকাকুর পরিচিত একটি ছেলে, গৌতম দে বিখ্যাত প্রোডিউসার, মনোজ শেঠীর কাছে স্ক্রিপ্টের কাজে সাহায্য করত| সেই গৌতমের দৌলতে দুমাসের মধ্যেই শেঠীজীর সঙ্গে আলাপ | এই দুমাসে অনেক কিছুই ঘটে গেছে | বাবা একটা লেডিজ হস্টেল দেখে কুহুর থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন | সেখানে বাইরে থেকে পড়তে আসা বা চাকরি করতে আসা সিঙ্গল মেয়েরা থাকে | কুহুরও সেখানে অনায়াসে জায়গা হয়ে গেল | থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ভালই, শুধু একটু খরচ এই যা | বাবা-মারা অবশ্য তখনও লাহিড়ীকাকুর বাড়িতেই ছিলেন| কিন্তু টিকলু-টিকলির রেজাল্ট বেরিয়ে যাওয়ায় ওঁদেরকে চলে যেতে হ'ল| ঠিক হ'ল শেঠীজী তেমন কোনো ব্যবস্থা করতে না পারলে কুহুও ফিরে যাবে|

তবে কুহুর ভাগ্যটা সত্যিই ভাল ছিল| শেঠীজী কুহুকে প্রথমবার দেখেই একেবারে ফিল্মে নায়িকার রোল অফার করে বসলেন | আসলে সেই 'কেয়ামত সে কেয়ামত তক' হিট হবার পর যে কিশোর প্রেমের ছবির ঢেউ এসেছিল বলিউডে, এই '৯৩ সালেও তা অনেকটাই ছিল| আর নাদিম-শ্রাবণ, আনন্দ-মিলিন্দ, অনু মালিক, যতীন-ললিত, নিখিল-বিনয়রাও একের পর এক হিট মিউজিক দিয়ে যাচ্ছিলেন | সঙ্গে সঙ্গে সেই গানগুলোকে নিজেদের ফ্রেশ ভয়েস দিয়ে জীবন্ত করে তুলছিলেন কুমার শানু, উদিত নারায়ণ, অভিজিৎ, বিনোদ রাঠোর, অলকা ইয়াগনিক, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, সাধনা সরগম, পূর্ণিমারা| ছবি হিট না হলেও গান হিট হলে তারই দৌলতে নায়ক-নায়িকারা হয়ে যাচ্ছিলেন হিট| সবার মতো শেঠীজীরও ইচ্ছে ছিল একটি সফল কিশোর প্রেমের ছবি বানান| ওঁর আগের ছবিটি হিট হয়নি| তাই মনে মনে একটি অতৃপ্তি ছিল | কুহুকে পেয়ে তাই উনি ভীষণ খুশী হয়ে উঠেছিলেন|

কুহু দেখতে সুন্দরী না হলেও ও যে ভীষণই আদুরে দেখতে, সেটা যে বা যাঁরা ওকে দেখেছেন তাঁরা জানেন | শেঠীজীও বুঝেছিলেন কিশোর প্রেমের ছবির জন্য এরকম একটি কিউট মেয়েই ওঁর দরকার| কিউট হওয়ায় ২১ বছর বয়সেও ওকে ১৭-১৮ বলে ঠিক চালিয়ে দেওয়া যায় | এসব চিন্তা করে শিগগিরই মহরতের দিন ঠিক করে ফেললেন শেঠীজী | ঠিক হ'ল দশেরার ঠিক পর পরই হবে মহরত | আর দিওয়ালির পর থেকে টানা শুটিং | মহরতের আগের এক মাসে খুব দ্রুততার সঙ্গে লরেন্স ডিসুজাকে বেছে নেওয়া হ'ল এ ছবির পরিচালক হিসেবে | সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে সাইন করানো হ'ল আনন্দ-মিলিন্দকে | সমীর লিখবেন লিরিক্স | ঠিক হ'ল শানু-উদিত-

অভিজিৎ-অলকা-কবিতা-সাধনা-পূর্ণিমা – এঁরা সবাই গানে থাকবেন। পার্শ্ব চরিত্র হিসেবেও নামীদামী অনেকে এলেন – রীমা লাগু, পরেশ রাওয়াল, অলকনাথ, অনুপম খের, ফরিদা জালাল, মুকেশ খান্না, জনি লিভার, হিমানী শিবপুরী – এঁরাও থাকবেন ঠিক হ'ল। তবে নায়িকা হিসেবে কুহুর মতোই একটি নতুন মুখকে বেছে নেওয়া হ'ল। তাও খুব সহজে নয়। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ৬৪টি ছেলের স্ক্রিন টেস্ট নেওয়ার পর বিনীত সিলেক্টেড হ'ল। সেখানে নায়িকা হিসেবে কুহুর আগে মাত্র পাঁচটি মেয়েরই স্ক্রিন টেস্ট হয়েছিল। কুহুকে প্রথমেই মনে ধরেছিল শেঠীজীর। আর কুহু যেহেতু নিয়মিত আয়নার সামনে অভিনয় প্র্যাক্টিস করত, তাই ওর স্ক্রিন টেস্ট এক টেকেই 'OK' ছিল। শেঠীজী ভীষণ খুশী হয়ে গিয়েছিলেন। তাই মহরতের আগেই 'মেরে দিল কা রাজা' ছবির নায়ক-নায়িকার নাম সবার মুখে মুখে চাউর হয়ে গিয়েছিল – বিনীত সচদেব ও কুহু দাশগুপ্ত।

মহরতের দিন বাবা-মা এসেছিলেন। টিকলু-টিকলি ক্লাস থাকায় আসতে পারেনি। মহাসমারোহে হয়েছিল মহরত। অভিনয়ের বড় বড় রথী-মহারথী, যাঁদের এতদিন সিনেমার পর্দায় বা টিভির পর্দায় দেখেছে, কুহু তাঁদের যে শুধু কাছ থেকে দেখতে পেল তাই নয়, নায়িকা হওয়ায় সবাই ওকে 'বেস্ট অফ লাক' বললেন; সঙ্গে বিনীতকেও। মহরতের লোকেশন জেনেবুঝেই একটি বড় হোটেলে রাখা হ'ল যেখানে নায়কের ও নায়িকার পরিবার কোনো এক পার্টি উপলক্ষ্যে মিলিত হয়েছিল। সবাই সবাইকে 'হাই' বা 'হ্যালো' বলা ছাড়া এলাহী খাওয়াদাওয়াও শুটিংয়ের অংশ ছিল। আর শেষে নায়িকার বাবা নায়কের বড় ভাইয়ের সঙ্গে নায়িকার এনগেজমেন্ট ঘোষণা করলেন। নায়ক হয়ে গেল শোকে মুহ্যমান আর নায়িকা কান্নায় ভেঙে পড়ল। সেখানেই পরিচালক ডিসুজা ডাকলেন "কাট"। এরপর আরও একপ্রস্থ খাওয়াদাওয়া, তারপর বিদায়ের পালা।

সেখান থেকে বেরিয়ে কুহু বাবা-মার সঙ্গে এয়ারপোর্ট অবধি গেল। ওঁরা আজই ফিরে যাবেন। বাবার কাল আবার অফিস রয়েছে। শুটিংয়ের কান্নার পর এবারে মাকে জড়িয়ে ধরে কুহু সত্যি কান্নাও একটু কাঁদল। তারপর ওঁরা সিকিউরিটিতে ঢুকে গেলে ও ফিরে এল নিজের হস্টেলে।

ফ্ল্যাশব্যাকে বাধা পড়ল। চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তবের জগতে ফিরতে হ'ল কুহুকে। মিঃ ভিমানীরা এবারে শোবেন। বিছানা করা হবে বার্থগুলোতে। কুহুর ওপরের বার্থ। আর বসে থাকার মানে হয় না। ও বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে জল দিয়ে ফিরে এসে নিজের বার্থে উঠে পড়ল। ওর স্যুটকেসটা রয়েছে এদিকেরই নীচের বার্থের তলায়। সেটা থেকে আপাতত কিছু বার করার নেই। তবে সঙ্গের ব্যাগটি ওর নিজের বার্থেই ছিল। সেখান থেকে একটি চাদর বার করে পেতে নিল। সঙ্গে নিজের ওয়াকম্যানটিও বার করতে ভুলল না। তারপর ওয়াকম্যান কানে নিয়ে ব্যাগে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। ওদের সিনেমার গানের ক্যাসেট ঢোকানোই ছিল। 'কেয়ামত সে কেয়ামত তক' যখন সুপারহিট হয়, তখন কুহু সদ্য স্কুলফাইনাল দিয়েছে। তখন থেকেই ও ভাবত সেও একদিন নায়িকা হবে আর রোম্যান্টিক সব গানে লিপ দেবে। আয়নার সামনে অভিনয় করবার সময় লিপ-সিংগিংও প্র্যাক্টিস করত কুহু। ও ভাবত একদিন অলকা ইয়াগনিক, অনুরাধা পোড়ওয়াল, কবিতা কৃষ্ণমূর্তিরা ওর জন্যও প্লেব্যাক করবেন আর ও দেবে ওঁদের গানে লিপ। শেষ পর্যন্ত ছবি করার দৌলতে কুহু পেয়েছিল সেই সুযোগ। আর এই সেই ওর লিপ দেওয়া গানগুলোর ক্যাসেট। রিওয়াইন্ড করে প্রথম গান থেকে শোনা শুরু করল কুহু।

প্রথম গানটিই ছবিটির টাইটেল সং – "মেরে দিল কা রাজা"। সোলো। সাধনা সরগমের গাওয়া। কলেজের সীন। মিঠিভাই কলেজের এক ক্লাসরুমে হয়েছিল এই শুটিং। ক্লাসের ছেলেমেয়েদের প্রশ্নের উত্তরে নায়িকা জানাচ্ছে কেমন ছেলে ওর পছন্দ। রেড হেয়ারব্যান্ড, হোয়াইট টপ আর ফেডেড জিন্সপরিহিতা নায়িকা চোখেমুখে নানারকম মজার মুখভঙ্গি করে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নেচে ওর স্বপ্নের পুরুষের বর্ণনা দিচ্ছে। গানের মাঝে মাঝে ফিলার হিসেবে ক্লাসের ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞেস করছে, এই, 'রাজা' কেমন হবে দেখতে, কেমন হবে পড়াশোনায়, কেমন হবে খেলাধুলায়, নায়িকা বিপদে পড়লে গুন্ডাদের সঙ্গে ফাইট করতে পারবে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। কুহুর মনে আছে গানটি 'সুপারহিট মুকাবলা'-সহ বেশ কিছু কাউন্টডাউন শোতে দেখিয়েছিল। একটি কাউন্টডাউন শোতে তো গানটি তিন অবধিও উঠেছিল। গানটিতে কুহুর এক্সপ্রেশন এত স্বতঃস্ফূর্ত ছিল যে কোরিওগ্রাফার ফারহা খান, ডিরেক্টর লরেন্স ডিসুজা, আর অবশ্যই শেঠীজী ধন্য ধন্য করেছিলেন।

আর একই সঙ্গে ক্রেডিট দিতে হবে বিঘ্নেশভাইয়াকে। সেদিন ভিডিওগ্রাফার, সঞ্জয় শাস্ত্রী কোনও কারণে আসতে পারেননি। পুরো সিকোয়েন্সটা ক্যামেরাবন্দী করেছিল বিঘ্নেশভাইয়া। বিঘ্নেশভাইয়াই কুহুকে আগে থেকে বলে দিয়েছিল কোন কোন জায়গার ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করলে ক্যামেরায় ভাল আসবে। কুহু তাই করেছিল। আর পরে ভিডিও দেখে বিঘ্নেশভাইয়ার তারিফ না করে পারেনি ও। সেই প্রথম বিঘ্নেশের সঙ্গে কুহুর কাজ। সেদিন ব্রেকে ওর সঙ্গে বেশ ভালই আলাপ হয়েছিল কুহুর। বিঘ্নেশ ওকে বলেছিল ওর ক্রিকেটার হবার স্বপ্নের কথা। তখনও পর্যন্ত ও আশা করত যে ওর স্বপ্ন একদিন পূরণ হবে।

দ্বিতীয় গানটি একটি ডুয়েট। অভিজিৎ এবং পূর্ণিমার। গানটির প্রথম লাইন হ'ল "ও মেরি সজনী সুন্ মেরী কাহানী"। দিওয়ালীর পরপর এই গানটিকে দিয়েই শুরু হয়েছিল মূল ছবির শুটিং। গল্পে নায়ক, নায়িকার থেকে কলেজে এক বছর সিনিয়র। কলেজের কোনো ফাংশানে দুজনের আলাপ হয়, আলাপ থেকে বন্ধুত্ব। আরেকটু ঘনিষ্ঠতা বাড়লে নায়িকা নায়ক সম্পর্কে জানতে চায়। গানটিতে নায়িকা একের পর এক প্রশ্ন করে মজার ভঙ্গীতে আর নায়কও একই রকম মজা করে উত্তর দেয়। গানটির শুটিং নানান জায়গায় হয়েছিল বেশ কিছদিন ধরে। জুহু বীচ, মেরিন ড্রাইভ, এলিফেন্টা কেভ, সিদ্ধিবিনায়ক – নানান জায়গায় শুটিং হওয়ায় একই দিনে করা সম্ভবও ছিল না। গানটিতে নাচেরও বেশ কিছু কঠিন স্টেপ ছিল যেগুলো কুহুর জন্য ছিল বেশ কঠিন। সেজন্য ও ফারহা খানের অ্যাসিস্টেন্টের সঙ্গে আলাদা করে প্র্যাক্টিস করেছিল। নায়ক বিনীত নাচে বেশ ভাল ছিল। বিনীতও মাঝে মাঝে স্টেপিংয়ে সাহায্য করেছিল কুহুকে। এই গানটির সময়েই বিনীতের সঙ্গে কুহুর আলাপ। বিনীত দিল্লীর ছেলে। দিল্লীতে থাকার সময় স্টেজে অ্যাক্টিং করেছে। কিছু কিছু নাটকে মুখ্য চরিত্রেও ছিল। সেখানে কুহুর অভিজ্ঞতা খুবই সীমিত। বিনীত কিন্তু বলল, কুহুর অ্যাক্টিং দেখে সেটা বোঝার উপায় নেই। বিনীতের মতে কুহুর একটা সহজাত প্রতিভা রয়েছে যা অনেক স্টেজ-অভিনেতার থাকে না। তাই কুহুর সঙ্গে বিনীতের কেমিস্ট্রিও বেশ ভালই হ'ল। লরেন্স ডিসুজা ও শেঠীজী দুজনেই এই কেমিস্ট্রির উল্লেখ করলেন।

তৃতীয় গানটি কুমার শানু ও কবিতা কৃষ্ণমূর্তির ডুয়েট – "আখির তুমনে ইয়ে কেহ দিয়া"। এই গানটিই কুহুর সবচেয়ে পছন্দ। গানটি একটু ভাল করে শুনতে চায় কুহু। চারদিকে এখনো অনেক আওয়াজ। এগারোটা বাজতে চলল, তবু লোকজন জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। মিঃ ভিমানীর পরিবার অবশ্য ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু আশপাশ থেকে অনেক আওয়াজ আসছে। কানে ওয়াকম্যান থাকলেও সব সাউন্ডকে ঠিক আটকানো যাচ্ছে না। কুহু তাই আপাতত থামল। আরেকটু ঠান্ডা হোক চারপাশ, তখন নাহয় শুনবে। কুমার শানু বলিউডে হিট হবার পর থেকে কুহুর ইচ্ছে ছিল একদিন উনি ওর উদ্দেশ্যেও কোনো রোমান্টিক গান গাইবেন। এই গানে কুহুর সেই ইচ্ছেপূরণ হয়েছিল। গানটির শুটিং হয়েছিল ব্যান্ডস্ট্যান্ডে। মুম্বাইয়ের বিখ্যাত রকি বীচ। এই গানে নাচ ছিল না, তবে নায়ক-নায়িকা বীচের বিভিন্ন জায়গায় কখনও হেঁটে, কখনও বসে, কখনও একজন আরেকজনের কোলে মাথা রেখে শুয়ে গানের রোম্যান্টিক কলিগুলোতে লিপ দিয়েছিল। গানটির শুরুতে শানুর বিখ্যাত 'হে হে' ছিল আর গানটির শেষে কবিতার খুব সুন্দর রাগাশ্রয়ী আলাপ। কুহুকে সেই আলাপে লিপ দেওয়ার জন্য বেশ প্র্যাক্টিস করতে হয়েছিল। তাই এক টেকে নয়, তিন-চারটি টেক লেগেছিল গানটি OK হওয়ার জন্য।

মাঝরাত্তিরে চা-কফির চিৎকারে কুহুর ঘুম ভেঙে গেলে ও দেখল যে ওয়াকম্যান থেমেই রয়েছে। শানু-কবিতার সেই ডুয়েট আর শোনা হয়নি। আর এখন এই আধোঘুমে গানটিকে আর ঠিক এনজয় করা যাবে না। কুহু ওয়াকম্যান ব্যাগে ভরে ফেলে আবার ব্যাগ মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ল। এই গানটি কুহু অজস্রবার শুনেছে, তবু ওর একইরকম ভাল লাগে। আগামীকাল আবার কোনো নিরিবিলি মুহূর্তে গানটি শুনে নিতে হবে। এখন নাহয় ঘুমিয়ে পড়া যাক। কিন্তু চাইলেই তো আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম আসবে না। ওর মনে আসছে নানান চিন্তা। বাস্তব বড়ই কঠিন। এখন কলকাতায় ফিরে ওকে সেই বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। আটাশ বছর বয়সে পৌঁছে কি আবার নতুন করে পড়াশুনো শুরু করবে ও? নাকি কোনো ছোটখাটো চাকরি? নাকি অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের অ্যাক্টিং শেখাবে? কে শিখবে ওর কাছ থেকে অ্যাক্টিং? ওর নিজেরই তো অ্যাক্টিং-এর কোনো প্রথাগত শিক্ষা নেই! হিন্দী সিরিয়ালের দৌলতে বাংলা সিরিয়ালেও হয়তো ও চান্স পেয়ে যেতে পারে; এখন ই-টিভি বাংলা, আলফা বাংলা, দূরদর্শন – একাধিক বাংলা সিরিয়ালের

চ্যানেল | আবার কি সিরিয়ালে অ্যাক্টিং করাকেই ও বেছে নেবে কেরিয়ার হিসেবে? ভাল লাগবে ওর? লোকে বলবে না তো যে হিন্দীতে ব্যর্থ হওয়ায় বাংলাতে এসে জুটেছে? তবু ওকে হয়তো তাই করতে হবে | আর কী-ই বা পারে ও? আজ থেকে সাত বছর আগে প্রায় না পড়ে কোনোরকমে সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে বিএ-টা পাস করেছিল কুহু | অভিনয়ে এসে সেখানেও কেরিয়ারটা দাঁড়াল না | একমাত্র যে ফিল্মটি করেছিল, সেটি রিলীজ হ'ল না | যে ক'টি সিরিয়ালে অ্যাক্টিং করল, তার একটিতেও মুখ্য ভূমিকা নয় | অথচ অন্য অনেক বাবা-মা'র মতো ওর বাবা-মা কিন্তু ওকে কোনোকিছুতেই বাধা দেননি | নিজেরা সঙ্গে করে ওকে বম্বেতে নিয়ে এসে হস্টেলে জায়গা করে দিয়ে গিয়েছিলেন | আশা করেছিলেন মেয়ে একদিন দাঁড়াবে, ওর স্বপ্ন পূরণ হবে | এই সাত বছরে ওঁরা একবারও কুহুকে নিয়ে ধৈর্য হারাননি বা বিরক্ত হননি | কুহু যখনই কলকাতায় এসটিডি করেছে, বারবার জিজ্ঞেস করেছে ওঁদের মতামত | ওঁরা ওকে উৎসাহ দিয়ে গেছেন | তবু কুহুকে এই সিদ্ধান্তটা নিতেই হ'ল | দিনের পর দিন তো আর এভাবে চলতে পারে না! তবু ভাল, টিকলু-টিকলি দুজনেই ভাল হয়েছে লেখাপড়ায় – টিকলু ইতিমধ্যেই এঞ্জিনিয়ারিং পাস করে চাকরি করছে, আর টিকলিও এবার ম্যাথ নিয়ে এমএসসি-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে গেছে | সম্ভবতঃ টিকলি রিসার্চই করবে | টিকলু-টিকলির জন্য বাবা-মা'র সঙ্গে সঙ্গে কুহুও গর্বিত | অন্ততঃ এদের জন্য বাবা-মাকে মুখ লুকোতে হবে না | এটাই সান্ত্বনা | কথাটা ভেবে শেষমেশ কুহু একটু শান্তি পেল | ঘুম আসতে আর দেরী হ'ল না |

সকালবেলা ঘুম ভাঙল মিঃ ভিমানীর ছেলেমেয়েদের হৈহট্টগোলে | কুহু দেখল ঘড়িতে সাতটা কুড়ি | মিঃ ভিমানীর শ্যালিকা, যিনি গতকাল ট্রেনে ওঠার পরই খাবার বেড়ে ফেলেছিলেন, সেই তিনি এবারে ব্রেকফাস্ট পরিবেশনে ব্যস্ত হয়ে আছেন | ছোট ছেলেমেয়েদুটি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটিতে ব্যস্ত আর ওদের মা সেই ঝগড়া থামাচ্ছেন | বড় ছেলেটি মিঃ ভিমানীর শ্যালিকার ছেলে | সে একটি গুজরাটি খবরের কাগজ থেকে খেলার পাতা পড়ছে | মিঃ ভিমানী আস্তে আস্তে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন আর কৌতুকমাখা মুখে নিজের ছেলেমেয়ের কীর্তিকলাপ দেখছেন | কুহুর মনে হ'ল ওরও খিদে পাচ্ছে | ও বাংক থেকে নেমে বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে এল | তারপর এক ভেন্ডারের কাছ থেকে চার পীস ইডলি ও গরম চা কিনে নিল | মিঃ ভিমানী আগেই বিছানা তুলে ফেলেছিলেন, তাই কুহু বসার জায়গা পেয়ে গেল | এবারে আর জানলা জুটল না | মিঃ ভিমানীর মেয়ে জানলায় | তার পাশে বসে পড়ল কুহু | চেষ্টা করল মেয়েটির সঙ্গে একটু আলাপ জমাবার | মনে হ'ল মেয়েটি বিশেষ কথা বলার মুডে নেই | উল্টে মেয়েটির দাদা মনে হ'ল কথা বলায় ইচ্ছুক | কুহু তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালাল | জানা গেল মেয়েটির নাম দীক্ষা আর ছেলেটির নাম নির্বাণ | ওদের দাদার নাম উন্মেষ | মিসেস ভিমানী জানালেন মুম্বাইতে ওঁদের কাপড়ের বড় বিজনেস রয়েছে | বিছানাপত্র, ছেলেদের পোশাক, মেয়েদের পোশাক, বাচ্চাদের পোশাক সব পাওয়া যায় | বিজনেসের খাতিরে প্রায়ই মিঃ ভিমানীকে ভারতের বড় বড় শহরে যেতে হয় | তবে আপাতত ওঁরা কলকাতায় যাচ্ছেন হোলির ছুটিতে মিঃ ভিমানীর দাদার বাড়ী | সেখানেই ওঁদের ছুটিটা কাটবে | তিন ভাইবোনের স্কুলই আপাতত বন্ধ | তাই বেশ কিছুদিন পড়াশুনোর টেনশন নেই |

কুহুর মনে পড়ল ওদের শুটিংয়ের সময় ওদের ইউনিটের হোলি খেলার কথা | ততদিনে ওদের শুটিং প্রায় শেষ হবার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল | শিগগিরই ইউনিট ভেঙে যাবে আর কলাকুশলীরা অন্যান্য প্রজেক্টে ছড়িয়ে যাবে | ইতিমধ্যেই অনেকের হাতে নতুন কাজ এসে গেছে | কুহু সেরকম কোনো ডাক পায়নি, তবে ওর যা ট্যালেন্ট শিগগিরই কিছু পেয়ে যাবে অনেকেই বলল | কুহু নিজেও তাই ভাবছিল | অনুপম খের আংকল কুহুকে হোলির ডিনার পার্টির সময় আলাদা করে ডেকে বললেন যে এই ইন্ডাস্ট্রিকে কিছু বিশ্বাস নেই | যতই ট্যালেন্ট থাকুক, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না | ট্যালেন্ট অনেকেরই আছে, কিন্তু সবাই একইরকম সাফল্য পায় না | কথাটা কুহুর মনে ক্ষণিকের জন্য হলেও ভয়ের সৃষ্টি করেছিল | কিন্তু এরপর শুটিংয়ের শেষ দুদিনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তখনকার মতো সেই ভয় চাপা পড়ে গিয়েছিল | কিন্তু এরপর যথাসময়ে শুটিং শেষ হ'ল, ছবির ডিস্ট্রিবিউটার ঠিক হ'ল, ডিস্ট্রিবিউটারের সঙ্গে শেঠীজীর নানান রকম মতানৈক্য শুরু হ'ল, বারবার রিলীজ পিছোতে লাগল, শেঠীজী অন্য প্রজেক্টে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, লরেন্স ডিসুজাও নতুন ফিল্মে

ডিরেকশন দিতে চলে গেলেন | সিনেমার কলাকুশলীদের সঙ্গে যোগাযোগ বলতে সপ্তাহে একবার থেকে দু সপ্তাহে একবার, তারপর মাসে একবার, তারপর তিন মাসে ছ'মাসে একবার এবং শেষে আর যোগাযোগই তেমন রইল না | একমাত্র বিশ্বেশ ভাইয়া কুহুর নিয়মিত খোঁজখবর নিত আর নতুন ফিল্মের জন্য নায়িকা খোঁজা শুরু হলে ওকে জানাত | কুহু এ ধরনের খবর পেলে কখনও সখনও নির্দিষ্ট প্রোডিউসারের সঙ্গে যোগাযোগ যে করেনি, তা নয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যখন কুহু যোগাযোগ করত, ততদিনে প্রোডিউসার নতুন নায়িকা বেছে ফেলেছেন | যখন ফিল্ম সহজে জুটছে না, তখন কুহু ডিডি মেট্রোতে একটি সিরিয়ালে চান্স পেয়ে গেল | অলকনাথ আংকলই সিরিয়ালের ডিরেক্টরের কাছে ওর নাম প্রস্তাব করেছিলেন | নায়কের বোনের রোল | সিরিয়ালের নাম 'প্রতীক্ষা' | অলকনাথ নিজেও ছিলেন সিরিয়ালটিতে, তবে উনি যেহেতু বেশীরভাগ সিরিয়াল বা ছবির মতো এটিতেও নায়িকার বাবা, একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার তেমন হয়ে ওঠেনি, যা 'মেরে দিল কা রাজা' ছবিতে হয়েছিল | অলকনাথকে বিভিন্ন সিনেমা-সিরিয়ালে দেখে কুহুর মনে হতো উনি যেন হিন্দী সিনেমার পাহাড়ী সান্যাল | স্নেহময় বাবার চরিত্র মানেই ছিলেন পাহাড়ী সান্যাল | অলকনাথও যেন তাই | শুটিংয়ের বিভিন্ন দৃশ্যে একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবার সুযোগ এলেও শুটিংয়ের শেষে একসঙ্গে গল্পগুজব বা ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ তেমন হয়নি | কুহুর মনে তাই নিয়ে একটা অতৃপ্তি ছিল | কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সেই অতৃপ্তিও আর শেষ পযর্ন্ত থাকেনি | কুহুর সেই ইচ্ছে বাস্তবায়িত হয়েছিল ফিল্মের চতুর্থ গানটির শুটিংয়ের শেষে |

এই গানটিও একটি সোলো এবং এটিও গেয়েছিলেন সাধনা সরগম | গানটি এই ফিল্মে ছিল কুহুর সেকেন্ড ফেভারিট | লিরিক্স ছিল "জিন্দেগী লম্বী, তনহা, অকেলী" | যখন বড় হোটেলের পার্টিতে নায়িকার বাবা নায়িকার সঙ্গে নায়কের দাদার এনগেজমেন্ট ঘোষণা করেছিলেন, তখন নায়ক হয়েছিল শোকে মুহ্যমান আর নায়িকা ভেঙে পড়েছিল কান্নায় | সেটি মহরতের দিন ছিল বলে আর সেদিন শুটিং হয়নি | এর পরের দৃশ্যের শুটিং হয়েছিল নিউ ইয়ারের আগের দিনটিতে | সে দৃশ্যে নায়িকা নিজের রুমে নিজেকে বন্দী করে আরও দশটা হিন্দী ফিল্মের মতো বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদেছিল | তারপর কান্নার বেগ একটু কমলে শুরু হয়েছিল গানটির দৃশ্য | পুরো গানটিই ওই রুমের মধ্যে | মাঝে মাঝে ফ্ল্যাশব্যাক হিসেবে কিছু কিছু পুরনো গানের রোম্যান্টিক সীনের ক্লিপিংস – যেমনটা হয়ে থাকে আর পাঁচটা সিনেমায় | কুহু গানটায় লিপ দিতে দিতে গানের কথা ও সুরের মধ্যে এমনভাবে ডুবে গিয়েছিল যে যখন শুটিং শেষ হ'ল, তখনও ও কেঁদে চলেছে | সবাই মিলে কুহুকে চেষ্টা করছিল শান্ত করবার, ওর কান্না থামাবার | শেষ পর্যন্ত অলকনাথ আংকল ওকে আলাদা একটি টেবিলে ডেকে নিয়ে গিয়ে টুকরো টুকরো কথা বলে ওর মুখে হাসি ফিরিয়ে এনেছিলেন |

লাঞ্চের অর্ডার নিতে এলে কুহুকে এবারে অর্ডার দিতেই হ'ল | মিঃ ভিমানীদেরও বোধহয় সঙ্গে করে আনা খাবার ফুরিয়ে এসেছে | ওঁরাও অর্ডার দিলেন | আর ওঁদের মতো কুহুও ভেজই নিল | মিসেস ভিমানী একটু অবাক হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "বাঙ্গালী হো! ননভেজ নেহী খাতি?" কুহুও একটু হেসে বলল, "আজ মন নেহী কর রাহা হ্যায়!" খাওয়াদাওয়ার পর নির্বাণ ছাড়া বাকি সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন | উন্মেষকে কুহু ওর নিজের বার্থ ছেড়ে দিল শোবার জন্য | নির্বাণ-দীক্ষার মা কুহুর উল্টোদিকের নীচের বার্থে দীক্ষাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লেন | আর কুহু যে বার্থে বসে, তার জানলায় নির্বাণ, পাশে কুহু আর বাকি অল্প জায়গাটিতে মিঃ ভিমানীর শ্যালিকা গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লেন | একটুক্ষণ জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকার পর নির্বাণ কুহুকে বলল, "আন্টি! অব আপ বেঠো খিড়কী পে |" কুহু আর নির্বাণ জায়গা অদলবদল করবার মিনিট দশেকের মধ্যেই নির্বাণও ঢুলতে শুরু করল | কুহু নির্বাণকে ওর কোলে শুইয়ে দিল আর জানলা দিয়ে প্রকৃতি দেখতে দেখতে আবার স্মৃতির মধ্যে ডুবিয়ে দিল নিজেকে | চারপাশে সবাই ঘুমিয়ে পড়ায় কুহুর মনে হ'ল শানু-কবিতার গানটি এবারে শোনা যেতে পারে | এবারে চোখ বুজে গানটিতে কন্সেন্ট্রেট করল |

নব্বই দশকের সিনেমায় নায়িকার আগে প্রপোজ করবার ব্যাপারটা এসেছিল | নব্বই দশকই বা বলি কেন, 'কেয়ামত সে কেয়ামত তক' ছবিতেও তো নায়িকাই প্রথম প্রপোজ করেছিল বলা যায় | আগে বাংলা সিনেমাকে বলা হতো সর্বভারতীয় সিনেমার পথপ্রদর্শক | আশি দশকের শেষ থেকে হিন্দী সিনেমা যেন সেই জায়গাটা বাংলা সিনেমার কাছ থেকে কেড়ে নিল |

হিন্দী ফিল্মে যখন জুহি-কাজল-করিশ্মারা রীতিমতো সাহসী হয়ে আগে প্রপোজ করে ফেলছেন, বাংলা সিনেমায় তখন গ্রামের জনগণকে সন্তুষ্ট করবার জন্য আরও লাজুক আরও ঘরোয়া আরও ভীরু নায়িকার চরিত্র সৃষ্টি করা হচ্ছে। কুহুও চেয়েছিল ও একটু সাহসী রোল করবে। সাহসী বলতে খোলামেলা পোশাক পরে সাহসী হওয়া নয়, আচার-ব্যবহারে, কথাবার্তায় সাহসী। 'মেরে দিল কা রাজা' ছবিতেও নায়িকাই আগে প্রপোজ করেছিল। তখনই নায়ক শানুর কণ্ঠে গেয়ে উঠেছিল "আখির তুমনে ইয়ে কেহ দিয়া।" আর নায়িকাও কবিতার কণ্ঠে যোগ্য উত্তর দিয়েছিল। গানটি শেষ হলে কুহুর চোখের কোণে আবার জল এসে গিয়েছিল। দ্বিতীয়বার প্লে টিপে দিল গানটিতে। তারপর সেটি শেষ হলে সাধনা সরগমের সোলো "জিন্দেগী লম্বী, তনহা, অকেলী"-ও একবার শুনে নিল। সত্যি, কত কত স্মৃতি! ছবিটি রিলীজ করুক বা না করুক, গানগুলো একদিন বাজার থেকে হারিয়ে যাক বা না যাক, কুহুর স্মৃতি থেকে সেগুলো কোনোদিন মুছে যাবে না। এগুলো ওর কাছে এক অমূল্য সম্পদ। চেষ্টা করবে যদি গানগুলোকে কোনোভাবে কম্পিউটারে ট্র্যান্সফার করা যায়। তাহলে ক্যাসেট খারাপ হয়ে গেলেও গানগুলো ও যখন খুশী শুনতে পারবে।

পঞ্চম, তথা ফিল্মের শেষ গানটি আপাতত শোনা হ'ল না, ট্রেন এসে দাঁড়াল রায়পুর স্টেশনে। বড় স্টেশন, অনেকক্ষণ দাঁড়াবে এখানে। রাজধানী শহর বলে কথা। কুলি এবং হকারদের চেঁচামেচিতে মিসেস ভিমানী ও বাচ্চাদের ঘুম ভেঙে গেল। এই কাউ বেল্টের ওপর দিয়ে গাড়ী যাবার সময় যা খুশী হতে পারে; যে খুশী, যখন খুশী উঠে পড়তে পারে রিজার্ভড কামরায়। কুহুদের কামরাতেও উঠে পড়ল বেশ কিছু লোক। এমনকি মিসেস ভিমানী উঠে বসায় একটু জায়গা হয়েছিল, সেখানে চড়ে বসল এক নবদম্পতি। সম্ভবতঃ ইউ পি-র। বলল বেশীক্ষণ না, ওরা মোগলসরাইতে নেমে যাবে। মেয়েটির বয়স ২১-২২ আর ছেলেটির ২৪-২৫। এরপর শুরু হ'ল এক অস্বস্তির পর্ব। মেয়েটি এক দৃষ্টে কুহুকে দেখে যেতে লাগল আর মাঝে মাঝে ছেলেটির কানে ফিসফিস করে কী সব বলতে লাগল। শেষমেশ আর না পেরে মেয়েটি জিজ্ঞেসই করে ফেলল, "আপ কুহু হো?" কুহু রীতিমতো অবাক, কী বলবে ভাবছে, তার আগেই মেয়েটি বলল, "ম্যায় আপকী হর সিরিয়াল দেখ চুকি হুঁ! 'প্রতীক্ষা' আপকী পহেলী সিরিয়াল থী। তব ম্যায় ক্লাস নাইন মে থী। উসকে বাদ আপনে কাফি আউর সিরিয়ালোঁ মে অ্যাক্টিং কী থী – 'ইজ্জত, 'প্রতিকার', 'ধীরে সে হাঁসো', 'রাত কী পরী', 'মেরে খোয়াব'...। আউর ভি হ্যায়, ইয়াদ নেহী আ রাহা হ্যায় ইস ওয়াক্ত!" কুহু ঠোঁটে আঙুল রেখে ওকে চুপ করতে বলল। তারপর হেসে বলল, "তুম্হারা সিরিয়াল কা ফান্ডা বহত তাগড়া মালুম হোতা হ্যায়।" এবারে ছেলেটি একটি খাতা বার করে বলল, "দিদি, আপ মেরী বিবি কো এক অটোগ্রাফ দো না!" কুহু ছ'বছর বাদে কাউকে অটোগ্রাফ দিল। শেষবার দিয়েছিল ফিল্মের শেষদিনের শুটিংয়ের দিন – পাবলিককে সেদিন দেখতে দেওয়া হয়েছিল শুটিং। কুহু সেদিন অন্ততঃ ৪০-৪২টা সই বিলিয়েছিল। তারপর আজ।

ছেলেমেয়ে দুটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে কুহু আড়চোখে দেখল মিসেস ভিমানী, ওঁর দিদি, নির্বাণ-দীক্ষা সবাই ওকে অবাক চোখে দেখছে। কুহু ওদের দিকে তাকিয়ে একটুখানি হাসল, কিছু বলল না। ধীরে ধীরে ডিসকাশন থিতিয়ে গেল, ছেলেমেয়ে দুটি নিজেদের মধ্যে গল্পে, হাসিঠাট্টায় ব্যস্ত হয়ে গেল। ভিমানী পরিবারও নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মিসেস ভিমানীর দিদির স্টকে তখনও কিছু খাবার অবশিষ্ট ছিল, সেগুলো উনি সবাইকে বিলিয়ে দিলেন। কুহু আর সেই নবদম্পতিও কিছুটা ভাগ পেল। কিন্তু সেটা খুব বেশী কিছু নয়। তাই সবাইকে রাতের খাবার অর্ডার দিতে হ'ল। ছেলেমেয়ে দুটি অবশ্য অর্ডার দিল না। ওরা রাত ন'টায় মোগলসরাইয়ে নেমে গেল আর মোগলসরাইতেই ডিনার ঢুকল কম্পার্টমেন্টে। আজ কুহু খেয়েদেয়ে আর বেশী দেরী করল না। দশটাতেই উঠে পড়ল নিজের বাংকে। ভিমানী পরিবারের তখনও বিছানা পাতা শেষ হয়নি। মনে যেন আজ এক অদ্ভুত তৃপ্তি, অন্ততঃ কেউ তো ওর কাজ নিয়মিত ফলো করে গেছে! এই তৃপ্তির মধ্যে ডুবে থাকতে থাকতে কুহু ঘুমিয়ে পড়ল।

গতকালের তুলনায় আজ একটু আগে ঘুম ভাঙল কুহুর। সকাল আটটায় ট্রেন ঢুকবে হাওড়ায়। হয়তো সাড়ে আটটা হবে। গাড়ীটা খুব বেশী লেট্ করেনি, বড় জোর আধ ঘন্টা। সবাই যে যার মালপত্র বেঁধে নিচ্ছে। কুহুও বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এসে নিজের মালপত্র গুছিয়ে নিল। ব্যাগটাকে নামিয়ে নিল কোলের ওপর। এখন এক কাপ চা খাবে ও। বাড়ী গেলে মা তো খেতে

দেবেনই।

কলকাতায় পৌঁছে শুরু হবে কুহুর নতুন জীবন। বা বলা যায় জীবনের নতুন চ্যাপ্টার। এরকম সন্ধিক্ষণে উদিত নারায়ণের ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ভয়েস বেশ টনিকের কাজ করে। কুহু ক্যাসেটের শেষ গান চালাল – উদিত নারায়ণ-অলকা ইয়াগনিকের ডুয়েট – "অগর মঞ্জিল করীব হো"। 'কেয়ামত সে কেয়ামত তক'-এর এক স্বপ্নের জুটি ছিলেন আমির-জুহি, অন্য স্বপ্নের জুটি ছিলেন উদিত-অলকা। এখানেও ওঁরা স্বীয় প্রতিভায় দীপ্যমান। উদিত নারায়ণের ভয়েস যেমন মুখে হাসি ফোটানোর জন্য পারফেক্ট, তেমনি অলকার ইমোশনাল রেন্ডিশন যে কোনো গানকেই আলাদা মাত্রা দিয়ে দেয়। এ গানও তার ব্যতিক্রম নয়। গানটি শুনতে শুনতে কুহুর চা কখন শেষ হয়ে গেল ওর নিজেরই খেয়াল নেই।

প্ল্যাটফর্মে সবাই ছিল – বাবা, মা, টিকলু, টিকলি। টিকলু-টিকলি দুজনেই সুদর্শন, সুদর্শনা, বাবা-মা'র গর্বের সম্পদ। কুহুরও মন ভরে গেল ওদের দেখে। তারপর বাবা-মা'র বুকে মুখ রেখে কুহু একপ্রস্থ কাঁদল। টিকলু বলল, "আর নয়! চিয়ার আপ দিদি।" অবশেষে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কুহু স্টেশন থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে গিয়ে উঠল।

এরপর চব্বিশটা বছর কেটে গেছে। সেটা ছিল ২০০০ সালের মার্চ আর এটা ২০২৪-এর মার্চ। এই চব্বিশটা বছর কুহুর নিজের জন্য মোটেও ঠিক ঘটনাবহুল নয় যতটা যুধাজিৎ বা কিন্নরী ওরফে কিরির জন্য। যুধাজিৎ ওর স্বামী এবং কিন্নরী হ'ল কুহু ও যুধাজিৎ-এর একমাত্র সন্তান। কলকাতায় ফেরার পর কুহু প্রথম দু'বছর চেষ্টা করেছিল বাংলা সিরিয়াল করবার, দু-তিনটি সিরিয়ালে বড় রোলও ছিল, এর মধ্যে একটি ছিল সোপ। কিন্তু শিগগিরই কুহু বুঝতে পেরেছিল ক্যামেরার সামনে ওর আর দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না, মুম্বাইয়ের নানান স্মৃতি এসে যায় মনে। সেগুলোকে এখন ও পেছনে ফেলে এসেছে, সেসব আর ও মনে করতে চায় না। তাই সিরিয়াল দুটো শেষ হলে ও সোপটা আর কন্টিনিউ করল না। এরপর ২০০২ সালে যুধাজিৎ-এর সঙ্গে কুহুর বিয়ে। যুধাজিৎ নামী কম্পানিতে সফ্টওয়্যার এঞ্জিনিয়ার। ও বলেছিল কুহু চাইলে সিরিয়াল চালিয়ে যেতে পারে। কুহুর শাশুড়ী সিরিয়ালের খুব ভক্ত। ওঁরও মত ছিল। কিন্তু কুহুই চাইল না। ও গৃহবধূ হয়েই থেকে গেল। বাড়ীর কাজকর্মের পাশাপাশি ও ইন্টারনেটের নানান ফোরামে খুব অ্যাক্টিভ হয়ে উঠল – বিশেষ করে রান্নাবান্নার ফোরামগুলোতে। প্রথমে ইয়াহু গ্রুপ, তারপর গুগল গ্রুপ, এরপর অর্কুট, ফেসবুক। ইদানীং ও ইনস্টাগ্রাম আর টুইটারেও খুব অ্যাক্টিভ। আগে কম্পিউটার ছিল ওর নিত্যসঙ্গী, গত দশ বছর থেকে ফোন সেই জায়গা নিয়ে নিয়েছে। সব জায়গাতে রান্নাই ওর মূল ইন্টারেস্টের কারণ। মাঝেসাঝে বছরে দু'বছরে ও ইউটিউবে নিজের ছবির গানগুলোকে খোঁজে। গানগুলো রয়েছে, কিন্তু সেই পিকচারাইজেশন আর দেখতে পাওয়া যায় না। তার পরিবর্তে অন্য কোনো সিনেমার দৃশ্যকে লাগিয়ে দেওয়া হয়।

এর মধ্যে এই বাইশ বছরে যুধাজিৎ দশটা কম্পানি বদলে একাদশ কম্পানিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছে।

আর কিরি? কুহু ইনস্টাগ্রামে আজ দুপুরে বানানো সেমাইয়ের পায়েসের ছবিটা পোস্ট করে একটা কমেন্ট লিখে বাথরুমে যাবে বলে উঠছিল, এমন সময় বেল বাজল। কুহু দরজা খুললে এসে দাঁড়াল ক্রিকেটারের সাদা পোশাক পরিহিতা কুহুর আদরের ধন একুশ বছরের কিরি। মা'র থেকে অন্ততঃ ইঞ্চি চারেক লম্বা কিরি। মেয়েদের আই পি এল শেষ হয়ে গেলেও কিরির প্র্যাক্টিসের বিরাম নেই। অনেকক্ষণের প্র্যাক্টিসে চোখ-মুখে ঘাম জমে আছে। ছেলেদের ক্রিকেটের মতো উইকেট কিপার সে হতে পারেনি ঠিক, কিন্তু টিটোয়েন্টিতে দলের তিন নম্বর ব্যাটিং পজিশনটি জয় করে নিয়েছে কিন্নরী দত্ত। যেমন চমৎকার ডিফেন্স তেমনি হাতের জোর। স্মৃতি মন্ধনা তো বলেই দিয়েছেন ওঁর বা হরমনপ্রীতের থেকেও জোরে বল মারে এই মেয়েটি। আগে ভারতীয় মেয়েরা ছয় মারতেই পারত না, আর এখন কিরির হাতে ব্যাট মানে ছক্কার ফুলঝুরি। কুহু মেয়েকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখে কপট ভর্ৎসনার সুরে বলে, "যা, ঘেমেনেয়ে একাকার! শিগগিরই ফ্রেশ হয়ে আয়, খেতে দেব।"

আজও অপেক্ষায়

সুজাতা দাস

হঠাৎ অসময়ে কলিংবেলের আওয়াজে উঠে গিয়ে দরজা খুলল বৃন্দা। একজন দাঁড়িয়ে আছে দরজার ঐপারে, কখনও এই মানুষটিকে দেখেছে বলে মনে পড়ল না তার।

- "কিছু চাই?" জিজ্ঞাসা করল।

লোকটি বলল, "ম্যাম আপনার একটা চিঠি আজ ক'দিন ধরে পোস্ট অফিসে পড়ে আছে, তাই দিতে এলাম। আমাদের নতুন পোস্টম্যান ছেলেটি চিনতে পারেনি আপনার বাড়ি, সেইজন্য আমাকে আসতে হ'ল। বিদেশের চিঠি তো, দরকারি হবে ভেবে আমিই নিয়ে এলাম।"

বৃন্দা একটু অবাক হ'ল। "বিদেশের চিঠি!" অস্ফুটে বলল ভদ্রলোককে। তারপর হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে, ভদ্রলোককে বিদায় জানিয়ে, দরজা বন্ধ করল।

চিঠিটা ঘুরিয়ে দেখতে গিয়ে দেখল আমেরিকার একটা ছোট্ট শহর থেকে এসেছে চিঠিটা –

একলব্য! হঠাৎ নামটা মনে আসায় একটু আনমনা হয়ে পড়ল সে। ভাবল, তা কেমন করে হবে, এত বছর পরে...

চিঠিটা না খুলেই ভাবতে বসল –

অনেকগুলো বছর এই স্কুলেই কাটিয়ে দিল বৃন্দা। এত বছরের একটা অভ্যাস কাল থেকে শেষ হয়ে যাবে। ভাবতে গিয়ে চোখে জল এসে গেল গার্লস স্কুলে অঙ্কের টিচার বৃন্দা গায়েনের। অবলম্বন করবার মতো কেউ নেই আজ ওর পাশে। চুলেও পাক ধরেছে। মাস্টার্স ডিগ্রী করার শেষেদিকে মা চলে গেলেন। এখন আর রক্তের সম্পর্কের কেউ নেই। মাঝে মাঝে খুব একা লাগে বৃন্দার। একটা স্পর্শ প্রায়ই তার মনকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। ভাবে, সেদিন যদি একলব্যকে ফিরিয়ে না দিত, আজ হয়তো তাঁকে মা ডাকবার জন্য কেউ থাকত। হয়তো অনেক কিছুই নাও হতে পারত।

এখন আর ছোটবেলার মাটির ঘরটা নেই। মা মারা যাবার পরে সেই যে বাড়ি এল, আর ফেরা হ'ল না। তখন বৃন্দাদের গ্রামে প্রথম মাধ্যমিক স্কুল তৈরি হচ্ছিল। সেখানেই চাকরিও পেয়ে গেল বৃন্দা; সেই থেকে শুরু ছাত্র ছাত্রী গড়ার কাজ। আর কাল সেই শিক্ষকতার কাজের জীবনে ইতি টানতে চলেছে সে। তবে নতুন টিচার না আশা পর্যন্ত তাঁকে ক্লাস নিতে হবে সেকথা হেড টিচার, অলকাদি জানিয়ে রেখেছেন।

আজ আর কিছু ভাল লাগছে না বৃন্দার, চিঠিটাও খুলতে ইচ্ছে করছিল না। পুরনো কথাগুলো ফিরে ফিরে আসছে মনে।

চাকরি পাওয়ার পরে মাটির বাড়ির জায়গায় খুব ছোট্ট অথচ সুন্দর একটা দোতলা বাড়ি তৈরি করেছে বৃন্দা। দোতলায় লাইব্রেরি আর স্টাডিরুম, একতলাতে শোবার ঘর, রান্নাঘর, ডাইনিংরুম আর ড্রইংরুম। কেউ এসব দেখতে পেলেন না। শুধু রামুর মা আছে বলে নিঃসঙ্গ বোধটা কম লাগে তার। চাকরি পাওয়ার পর সেই যে রামুর মা এল তার কাছে, আজও সে রয়ে গেছে। বৃন্দা রামুকে ছোট থেকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। এখন কলকাতার একটা কলেজে পড়ে সে, নাম তার রামকিঙ্কর বাউড়ি।

হঠাৎ চিঠিটা আবার হাতে নিল বৃন্দা, খুলল চিঠিটা। চিঠিটা খুলে অবাক হ'ল নামটা দেখে, একলব্যের লেখা চিঠি!

হঠাৎ মনটা অনেক পেছনে চলে গেল।

- "একটা ছোট্ট প্রশ্ন ছিল।"
- "কিন্তু আমি আপনাকে চিনি না!"
- "আমি আপনাকে চিনি, আপনি বৃন্দা, মানে বৃন্দা গায়েন। বাঁশপোতা গ্রামে বাড়ি, কলকাতায় পড়তে আসা।"
- "আমার সব খবর নিয়ে ফেলেছেন দেখছি – " বলল বৃন্দা।
- "কী করি, হঠাৎ করেই খবর নিতে ইচ্ছে হ'ল।"
- "কিন্তু আমার এতটুকু খবর দেবার ইচ্ছে নেই, বুঝলেন তো?"
- "তবুও শুনে যান। আমি একলব্য, মানে একলব্য ব্যানার্জি। এবার লাস্ট ইয়ার এই কলেজে, ম্যাথে অনার্স – এই আমার ফোন নম্বর, যদি কখনও মনে হয় ফোন করবেন।"

ফোন নম্বরটা ব্যাগে রেখে হনহন করে হাঁটতে লাগল বৃন্দা। মনে মনে ভাবল বড্ড গায়েপড়া তো ছেলেটি! একটু দূরে থাকতে হবে।

ক্লাস করতে করতে সে ভুলে গেল সকালের কথা। রাতে হস্টেলে ফিরে ফ্রেশ হয়ে যখন বিছানায় গা এলাতে গেল হঠাৎ সকালের কথাগুলো মনে পড়ে গেল বৃন্দার। নিজের মনেই হেসে উঠল সে, 'পাগল একটা' ভাবল মনে মনে। তার কী সাজে এসব? জিজ্ঞাসা করল নিজের মনকেই। শহরে পড়তে

আসার মতো ক্ষমতা কি তার বাবা মায়ের আছে! শুধু স্কলারশিপের টাকাটা আছে বলে এই হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। চারটে টিউশনি করে সে নিজের খরচ চালায়। সেখান থেকেও প্রতি মাসে একটু করে টাকা তুলে রাখে, যাতে তার লেখাপড়া চালিয়ে যেতে কখনও অসুবিধা না হয়। এইসব বুঝবে কীভাবে শহরে বেড়ে ওঠা বড়লোকের ছেলেটি! তাকে অনেক কিছুই মানায় না, এটা সে ভাল করেই জানে। এইসব ভাবতে ভাবতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল বৃন্দা; রুমমেট সর্বাণীর ডাকে উঠে বসল।

- "অসময়ে ঘুমোচ্ছিস যে? শরীর খারাপ নাকি?" বলল সর্বাণী, "এরপর গেলে খাবার পাবি না। শিগগির যা ক্যান্টিনে।"

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল বৃন্দা, খাবার মিস্ করলে চলবে না। সারাদিনে দুবার খাওয়া – সকাল ন'টায় আর রাত্রি দশটায়, এর মাঝে আর কোনও খাওয়া নেই। কোনও কারণে দেরি হলে সেদিন জল ছাড়া আর কিছুই পেটে পড়ে না, তাই ছুটল খাওয়ার ঘরে। দেখল রঘুকাকা তার ভাত বেড়ে রেখে নিজে খেতে বসে গেছে। খেতে বসে বুঝল বড্ড খিদে পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে ফিরে এসে সর্বাণীকে জড়িয়ে ধরল বৃন্দা।

বলল, "তুই না ডাকলে আজ না খেয়ে থাকতে হতো রে, সুবু।"

বাঁশপোতা নামে একটা ছোট্ট গ্রামে খুব গরিব এক পরিবারে জন্মেছে বৃন্দা। টুকটুকে গায়ের রঙ দেখে ঠাকুরমা নাম দিলেন 'বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই'। বাবা রাজমিস্ত্রি; মা একটা মহিলা চালিত সংস্থায় বড়ি, আচার, পাঁপড় ইত্যাদি তৈরির কাজ করে। নুন আনতে পান্তা ফুরানো সংসারে কীভাবে যে এমন একটা মিষ্টি মেয়ে জন্মালো এটাই আশ্চর্যের।

এর মধ্যেই বড় হতে থাকল বৃন্দা। স্কুলেও ভর্তি করে দিলেন বৃন্দার মা, আশালতা কারণ মেয়েকে অশিক্ষিত রাখতে চান না তিনি। যেখানে কাজ করে আশালতা, সেখান থেকেই স্কুলের খোঁজ খবর নিয়ে এসেছিলেন।

আস্তে আস্তে চার ক্লাস পাস করে ফেলল বৃন্দা।

স্কুলের দিদিমণির সহযোগিতায় শহরে এসে বৃত্তি পরীক্ষা দিল। লেখাপড়ায় ভালই ছিল সে, পেয়ে গেল বৃত্তি।

মেয়েকে লেখাপড়ার দিকেই নিয়ে চললেন আশালতা। নিজে জীবনে যা করতে পারেননি, তার সবটা আশালতা পূরণ করবেন মেয়েকে দিয়ে।

নিজে সামান্য লেখাপড়া জেনেও কঠোর পরিশ্রম করে আজ বৃন্দাকে এখানে এনে দাঁড় করিয়েছেন আশালতা।

বৃন্দা লেখাপড়ায় তুখোড় ছিল, স্কুলের মাস্টারমশাই দিদিমণিরা সব সময় তাই সাহায্য করেছেন বৃন্দাকে। সেও তাঁদের কথামতোই চলেছে; তারই ফলস্বরূপ আজ বৃন্দা এই জায়গায়।

মাধ্যমিক পরীক্ষার পর ঠাকুমা হঠাৎ চলে গেলেন না ফেরার দেশে, দু'বছর হ'ল বাবাও ছেড়ে গেছেন তাদের।

মা এখনও একইভাবে কাজ করে চলেছেন ললিতাপিসির কারখানায়, ওখানে থাকে বলে কিছুটা নিশ্চিন্ত বৃন্দা।

মা আসেন দেখা করতে মাঝে মধ্যে, এটা ওটা বানিয়েও নিয়ে আসেন বৃন্দার জন্য। তখন কয়েকদিন দুই বন্ধু মিলে খায় সেইসব খাবার, সেই খাবার ফুরোলে আবার যে কে সেই!

এরই মধ্যে পরীক্ষা শুরু হ'ল; মনপ্রাণ দিয়ে লেখাপড়া শুরু করল বৃন্দা যাতে রেজাল্ট ভাল হয়। মন থেকে কখন যেন উধাও হয়ে গেল একলব্যের কথা। রেজাল্ট বেরোনোর দিনে একটা কোণ দেখে বসেছিল বৃন্দা।

হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল একলব্য। হাত বাড়িয়ে বলল, "অভিনন্দন বৃন্দা গায়েনকে।"

বৃন্দা বিস্ফারিত চোখে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, "কীসের জন্য?"

- "ফার্স্ট ইয়ার টপারের জন্য শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন রইল।"

হঠাৎ কিছু না বলে ছুটে গেল সে রেজাল্ট দেখার উদ্দেশ্যে। যখন নিজের নামটা খুঁজে পেল, একটু নিশ্চিন্ত হওয়ার সাথে সাথে মনে পড়ল একলব্যের কথা। দৌড়ে ফিরে এল আবার আগের জায়গায় কিন্তু ততক্ষণে চলে গেছে সে।

তারপর আর একদিন দেখা হয়েছিল একলব্যের সাথে। বৃন্দা নিজের অধিকারের সীমা জানত, তাই আর না এগিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল সে একলব্যকে।

তারপর কত বছর পেরিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে কোনও নির্জন সন্ধ্যায় হঠাৎ একলব্যকে মনে পড়েছে বৃন্দার; অনেক খুঁজেছে সে তাকে; কিন্তু খুঁজে পায়নি। তারপর একদিন ফোন করেছিল, কিন্তু ততদিনে সে আমেরিকার বাসিন্দা।

আজ হঠাৎ বিদেশ থেকে আসা চিঠি দেখে অবাক হ'ল বৃন্দা। স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে আলমারিতে তুলে রাখল চিঠিটা। তারপর তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ল স্কুলের উদ্দেশ্যে।

স্কুলে এসে বারে বারে আনমনা হয়ে পড়তে লাগল সে।
হঠাৎ সমিতা বলল, "বৃন্দাদি, তোমার কী শরীর খারাপ লাগছে?"
- "না, এমনিই। বয়স হচ্ছে তো!"
স্কুল ছুটির পরে তাড়াতাড়ি ফিরে এল বাড়িতে। স্নান সেরে চিঠিটা নিয়ে বসল। তাতে লেখা আছে মাত্র কয়েকটি শব্দ – 'এবার এসো, আজও অপেক্ষায় আছি। একলব্য।'
হঠাৎ অঝোরে কেঁদে উঠল বৃন্দা, চিঠিটা হাতে নিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ।

সব কাজ মিটে গেল। বিদায়ী অনুষ্ঠানে সকলেই কাঁদল কারণ তাদের অনেক ভাল-মন্দের সাক্ষী বৃন্দা। স্কুলে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এল আজ অনেক বছর পরে।
সেই কলেজের ঐ কোণটা, যেখানে বৃন্দা বসেছিল একদিন, আজ আবার এত বছর পরে সেইখানেই এসে বসল সে।
অনেক বছর, তবুও কিছুই পাল্টায়নি আজও, হঠাৎই একটা বাড়ানো হাতের দিকে তাকিয়ে অবাক হ'ল বৃন্দা। চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। একটা বছর পঁচিশের ছেলে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে অবাক হয়ে।
- "আমি আপনাকে নিতে এসেছি। উনি আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে নিয়ে যেতে।" বলল ছেলেটি।
দুই ভুরুর মাঝে ভাঁজ পড়ল বৃন্দার। তাই দেখে ছেলেটি বলল, "উনি বাইরে অপেক্ষা করছেন আপনার জন্য।"
উঠে দাঁড়িয়ে সাত'পাঁচ ভাবতে ভাবতে বৃন্দা হাঁটতে লাগল। ছেলেটি কেন? সে কেন নয়!
হঠাৎ চমকে উঠল বৃন্দা একটা চেনা কণ্ঠস্বর শুনে, "আজও তোমার অপেক্ষায় বসে আছি, বৃন্দা। তুমি কি পারবে আমাকে তোমার সঙ্গী করে নিতে?"
হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিল বৃন্দা একলব্যের দিকে। চোখে জল এলেও আজ কিন্তু হাসিটা লেগে রইল বৃন্দার মুখে।

চোর এবং দরজার আঙ্গিকে দুর্নীতি

ভজেন্দ্র বর্মন

মানুষ চোর এবং দরজার মধ্যে কোনটিকে প্রথম দেখেছে? যতটুকু জানি এ ব্যাপারে কোনরূপ গবেষণা হয়নি। তবে মনে করা হয়, বর্তমানে একটি অন্যটির সাথে যুক্ত। তাই নিরাপত্তার খাতিরে অনেকে চোর-ডাকাতদের থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বাড়ি-ঘর মজবুতভাবে বানানোর সাথে আধুনিক দরজা-জানালা এবং বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন।

অনেককাল আগে বাংলাদেশের এক গ্রামে যখন আমি বড় হচ্ছিলাম, রাত ছাড়া আমাদের ঘরগুলোর দরজা সব সময় খোলা থাকত। দিনেরবেলা কুকুর, বিড়াল আসার সম্ভাবনা থাকার জন্য রান্নাঘরটা ছিটকিনি দিয়ে আটকানো থাকত। শুধু বাড়িতে কেউ না থাকলে অন্যান্য ঘরগুলোও এভাবেই বন্ধ রাখা হতো। তালাচাবির কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এরকম অবস্থাতেও কোনদিন কিছু চুরি গেছে বলে আমরা শুনিনি। সেজন্য চোর যে বাড়িতে এসে চুরি করে, এটা বোঝার সুযোগ হয়নি। একটা কারণ মনে হয়, গ্রামের বেশীরভাগ মানুষ ছিলেন অশিক্ষিত ও গরীব কিন্তু তাঁদের নীতি ও মান-অপমান বোধ এবং চারিত্রিক গুণ ছিল অনেক উচ্চে। চুরি এবং ঠগ-বাটপারি তাঁদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে হয়তো ছিল না।

ঐ সময় গ্রামে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল খুব কম। তাঁরা সর্বদা উচ্চমান নিয়ে চলাফেরা করতেন। তাঁরা চাকুরিতে বেতন কম পাওয়া সত্ত্বেও অনৈতিকভাবে অর্থ উপার্জন করার কাজে লিপ্ত হতেন না। কম বেতনটা মানুষের থেকে প্রাপ্ত সম্মান ও মর্যাদা পেয়ে পুষিয়ে নিতেন। উদাহরণস্বরূপ আমাদের ঐ অঞ্চলের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কথা বলা যায়। তাঁরা দূর থেকে সাইকেলে বা হেঁটে আমাদের পড়াতে আসতেন। কেউ বা নিজের পরিবার দূরে নিজের বাড়িতে রেখে স্থানীয় কারো বাড়ির কাছারী বা বাইরের ঘরে বাস করে শিক্ষকতা করতেন। তাঁরা যখন রাস্তায় হাঁটতেন সবাই তাঁদের সম্মান দেখাত। গরীব গ্রামবাসীর সন্তানদের জন্য গরীব শিক্ষকরা যা করেছেন তার তুলনা হয় না। আদর্শ মানুষ হতে আমাদের কোথাও যেতে, কাউকে দেখতে, অতিরিক্ত কিছু পড়তে বা জানতে হতো না। এমন শিক্ষা অর্জনের পর

অনেকের পক্ষে চোর হওয়া বা দুর্নীতিপরায়ণ হওয়া সম্ভবপর হয়নি। আমাদের সমসাময়িক যারা ছিল, তাই হয়তো দরজা খোলা থাকলেও চুরি করেনি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তাদের মধ্যে কেহ কেহ কর্ম জীবনে যা করেছে তা এর থেকে ভিন্ন রকমও হতে পারে।

এখন বাংলাদেশের গ্রামে অবস্থাপন্ন লোকের সংখ্যা কম নয়। তাঁদের বাড়িতে উঁচু দেয়ালসহ লোহার শক্ত সদর দরজা রয়েছে; ভিতরের ঘরগুলো ইঁট-সিমেন্ট দিয়ে তৈরী। ঘরের জানালাতে লোহার গ্রিল রয়েছে। রাতে সে জানালাগুলো বন্ধ রাখা হয়। প্রতি ঘরের ভিতরে ও বাইরে বন্ধ করার এবং তালা লাগানোর ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রামের মানুষের নিরাপত্তার জন্য এত পরিবর্তন অবাক করে দেয়, কারণ ষাট-সত্তর বছর আগে এসব কিছুই ছিল না। এমনটি যে হবে তা ভাবতেও পারিনি।

শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এর চেয়ে আরো ব্যাপক। সামনে সদর দরজা, দালান বাড়ি, চারিদিকে দেয়াল, গ্রিলসহ জানালা তো আছেই। এছাড়া দারোয়ান, বাড়িতে ঢোকার সময় লোহার সদর দরজা ও তালাচাবি থাকা সত্ত্বেও আবার প্রতি ফ্ল্যাটে ঢোকার জন্য তালাচাবি এবং কলিংবেল রাখা হয়। যাঁদের সামর্থ্য আছে, তাঁদের ভিডিও ক্যামেরাও থাকে। তা দ্বারা কে আসে, কে যায়, তাঁরা দেখতে পান।

কীসের জন্য মানুষের এত ভয়? সবকিছু কি করা হয়েছে চোর-ডাকাতের ভয়ে? সব দেখে মনে হয় মানুষ বদলে গেছে এবং চোর-ডাকাতের সংখ্যা বেড়েছে। অতীতের মতো একে অপরের উপর ভরসা রাখতে পারে না।

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ভাল এবং মন্দ দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কোনটার বেশী বৃদ্ধি তা বিতর্কের ব্যাপার। অর্থনৈতিক উন্নতি এবং রাস্তাঘাটের বেশ উন্নয়ন হয়েছে। মানুষের লোভ এবং ধনবান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রচন্ডভাবে বেড়েছে। শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু নীতিবোধের অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। এমনটি যে হবে তা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে (১৯৭১-এর ডিসেম্বরে) আশঙ্কা করতে পেরেছিলাম। উদাহরণ হ'ল, স্বাধীন দেশে অনিয়ম এবং দুর্নীতির দরজা খোলা পাওয়ায় মুক্তিযোদ্ধা এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সুযোগের অপব্যবহার করা শুরু করেছিলেন। প্রকাশ্যে তাঁরা অবাঙালিদের জমি, দোকান এবং বাড়ি দখল করছিলেন। স্বাধীনতা লাভ করার পর অসমাপ্ত পাঠ শেষ করতে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গিয়েছিলাম বলে আর কী কী তাঁরা করেছেন তা চাক্ষুষ দেখার সুযোগ হয়নি। তবে বুঝতে পেরেছি, অনেকেই রাতারাতি ধনশালী হয়েছেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে বিষয়টি আমার কাছে ভীষণ বেদনাদায়ক ছিল।

দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ হলে, প্রবাসে আসার আগে সেখানে বেশ কিছুদিন শিক্ষকতা করি। প্রথমে প্রভাষক এবং পরে সহকারী অধ্যাপক ছিলাম। বেতন খুব কম ছিল বলে হিসাব করে দিনকাল কাটাতে হয়েছিল। পক্ষান্তরে, একসাথে পাস করা কিছু বন্ধুদের দেখেছি তারা অর্থনৈতিকভাবে বেশ উন্নতি করে যাচ্ছিল। তাদের বেতন যে বেশী ছিল তা নয়, কিন্তু তাদের 'উপরি' অর্জন ছিল, তা তাদের মুখেই শুনেছি। দুর্নীতির দরজা যারা খোলা পেয়েছে, মনে হয় তারা অনেকেই সেসব সুযোগ এড়াতে পারেনি।

প্রবাস থেকে মাঝে মাঝে দেশে গিয়েছি। ইদানীং গিয়ে দেখেছি যেসব ক্ষেত্রে অবনতি হচ্ছিল সেগুলোর অবস্থা এখন আরো খারাপ। মানুষের আয় এখন বেড়েছে, কিন্তু জিনিসপত্রের মূল্য সে তুলনায় অনেক গুণ বেড়েছে। তাতে অনেক মানুষ সততা নিয়ে দিনযাপন করলে আগে যেমন হতো, তেমনই হিমশিম খাচ্ছেন। দুর্নীতি অসম্ভব রকম বেড়েছে। এমন উদাহরণ পাওয়া যায় যে কেউ সারা জীবন'ভর মাত্র এক কোটি টাকা উপার্জন করে হাজার কোটি টাকা সম্পদের মালিক হয়েছেন। এসব দেখেশুনে মনে হয় সকল দরজা খোলা পেয়ে অনেক মানুষ দুর্নীতিকে বেছে নিয়েছেন ও নিচ্ছেন।

চোর ও দরজার আঙ্গিকে আমাদের সমাজের নৈতিক অবক্ষয় ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দুর্নীতির দরজা খোলা থাকলে অনেক ধরনের চোরের দেখা পাওয়া যেতে পারে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল।

চোরের ধরন ও উদাহরণ:

অর্থ-চোর	ঘুষ গ্রহীতা, চাঁদাবাজ, পকেটমার
শিক্ষা-চোর	ভুয়া সনদদাতা, প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী
নীতি-চোর	যিনি নিয়ম এড়িয়ে চলেন
অফিস-চোর	লাভ ছাড়া যিনি কাজ করেন না
ভূমি-চোর	ভূমি দস্যু

আইন-চোর	যিনি অপরাধীকে রেহাই দেন
সঙ্কট-চোর	সিন্ডিকেট; মজুতদার
ব্যাঙ্ক-চোর	যিনি ব্যাঙ্ক তহবিল তছরুপ করেন
অপহরণ-চোর	যিনি অপহরণ করে অর্থ চান

কর্মক্ষেত্রে যত জটিলতা থাকে দুর্নীতি করার সুযোগ ততটাই বাড়ে। এখন প্রায় সব কর্মক্ষেত্রে লিখিত এবং অলিখিত আইন ও নিয়মের মাধ্যমে জটিলতা বাড়ানো হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আমি আগে বলেছিলাম যে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে। ১৯৭২ সনের মে মাসে আঞ্চলিক সেক্টর কমান্ডারের অফিস থেকে জেনারেল ওসমানী এবং সেক্টর কমান্ডার স্বাক্ষরিত মুক্তিযোদ্ধার সনদপত্র আমরা পেয়েছিলাম। সনদপত্রগুলো আঞ্চলিক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আমাদের দিয়েছেন। তখন সেক্টর কমান্ডারের অফিসে মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা ছিল, তা দেখে সনদপত্র দেওয়া হয়েছিল। আমাদের কোনরূপ অফিস-আদালত বা তদবির করতে হয়নি। কোন হয়রানির শিকার হতে হয়নি।

বাংলাদেশ সরকার কিছুদিন হ'ল আগের সনদপত্রটিকে মূল্যহীন করে নতুনভাবে নিবন্ধন করা এবং সনদপত্র দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা যখন শুরু হয়, বিদেশে অবস্থান হেতু আমি সময়মতো জানতে পারিনি। এখন যতটুকু জানি, তা হ'ল মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে হবে। তারপর জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল সনদপত্র দানের আগে এ আবেদন পত্রটি যাচাই-বাছাই করতে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা প্রশাসকের কাছে সুপারিশের জন্য পাঠাবে। এখানে কমপক্ষে চারটি বড় অফিসে আবেদনপত্রটি থামবে। তদুপরি প্রতি অফিসে আভ্যন্তরীণ নিয়মগুলো সম্পন্ন করতে কিছু ধাপ তো আছে। যাঁরা বিদেশে অবস্থান করেন, তাঁদের আবেদনপত্র অতিরিক্ত আরো দুটি মাধ্যম দিয়ে যাবে। প্রথমে বাংলাদেশ দূতাবাসের কাছে আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। তাঁরা তখন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠাবেন। তারপর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ে পাঠাবেন। এখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর নিয়ম হ'ল, কাগজে ছাপানো আবেদনপত্র ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে পাঠাতে হবে। যতটুকু জানতে পেরেছি, দূতাবাস ই-মেইলে পাঠালে আবেদন পত্র গ্রহণযোগ্য হয় না। তখন কী করতে হবে তা সুস্পষ্ট নয়। বিদেশে অবস্থানরতদের নতুন মুক্তিযোদ্ধা নিবন্ধন এবং সনদপত্র পেতে আবেদনপত্র অন্তত ছয়টি অফিসে থামবে। যদি দেশে দুর্নীতির দরজা খোলা থাকে, তাহলে বিদেশ থেকে এসব স্থানে ঝামেলা সামলানো খুব কঠিন ব্যাপার। লোকমুখে শুনেছি এবং সামাজিক মেডিয়ার মাধ্যমে জানা যায় যে ব্যাপারটা ভীষণ ঝামেলাপূর্ণ এবং খুবই ব্যয়বহুল। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর যাঁরা এ ব্যাপারটি দেখছেন এবং যাঁরা সুপারিশ করছেন, তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের কী মনে করেন জানি না। তাঁরা যদি সেক্টর কমান্ডার বা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের মতো সহানুভূতিশীল বা শ্রদ্ধাশীল না হন, মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের থেকে হয়তো সুবিচার পান না। এক্ষেত্রে মৃত্যুকে ভয় না করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ ও অবদানকে উৎকোচ দিয়ে কলুষিত না করলে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে নিবন্ধন এবং নতুন সনদপত্র পাওয়া সম্ভবপর নাও হতে পারে। শোনা যায় তাই হচ্ছে।

এখন মানুষের যে কোন উপায়ে ধনবান হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। সামাজিক মেডিয়ায় প্রচারিত আখ্যান অনুযায়ী উপরোল্লিখিত চোরেরা ভীষণভাবে তৎপর। মনে হয়, এখন তালাচাবি তো দূরের কথা দরজার ছিটকিনি পর্যন্ত রাখা হয় না! সদর দরজা নেই বা থাকলেও সবসময় খোলা থাকে বলা যেতে পারে। চোরেরা এভাবে উৎসাহ পেতে থাকলে ভবিষ্যতে তাদের অপকর্ম আরো বাড়বে।

পোষা বোনু

সুজয় দত্ত

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছি আমি | উদগ্রীব অপেক্ষায় | মাঝে মাঝে ঘাড় উঁচু করে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করছি | কিন্তু যাকে খুঁজছি সে এখনো নজরে আসছে না | কলকাতা এয়ারপোর্টের এই ডোমেস্টিক অ্যারাইভালে দিনের বিশেষ বিশেষ কিছু সময়ে ভীড়টা একটু বেশী হয়, যখন বিভিন্ন শহর থেকে পরপর অনেকগুলো ফ্লাইট এসে পড়ে | হায়দ্রাবাদেরটা নেমেছে বেশ খানিকক্ষণ আগে | কে জানে, হয়তো কনভেয়ার বেল্টে মালপত্র আসতে দেরী হচ্ছে | যাকগে, আজ একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্তি যে দেরী হলেও বারবার পকেটের মোবাইল ফোনে "কী হ'ল স্যার?", "কী হ'ল স্যার?" বলে টেক্সট মেসেজ আসবে না | সাধারণতঃ আমি এখানে কাউকে রিসিভ করতে এলে আমাদের পাড়ার গাড়ী সারাইয়ের গ্যারেজটা থেকে ছোটুলাল বলে একজন চেনা ড্রাইভারের গাড়ীটা ঘন্টাপিছু ভাড়ায় নিয়ে আসি | তার সবসময়েই এমন ঘোড়ায় জিন দেওয়া থাকে যে আমার সামান্য একটু দেরী হলেই পার্কিং এরিয়ায় গাড়ীতে বসে আমাকে মেসেজের পর মেসেজ করে যায় | মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে দিই এক ধমক | আজ ওসবের বালাই নেই | প্রাইভেট গাড়ীতে এসেছি আরেকজনের সঙ্গে | সেও একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে, উঁকিঝুঁকি মারছে ভেতরে | শেষে দেখলাম অধৈর্য্য হয়ে এয়ারপোর্টের কোনো চেনাজানা কর্মীকে ফোনই করে ফেলল ফ্লাইটের খবর নিতে |

চাকরি জীবনে আমি এয়ারপোর্টে বেশ কয়েকবার এসেছি দিল্লীতে আমাদের কম্পানির হেডকোয়ার্টার থেকে আসা বড় বড় অফিসারদের তুলতে | এখন, এই অবসর জীবনেও মাঝেমধ্যে আসতে হয় শুধু একজনের জন্য | তার নিজের অবশ্য ঘোর আপত্তি এ-ব্যাপারে | সে যখন হায়দ্রাবাদ থেকে ছুটিতে কলকাতায় আসে, পই পই করে ফোনে বলে দেয় "না বাপি, একদম না | আজীবন এই কচিখুকিগিরি ভাল লাগে না আমার | এয়ারপোর্ট থেকে একটা প্রিপেড ট্যাক্সি ধরে বাড়ীটুকু যেতে পারব না আমি?" আমি তখন ওর মাকে ফোনটা ধরিয়ে দিয়ে বলি, "ঠিক আছে, আমার ওপরওয়ালাকে রাজী করা | তিনি যা বলবেন... |" এবং তিনি প্রতিবারই নস্যাৎ করে দেন মেয়েকে, "চুপ কর তো! ওসব ওস্তাদি অন্য জায়গায় মারিস! নিজে মা হলে বুঝবি সন্তানকে বছরে এক-দুবারের বেশী দেখতে না পেলে কেমন লাগে |" এই গল্পই চলে আসছে বছরকয়েক ধরে, আমাদের একমাত্র মেয়ের হায়দ্রাবাদে বিয়ে হওয়া-ইস্তক | আমাদের জামাই অবশ্য বাঙালিই | উত্তর কলকাতার ছেলে | এখন বাবা-মাকে নিয়ে হায়দ্রাবাদের বাসিন্দা | টেকনোলোজির দুনিয়ায় স্বচ্ছন্দ বিচরণ তার | ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময়ই আলাপ ওদের দুজনের | বিয়ে হয়েছে বছর আড়াই আগে | মেয়েও এখন হায়দ্রাবাদের একটা বায়োটেক কম্পানিতে চাকরি করে | কিন্তু সম্প্রতি ছুটিতে ছিল কয়েকমাস | এবং তার এই ছুটিতে থাকার কারণটাই এবারের কলকাতা ট্রিপের বিশেষ আকর্ষণ | অন্ততঃ এই দুই বুড়োবুড়ির কাছে | আমাদের যে বিরাট প্রমোশন হয়েছে! দাদুত্বে আর দিদুত্বে! গতবছর পুজোয় মাত্র ক'দিনের জন্য কলকাতায় এসে মেয়ে যখন এই আসন্ন সুখবরটা জানিয়ে আমাদের চমকে দিয়েছিল, আমার তো উত্তেজনায় রাতে ঘুম আসতে চায় না | ওর মা চিরকালই একটু চাপা, কোনকিছুতেই কোনো উচ্ছ্বাস নেই | আমার অবস্থা দেখে মুখ টিপে হেসে বলল, "তিরিশ বছর আগেও তুমি ঠিক এরকমই করেছিলে |" এরপর বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে আশা-আশংকার দোলায় দুলে | যত দিন এগিয়ে এসেছে, আমার অস্থিরতা বেড়েছে | আর মুখে কিছু না বললেও ভেতরে ভেতরে মায়ের প্রাণ যে ছটফট করছে এইসময় মেয়ের পাশে থাকতে না পারার জন্য – তা তো বুঝতেই পারতাম | বিশেষতঃ শেষের দিকটায় মেয়ে নিজে বলেছে মাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য, কিন্তু মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় যেতে পারেনি, তাই আরও বেশী মনোকষ্টে ভুগেছে | যাইহোক, তিনমাস আগে এক বৃষ্টিভেজা সকালে সব প্রতীক্ষা, সব উদ্বেগের অবসান ঘটিয়ে যখন ন'শো মাইল দূর থেকে ফোনে সুসংবাদটা এল, নিজেকে আর সামলাতে পারিনি | এমন চীৎকার করে "দিদা, ও দিদা, কী করছ কী? এক্ষুণি এসো" বলে ডেকেছিলাম যে রান্নাঘরে ফ্যান গালতে গিয়ে ভাতের হাঁড়ি উল্টে পড়েছিল ওর হাত থেকে | দিদা অবশ্য সদ্যোজাত নাতনির ছবি দেখে স্বভাবসিদ্ধ নির্বিকার ভঙ্গীতে শুধু বলল, "রবিঠাকুরের জন্মদিনে হয়েছে তো, এ মেয়ে যে-সে মেয়ে হবে না |" তারপর এই তিনমাস ধরে নাতনির অজস্র ছবি আর ভিডিও পাঠিয়েছে ওর বাবা-মা | ওর

আধো আধো মিঠে বুলিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমরা | কিন্তু ফোনে দেখা আর সামনাসামনি দেখা কি এক? আজ, এতদিন বাদে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ আসতে চলেছে | এখন আর দেরী সয়? অতএব অ্যারাইভালের দরজা দিয়ে যখন একটা গোলাপি জামাপরা ফুটফুটে ডলপুতুল কোলে অনমিত্রকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম, বুকের ভেতর হৃৎপিন্ডটা লাফিয়ে উঠল আমার | তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে ওদের এদিকে ডেকে যেই "এই তো আমার দিদিভাই, এসো এসো এসো" বলে আদর করতে গেলাম, মেয়ে অচেনা লোক দেখে কাঁদো কাঁদো হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল | ইতিমধ্যে আমার আরেকজন সঙ্গী, যে ওদের নিতে এসেছে এয়ারপোর্টে, সেও কাছে এসে হাসিমুখে দাঁড়িয়েছে তার ছেলের হাত ধরে | এমন সময় আগুনরঙা সালোয়ার-কামিজ গায়ে লাগেজের ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে ঋতু এনক্লোজারের বাইরে এসেই "বাপি-ই-ই, ইস, কী রোগা হয়ে গেছ তুমি!" বলে জড়িয়ে ধরল আমায় | আমি সস্নেহে বললাম, "উঁহু, উঁহু, ওসব কথা পরে | আগে দ্যাখ তোর জন্য কী সারপ্রাইজ এনেছি আজ |"

- "সারপ্রাইজ!"

- "হ্যাঁ, এই তো" বলে পাশে দাঁড়ানো মেয়েটিকে দেখিয়ে দিই আমি | ঋতু থতমত খেয়ে তাকিয়ে থাকে | ওকে চুপ করে থাকতে দেখে মেয়েটি এবার বলে ওঠে, "আমায় একেবারেই চিনতে পারছ না, তাই তো?"

- "হ্যাঁ, না, মানে আপনাকে ঠিক –"

- "হায় রে, তুমি আমায় 'আপনি' বলছ? মেসোমশাই, তাহলে এবার পরিচয়টা দিয়েই ফেলি, কী বলেন?"

আমি মিটিমিটি হেসে বলি, "অগত্যা"|

- "আমি মিতু গো | এখনো কি আমায় –"

আমি আড়চোখে দেখছি ঋতুর মুখের রং বদলে যাচ্ছে | বিস্ময়ের ফ্যাকাশে থেকে অপ্রস্তুতের গোলাপি, তারপর আবেগ-রক্তিম হয়ে উঠল ওর গাল-কপাল-চিবুক | একবার অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চাইল আমার দিকে, আমি নিঃশব্দে মাথা নেড়ে বললাম "হ্যাঁ"| তারপর ট্রলি-ফলি ছেড়ে কাঁধের ব্যাগপত্তর ফুটপাথে নামিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে "মিতু-উ-উ" বলে জড়িয়ে ধরল সেই মেয়েটিকে | আর সেই মেয়েটিও তার ছেলের হাত ছেড়ে ওকে | আশপাশের লোকেদের কৌতূহলী দৃষ্টি ওদের ওপর | অনমিত্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে আমি ফিসফিস করে বললাম, "তোমার এক শালী |"

- "ওহ | আই সী | আগে আলাপ হয়েছিল কি?"

- "না, হয়নি |"

- "কাজিন? পেটার্নাল না মেটার্নাল?"

- "উঁহু | কোনোটাই না | স্রেফ ইন্টার্নাল আর ইমোশনাল।"

- "সরি, আমি ঠিক –"

- "পরে বলব | হোল্ড ইয়োর সাসপেন্স |" চোখ টিপে বলি | ওদিকে ঋতু-মিতু দুজনেই সেই একইভাবে জড়িয়ে ধরে আছে, দুজনের চোখ দিয়েই গড়িয়ে পড়ছে জলের ধারা | এমন সময় মিতুর বাচ্চা ছেলেটা ভয় পেয়ে কয়েকবার "মা! মা!" করে ওঠায় ঋতুর নজর গিয়ে পড়ে ওর ওপর | ছোঁ মেরে ওকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে জিজ্ঞেস করে, "কী নাম রেখেছিস রে ওর?"

- "ঋক"

- "বাঃ, খুব মিষ্টি | এই দ্যাখ, ঋক, এই দ্যাখ, তোর কেমন একটা ছোট্ট বোনু | খেলবি ওর সঙ্গে?" বলে ওকে সটান স্বামীর কোলে থাকা নিজের মেয়ের মুখের সামনে তুলে ধরে | আর ওর এই উচ্ছল ছেলেমানুষী দেখতে দেখতে সেই এয়ারপোর্টের ব্যস্ত ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আমি মনের টাইম মেশিনে চড়ে পৌঁছে যাই ছাব্বিশ বছর আগের এক সকালে, সরকারী আবাসনের এক ছোট্ট ফ্ল্যাটে | এক সরকারী কর্মচারী ঘুম থেকে উঠে বাজার যাওয়ার আগে তার পাঁচ বছরের মেয়েকে কাছেই মন্টেসরি স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসার জন্য তৈরী, কিন্তু মেয়ে কিছুতেই যাবে না | বিরাট কান্নাকাটি জুড়েছে সে | না, ইস্কুল ভাল্লাগে না বলে নয়, সেখানে সে ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়, আন্টিরা সবাই তাকে ভালবাসে | সে আজ বায়না ধরেছে অন্য জিনিসের |

পরশু শনিবার তার ক্লাসের বেস্ট ফ্রেন্ড দীপান্বিতার জন্মদিনে ওদের বাড়ী গিয়েছিল সে | সি আই টি পার্কের পাশে সেই বড়সড় দোতলা বাড়ীর লাগোয়া বাগানে সারা বিকেল হুটোপাটি করেছে একদল কচিকাঁচার সঙ্গে | সেখানে অন্যতম আকর্ষণ দীপান্বিতাদের হাভানিজ কুকুর, স্নোয়ি | বড় বড় লোম-ওয়ালা দুধসাদা কুকুরটার গলা জড়িয়ে আদর করে, তার ল্যাজ টেনে, তাকে চটকে মটকে একাকার করেছে বাচ্চাগুলো | আর

কুকুরটা এমন শান্ত যে টুঁ শব্দটিও করেনি, ওদের সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে গেছে | ব্যস, সেদিন বাড়ী ফিরেই মেয়ের বায়না, ঐরকম একটা কুকুর চাই | বাবা এক ধমকে "না" করে দিতেই মেয়ের দুচোখ দিয়ে জলের ধারা | মা কোলে বসিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু ভবি ভোলবার নয় | রাতে ভাল করে খেল না, অভিমান করে ঘুমোতে চলে গেল | পরদিন সকালে যখন তার মাথা থেকে সেই কুকুরের ভূত কিছুটা হলেও নেমেছে, আরেক নতুন বিপত্তি | রবিবার সকলে মিলে যাবার কথা ছিল উত্তরপাড়ায় ওর মামাবাড়ীতে | দক্ষিণেশ্বরের ঠিক উল্টোদিকের ঘাটে গঙ্গার গা ঘেঁষে পুরনো আমলের সেই বাংলোবাড়ীতে ওর দুই মামাতো দাদা-দিদি একেবারে খুদে চিড়িয়াখানা বানিয়ে রেখেছে | কাঠের পেটিতে একগন্ডা ফুটফুটে খরগোশ ছানা, বাড়ীময় ঘুরে বেড়াচ্ছে আধডজন বেড়াল, ঝুলন্ত খাঁচায় নানারকম পাখী | অতএব প্রত্যাশিত-ভাবেই সারাদিন ধরে তুলোর পুতুলের মতো খরগোশছানা নিয়ে খেলা করার পর বাড়ী ফেরার পথে মেয়ের মাথায় নতুন পোকা নড়ে উঠল | এবার একটা খরগোশের জন্য ঝুলোঝুলি, ট্রেনের মধ্যেই কান্নাকাটি | বাবার চোখরাঙানিতে তখনকার মতো চুপ করে গেলেও বাড়ী পৌঁছেই আবার আবদার মা'র কাছে | সঙ্গে প্রতিশ্রুতির বন্যা – "আমি আর কোনোদিন বলব না মাছ ভাল্লাগে না, মাছে গন্ধ, রোজ সকালে পুরো হরলিক্সটা খেয়ে নেব, একটুও ফেলব না, ঘরের দেয়ালে আর কক্ষণো রংপেন্সিল দিয়ে আঁকব না" ইত্যাদি | বাবাদের সহ্যশক্তি মায়েদের চেয়ে চিরকালই একটু কম, ইচ্ছে হয় এক দাবড়ানি দিয়ে এই ঘ্যানঘ্যানানি থামিয়ে দিতে | কিন্তু মা বাধা দিল, বলল মেয়ে যা জেদী, বকুনিতে উল্টো ফল হবে | অতঃপর রাতে বিছানায় শুয়েও মা'র সঙ্গে ফিসফিসানি চলতেই থাকল এই নিয়ে | আর পরদিন সকালে উঠে ইস্কুলে না যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি |

শেষমেষ রফা একটা হ'ল | কুকুর নয়, বেড়াল নয়, খরগোশ নয়, পাখী নয়; মাছ | হ্যাঁ, রংবেরঙের মাছের অ্যাকোয়ারিয়াম | এই সপ্তাহের শেষেই বাড়ীতে একটা আলো-লাগানো অ্যাকোয়ারিয়াম আর তার মধ্যে রাখার জন্য মাছ এসে যাবে শুনে চোখের জল মুছে স্কুলের দিকে পা বাড়াল মেয়ে | নাঃ, এ নির্ঘাত বড় হয়ে জাঁদরেল পলিটিশিয়ান হবে – এখনই যা নেগোশিয়েটিং পাওয়ার | আর কোনো উচ্চবাচ্য না করে আমি তাড়াতাড়ি এগোই ওকে নিয়ে, কারণ ওকে স্কুলে না ছেড়ে আসা অবধি বাজারে যেতে পারব না | দেরী করে বাজার এলে কুটনো কুটে, রান্না চাপিয়ে আমাকে সাড়ে ন'টায় অফিসের ভাত দিতে পারবে না ওর মা | আজ যে সবকিছু একা হাতে সামলাতে হচ্ছে তাকে | গত শনিবার অবধি আমাদের ফ্ল্যাটে যে মেয়েটি কাজ করত, সে কাল সকালে জানিয়ে গেছে মাইনে অন্ততঃ দেড়গুণ না হলে আর তার পক্ষে আসা সম্ভব নয় | পাশের পাড়ার অবাঙালি ব্যবসায়ীদের বাড়ীগুলোতে নাকি দুগুণ তিনগুণ টাকা দেবে বলে সাধাসাধি করছে | অগত্যা ছাড়তে হ'ল ওকে | আমি তো আর অবাঙালি ব্যবসায়ী নই, নেহাতই ছাপোষা সরকারী চাকুরে | একার রোজগারে সংসার টেনে এক কথায় এত টাকা মাইনে বাড়ানো সম্ভব নয় | ইদানীং নতুন কাজের লোক জোটানো বেশ শক্ত হয়ে গেছে; প্রতিযোগিতার বাজার | সুতরাং বুঝলাম কিছুদিন নিজেদেরই চালিয়ে নিতে হবে কোনোরকমে |

কিন্তু না | কপাল ভাল যে আমাদের বেশীদিন ভুগতে হ'ল না | এর জন্য অবশ্য আমার সহধর্মিণীকেই কৃতিত্ব দিতে হবে | ও আমাদের আশপাশের ফ্ল্যাটগুলোয় যারা কাজ করে তাদের অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দু'একজনকে নিমরাজী করিয়েছিল | পরদিন অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি তাদেরই একজনের সঙ্গে কথা বলছে আর ফ্ল্যাটের ভেতরটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে | আমি এসে পড়ায় মাইনেকড়ির ব্যাপারে দর কষাকষিটা আমিই করলাম, কিন্তু বিশেষ সুবিধে হ'ল না | আগের চেয়ে বেশীই দিতে হ'ল | রেখার মা পরদিন থেকেই কাজ শুরু করতে চায় শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম আমরা | এবং তারপর দুদিনের মধ্যেই এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে পুরনো লোক ছেড়ে গিয়ে নতুন লোক রাখতে বাধ্য হওয়াটা শাপে বর হয়েছে আমাদের | দারুণ গোছানো, পরিপাটি কাজ এই রেখার মা'র |

হায়, ভাগ্যের ফের আর কাকে বলে | তৃতীয় দিনেই বিরাট ঝামেলা | আমাদের ঠিক মাথার ওপরের মানে তিনতলার ফ্ল্যাটটাতে অনেকদিন ধরে কাজ করছে আমাদের নতুন লোক, তাই ওর ওপর তাদের একটা অলিখিত অধিকার আছে | সেই ফ্ল্যাটের গিন্নী হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ায় সকালবেলাটা ওদের ওখানে বাড়তি কাজের দায়িত্ব এসে পড়ল রেখার মা'র ওপরে,

সময়ের পাটিগণিত মিলিয়ে ভোরবেলা আমাদের ফ্ল্যাটে দু-আড়াই ঘন্টা সময় কাটানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। অসুখবিসুখের ব্যাপার – মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু এদিকে আমাদের যে মহা বিপদ। অসহায় আবেদন জানালাম দুজনে রেখার মা'র কাছে – কিছু একটা উপায় বার করো। উত্তরে সে কিঞ্চিৎ আশার আলো দেখিয়ে বলল, সকালটা নাহয় রেখা এসে সামলে দিয়ে যাক, বিকেলে সে নিজে আসবে। রেখা, অর্থাৎ ওর মেয়ে; বছর কুড়ি বয়স বোধহয়, সেও কয়েক বাড়ী কাজ করে।

পরদিন থেকেই আমাদের ফ্ল্যাটে রেখার আনাগোনা শুরু। বিধবা মায়ের একমাত্র মেয়ে এমন কচি বয়সে নিজের সাধ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে মাকে সাহায্য করতে এই পেশায় নেমেছে। কাজ মন্দ করে না, বেশ চটপটে আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু ওর আবার অন্য একটা মুশকিল আছে। কোলে দুধের বাচ্চা, সবে হামা দিতে শিখেছে। ফুটফুটে একটা মেয়ে, মা'র মতো টানা টানা চোখ, মাথায় কোঁকড়ানো চুল। সমস্যাটা এই যে, ও যেই মেয়েকে ব্যালকনিতে বসিয়ে রেখে কাজকর্ম করতে যায়, সে চোখের সামনে মাকে দেখতে না পেয়ে চিল চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। আবার ওকে কোলে নিয়ে কাজ করাও তো প্রায় অসম্ভব। মেয়ে সামলাতে গিয়ে বেচারার দেরী হয়ে যায় আর আমার গিন্নীর কপালে ভাঁজ পড়ে, ভুরু কুঁচকে ওঠে। তারও তো সকাল সকাল অফিসের ভাত জোগানোর তাড়া। তাকে এভাবে বেকায়দায় পড়তে দেখে আমার অস্বস্তি লাগে, মনটা তেতো হয়ে থাকে। একদিন জিজ্ঞেস করেই ফেললাম রেখাকে, "হ্যাঁ রে, মেয়েটাকে ওর বাবার কাছে রেখে আসতে পারিস না? তোর নিজেরই তো অসুবিধে হয়।" উত্তরে ও নতমুখে, ছলছল চোখে যা শোনালো তাতে প্রশ্নটা করার জন্য নিজেকেই অপরাধী মনে হ'ল আমার। বাবা নেই মেয়েটার। বিয়ে হয়নি রেখার। তরুণী বয়সে বস্তিতে অসৎসঙ্গে পড়ার পরিণতি এই সন্তান, যার জন্মের পরেই সব দায়িত্ব ছেড়েছুড়ে উধাও জন্মদাতা।

এবার আসল কথায় ফিরি। আমাদের যার যতই অসুবিধে হোক না কেন, ফ্ল্যাটের একজন বাসিন্দা তো এই হামা-দেওয়া পুতুল দেখে আহ্লাদে আটখানা। বাস্তবিকই, ওর পাঁচ বছরের জীবনে এত ছোট বাচ্চা এত কাছ থেকে কখনো দেখেনি ঋতু। প্রথমদিন ও যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাচ্চাটার সামনে দাঁড়াল, সে বড় বড় চোখে ওর দিকে তাকিয়ে মুখে "তা তা তা তা" জাতীয় একটা আধো-আধো বুলি বলতে বলতে হামা দিয়ে এগিয়ে এল ওর কাছে। দেখে ঋতুর সে কী খিলখিল হাসি, খেলতে শুরু করে দিল ওর সঙ্গে। ও ছুটে ছুটে পালিয়ে যায় আর বাচ্চাটা চার হাতপায়ে ঘষটে ঘষটে ওকে তাড়া করে। ঘড়ির কাঁটা যে দৌড়চ্ছে, স্কুলের দেরী হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। এমনকী, অবাক হয়ে দেখলাম, যে মেয়ে এই পাঁচ-ছদিন আগেও কুকুর আর খরগোশের বায়না করে জ্বালিয়ে মারছিল আমাদের, সে অ্যাকোয়ারিয়াম আর রঙিন মাছের কথাও বেমালুম ভুলে গেছে। তুলছেই না সেই প্রসঙ্গ। আমিও সুযোগ বুঝে চেপে গেলাম ব্যাপারটা – সেধে সেধে ঘরে ঝামেলা আনতে কে চায়? বুঝলাম, এখন ঋতুর মন জুড়ে শুধুই তার নতুন খেলনা। একদিন রেখাকে জিজ্ঞেস করল, "ওর নাম কী গো?" সত্যিই তো, তিন-চারদিন হয়ে গেল ও আমাদের বাড়ীতে আসছে, ওর নামটাই জানা হয়নি। রেখার জবাবে মুখ টিপে হাসলাম আমরা। দিদিমা নাকি তার নাতনির নাম রেখেছে পুঁটিরানী। ঋতু কখনো তা হতে দিতে পারে? সে আবদার ধরল, "না-আ-আ, ক্যান উই কল হার বিউটি, অর রাপাঞ্জেল?" আসলে মন্টেসরিতে বিউটি অ্যান্ড দ্য বীস্ট, গ্রিম ব্রাদার্স-এর গল্প-টল্প শুনছে ইদানীং, সেখান থেকেই ওই নামগুলো শিখেছে। যাইহোক, পুঁটিরানী থেকে রাপাঞ্জেলে রূপান্তরটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, তাই ঋতুর মা প্রস্তাব দিল, "তোর নাম তো ঋতু, যদি তার সঙ্গে মিলিয়ে ওকে আমরা ডাকি মিতু বলে?" মনে হ'ল এই ছন্দমিলের ব্যাপারটা মেয়ের মনে ধরেছে। ব্যস, সেই থেকে রেখার মেয়ের নাম মিতু।

দিন গড়িয়ে যায়, মাস গড়িয়ে যায়। আমাদের ওপরের ফ্ল্যাটের সেই অসুস্থ গিন্নী সুস্থ হয়ে গটগট করে হেঁটে বেড়ান, বাজার-দোকান করেন। কিন্তু রেখার মা'র আর আমাদের ফ্ল্যাটে কাজে ফেরা হয়নি। সকাল-বিকেল রেখাই আসে এখন। শুধু সকালে অল্প কিছুক্ষণের জন্য তার 'খেলনা'কে পেয়ে মন ভরছিল না ঋতুর, বিকেলেও চাই ওকে। মিতুও তার দিদির খুব ন্যাওটা হয়েছে এখন – যদিও 'দিদি' কথাটা বেরোয় না মুখ দিয়ে, "তি তি য়া, তি তি য়া" গোছের একটা কিছু বলে। মাকে চোখের সামনে না পেলে আর কান্নাকাটি করে না বাচ্চাটা, তার

দিদির খেলাঘরের খেলনাপাতি নিয়ে ভুলে থাকে। এমনি করে একদিন আমাদের ফ্ল্যাটের বারান্দায় আমাদেরই চোখের সামনে হাঁটতে শিখে গেল মিতু। এরকম একজন খেলনা-কাম-খেলার সাথী পেয়ে তার ফ্ল্যাটবাড়ীর বন্ধুবান্ধবদের কাছে গর্বে বুক ফুলে থাকে ঋতুর। স্কুলেও "ইওর ফেভারিট গিফট দিস ইয়ার" লিখতে দিয়েছিলেন যখন আন্টি, সে মিতুর কথাই লিখেছে।

এমনি করে কোথা দিয়ে একটা গোটা বছর পার হয়ে গেল। এখন আর আমাদের ফ্ল্যাটে কোনো কাজের লোক আসে না। রেখা অবশ্যই আসে দুবেলা – কোনো কোনো দিন তিনবেলাও। কিন্তু সে তো আর কাজের লোক নেই। আধা আত্মীয়। তার মেয়ে যে আমার মেয়ের 'বোনু' হয়ে গেছে। যে কোনো ব্যাপারেই ওকে যা দেওয়া হবে – খাবার, পোশাক, রংপেন্সিল, খেলনা, ছবির বই – সবকিছু মিতুকেও দিতে হবে। নাহলেই কান্নাকাটি। আধো আধো বুলি ছেড়ে পুঁচকিটা এখন টুকরো টুকরো কথা বলতে শিখেছে পরিষ্কার। এমনকি ইংরেজীতে "মাই নেম ইত মিতু"ও বলতে পারে। কে শিখিয়েছে সেটা বলাই বাহুল্য। এভাবে চলতে চলতে তিন বছরে পা দিল যখন মিতু, তার দিদি ক্লাস টু-তে উঠেই বায়না ধরল বোনুকেও ওই ইস্কুলে ভর্তি করতে হবে। একসঙ্গে যাবে ওরা দুজন। প্রথম যেদিন আমার কানে এল এই আব্দার, মনে মনে ভাবলাম , সর্বনাশ করেছে। এই মেয়ের জেদের কাছে তো রাতদিন হার মানতে হয়। এবার যদি মন্টেসরির মতো প্রাইভেট স্কুলে আরেকজনকে পড়াবার দায় আমার ঘাড়ে এসে পড়ে, তাহলেই গেছি। মিতুর মা-দিদিমার পক্ষে তো সেই খরচ যোগাতে পারার প্রশ্নই আসে না। মুখে নির্বিকার থেকে আব্দারটাকে আদৌ পাত্তা না দিয়ে স্পষ্টভাষায় জানালাম, নাঃ, সেটা সম্ভব নয়। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল অভিমান, বিদ্রোহ। মা কত বোঝালো, "ঋতুসোনা, তুমি তো তোমার ক্লাসের বেস্ট গার্ল। কত বুদ্ধিমান, কত স্মার্ট। মিতু কী আর তোমার মতো ভাল? ওর অত বুদ্ধিই নেই। ওকে নেবেই না তোমাদের ইস্কুলে। ও অন্য জায়গায় ভর্তি হবে'খন।" কিন্তু কে শোনে কার কথা? আমার শেষ অস্ত্র অর্থাৎ কড়া বকুনিতেও যখন কোনো কাজ হ'ল না, উইকলি টেস্টের দিনেও যখন মেয়ে প্রবল কেঁদেকেটে স্কুলে যেতে চাইছে না, তখন ওর মা আমাকে চুপিচুপি বলল, "তুমি চিন্তা কোরো না। আমি কয়েকমাস আগে শখ করে যে দুটো প্রাইভেট টিউশনি নিয়েছি, সেই টাকাটা আমার হাতখরচের জন্যই তো? ওটা থেকেই সামলে দেব এই বাড়তিটুকু। হাজার হলেও একটা ভাল কাজ তো হবে।"

ভাগ্যিস রাজি হয়েছিলাম সেদিন। ভাগ্যিস আমার একরত্তি মেয়ের বায়না আমাকে বাধ্য করেছিল সেই সিদ্ধান্তটা নিতে। নাহলে কী ভুল যে করতাম, কী বিরাট আফসোস নিয়ে যে এই পৃথিবী থেকে যেতে হত, ভাবলে শিউরে উঠি। ঋতুর আদরের সেই বোনু মন্টেসরি থেকে প্রাইমারী স্কুল, সেখান থেকে সেকেন্ডারী স্কুল, তারপর হায়ার সেকেন্ডারী – সর্বত্র এমন তুখোড় রেজাল্ট করল যে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হতে কোনো অসুবিধেই হ'ল না। অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর – দুটোতেই ফার্স্টক্লাস পেয়ে সে যেদিন বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স-এ তার গবেষণার আবেদন মঞ্জুরির খবর জানাল আমায় ফোনে, সেদিন ছিল তার দিদির জীবনেও একটা স্মরণীয় দিন। নিউটাউনের এক ব্যাঙ্কোয়েট হলে সেদিন ঋতুর বিয়ের রিসেপশন। দিদিও আজীবন ভাল ছাত্রী, জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিয়ে যাদবপুর থেকে বায়োটেকনোলোজিতে স্নাতক হওয়ার পর ভুবনেশ্বরের নামকরা কলিঙ্গ ইউনিভার্সিটিতে চলে যায় ওই বিষয়েই স্নাতকোত্তর করতে। যাদবপুরে পড়ার সময় সেখানকার ইলেক্ট্রনিক্স বিভাগের অনমিত্র বসুর সঙ্গে আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতা; তারপর দীর্ঘ প্রণয়পর্ব এবং অবশেষে পরিণয় – অনমিত্র হায়দ্রাবাদে তার দ্বিতীয় চাকরিটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। ঋতুর বিয়ের সময় বেঙ্গালুরুতে থাকায় মিতু আসতে না পারলেও মিতুর মা কিন্তু এসেছিল। শুধু এসেছিল বললে ভুল হবে, পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে প্রচুর খাটাখাটনি করেছিল। মুখে খালি একটাই কথা, "আজ আমার বড়মেয়ের বিয়ে, আমি কি দূরে থাকতে পারি?" অনেকদিন পরে দেখলাম রেখাকে। এখন আর কলকাতার এদিকটায় থাকে না, মা মারা যাবার পর আর মেয়ে সাবালক হয়ে প্রেসিডেন্সীর হস্টেলে চলে যাবার পর মফস্বলের দিকে কোথায় যেন উঠে গেছে। চল্লিশের ঘরে বয়স, কিন্তু জীবনের টানাপোড়েনে চেহারা ভেঙে গেছে, চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে। তারপর এতগুলো বছর আর ওকে দেখিনি। আজ মিতুর মুখে খবর পেলাম রেখা এই মুহূর্তে এক কঠিন রোগে

শয্যাশায়ী, ও মাকে বেঙ্গালুরু নিয়ে যেতে এসেছে, নিজের কাছে রাখবে। কপট অভিমান দেখিয়ে বললাম, তোর বিয়ের খবরটা জানালি না আমাদের? গোপনে গোপনে সারলি? ও লজ্জা পেল, জানাল শুধু রেজিস্ট্রি করেছে, কোনো অনুষ্ঠান হয়নি। আজ ঋতু-মিতুর দেখাও তো হ'ল প্রায় ন'বছর পরে। দুজনেই বেশ খানিকটা বদলেছে এই এক দশকে। মা হওয়ার পর চেহারা অল্প ভারী হয়েছে দুজনেরই। কাজেই প্রথম দর্শনে চিনতে না পারাটা অস্বাভাবিক নয়।

স্মৃতির অলিন্দে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে সময়ের খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। হঠাৎ মিতুর ডাকে সম্বিৎ ফিরল, "চলে আসুন মেসোমশাই, গাড়ি এসে গেছে। দিদিদের লাগেজগুলো লোড করছে ড্রাইভার।" গাড়ীতে উঠে মিতু তার দিদিকে বলল, "ওঃ, তোমার সঙ্গে এতদিন পর এই দেখা হওয়াটা একেবারে স্বপ্নের মতো লাগছে। যা ট্রিমেন্ডাস অ্যামাউন্ট অফ গল্প জমে আছে, এক সপ্তাহেও ফুরোবে না। আমি বেঙ্গালুরুতে ফিরে যাচ্ছি সামনের শনিবার, তার আগে একদিন আসব, জমিয়ে গল্প করব সবার সঙ্গে। আজ তোমাদের ড্রপ করে দিয়েই একবার ফার্ন রোডের দিকে যেতে হবে, কিছু জরুরী কাজ আছে –"

- "মারব এক থাপ্পড়। জরুরী কাজ আবার কী?" কথা শেষ হবার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ে ঋতু, "আজ আমি তোকে ছাড়ছি না, ব্যস। সারাদিন আমাদের বাড়ীতে থাকবি, খাওয়াদাওয়া গল্প-গুজব হবে, তাছাড়া ঋকবাবু আর মিঠিসোনার আলাপ পরিচয়টা আরও ভাল করে হওয়া দরকার, তাই না?"

- "ও দিদি, বলছি তো আসব একদিন, গোটা দিন জ্বালাব তোমাদের। আজকের দিনটা প্লীজ ছেড়ে দাও। সত্যিই কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট –"

- "আবার মুখের ওপর কথা? দেখেছ বাপি, মিতুটা কীরকম বেয়াড়া হয়েছে? কী এমন রাজকার্য রে তোর, শুনি।"

- "রিয়েলি, বিশ্বাস করো, এগুলো আজ বিকেলের মধ্যে না সারলে শনিবারের আগে আর চান্স পাব না। মেসোমশাই, আপনি একটু আমায় সাপোর্ট করুন।"

আমি অনমিত্রকে চোখ টিপে বললাম, "আমার সাপোর্ট চেয়ে লাভ নেই মা, তোমার এই দিদিটি তিরিশ বছর আগেও আমার কথা মানত না, এখনও মানবে এমন সম্ভাবনা কম। বরং তোমার এই জামাইবাবুটিকে বলে দেখতে পারো, ও বুঝিয়ে বললে যদি শোনে।"

- "বাপি, তুমি না –"

ক্রমশঃ আরও উচ্ছল হয়ে ওঠে ওদের কথোপকথন। আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি দুই মায়ের কোলে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকা দুই খুদের দিকে। এদেরও একজনের নাম 'ঋ' দিয়ে শুরু আর অন্যজনের 'মি'। এদের জীবনপথও কি কোথাও গিয়ে এরকম আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাবে, যেমনটি হয়েছিল এদের মায়েদের বেলায়?

হয়তো...

নিজেকেই একটু পুষি

বলাকা ঘোষাল

সপ্তাহে দু-দুবার টাটকা জীবন্ত উচ্চিংড়ে কিনে আনতে হবে শুনেই আমার ছেলে, আকাশ-এর ব্যাঙ পোষবার শখে জল ঢেলে দিলুম। আর তক্ষুনি বাড়ি ফিরে দিলুম জুতোর বাক্সে রাখা এককুঁচি সবুজ ব্যাঙ বাবাজীকে বাগানে ছেড়ে। রাতদিন চাকরি করে আমাদের নিজেদের ডাল-ভাত কখন রাঁধিবাড়ি ঠিক নেই, কোনও রকমে মুদি বাজার, কাঁচা বাজার করি এই যথেষ্ট, তা নয়, আবার উচ্চিংড়ে কিনতে যেতে হবে দুদিন পরে পরেই? বোঝো! আমাকেই যদি কেউ পোষে তো বেঁচে যাই।

ছেলের মন ভার। ব্যাঙ মুক্তির আগে তবু ওর প্রস্তাবে পেট্‌স্ মার্টে ঢুঁ মেরেছিলাম। একটা সেলস্ বয় এনে দেখাল টানটান করে ফোলানো একটা ব্যাগে ডজনখানেক উচ্চিংড়ে লাফালাফি করছে। সেটা দেখে বললুম এর কোনও বিকল্প আছে কিনা। ছেলেটি অম্লান বদনে বলল, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আপনি পোকা ধরবার জাল নিয়ে বাগানে দৌড়ে দৌড়ে ধরে নিতে পারেন। ব্যায়াম কে ব্যায়াম হবে, ব্যাঙ খাওয়ানোও হবে।" সবাই খুশী। শুনে আমি খুব একটা খুশী হতে পারলুম না। 'বাগ-নেট' বা পোকা ধরবার জাল হাতে হই হই করে আমরা দৌড়ে বেড়াচ্ছি আর উচ্চিংড়েরা অনায়াসে আমাদের জাল এড়িয়ে পাশেই নেচে বেড়াচ্ছে ভেবে আমার হাসিই পেল। আর দুশ্চিন্তাও কম হ'ল না – বহু দৌড়েও যথেষ্ট উচ্চিংড়ে ধরা না গেলে দেখা যাবে যে আমাদের রোগা হওয়ার সাথে সাথে ব্যাঙটাই বেশী রোগা হয়ে যাচ্ছে।

শুধু কি তাই? কাঁচের বাক্সে মাটি, পাথর, নারকোল-মালার বাড়ি, ছোট্ট পুকুরে জল, গাছের ডালপালা, চামড়া ভেজা রাখবার জন্য থেকে থেকে তেনার গায়ে জল ছেটানোও আছে। আর ঠান্ডা বাড়িতে ওর ছোট্ট বাড়িখানা গরম রাখবার জন্য সারারাত হীট-ল্যাম্প জ্বালিয়ে রাখা, কাজেই এ-সি আর এই হীট-ল্যাম্পের প্রতিযোগিতায় যেটা হারবে, সে হ'ল আমার সাধের ইলেক্ট্রিক বিল। ছেলেকে বোঝাতে একটু বেগ পেতে হল বৈকি। জুতোর বাক্সয় নানা ডালপালার মাঝখানে ব্যাঙ বাবাজীর সাথে আকাশ লুকোচুরি খেলে বেশ মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিল। বললুম, "বড় হয়ে, চাকরি করে তুই যা প্রাণ চায় পুষিস, আমি কিচ্ছু বলব না। আপাতত এই বাগানটাই আমাদের ব্যাঙের বাড়ি, এই ভেবেই একটু সান্ত্বনা পা।"

বাড়িতে দু-দুটো মূর্তিমান হুলো তো বিরাজ করছেই। তাদের যত্নের কাজ কিছু কম নয়। যদিও তাদের ভাবখানা যেন আমরাই ওদের পোষা।

এরপর এল সাপের অনুরোধ। সেই বেলাতেও তাই। না, সাপটি ভাগ্যিস আকাশ ধরে আনেনি বাগান থেকে! এর বেলায় পোষবার হোম-ওয়ার্ক করতে গিয়েই আটকে গেলাম। তাকে ঘরে আনবার প্রস্তুতি পর্বেই স্টপ হয়ে গেল সবটা। এত ব্যবস্থাপত্র – যেন একটা পুরো সংসার! তবু গ্যারান্টি নেই সে হঠাৎ প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বে কিনা!

আমার স্কুলের বিজ্ঞানের টিচার মিস গেলবা'র সায়েন্স ল্যাবের তিনফুট অজগর যখন একদিন সকালে তাঁর কাঁচের বাক্স থেকে গায়েব হয়ে গেলেন, তখনই তো আমার টেনশন! গেলবাকে কিন্তু বিশেষ বিচলিত হতে দেখলুম না। সে স্কুল কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে দিব্যি ক্লাস নিতে লাগল রোজকার মতন। কান খাড়া রাখলাম কারুর চিৎকারের জন্য। প্রিন্সিপ্যালকে গিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বলেই ফেললুম আমার উদ্বেগের কথাটা। উনি স্বভাবে গেলবারই মাসতুতো ভাই – হেসে বললেন, "খুঁজে না পাওয়া অবধি কারুর জেনে দরকার নেই।"

বুঝলুম এই খবরটা ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে রাষ্ট্র করে পি-টি-ও-কে ঘাঁটাতে চান না তিনি।

দুদিন কেটে গেল। গেলবা'র মতে "খিদে তেমন পেলে ঠিক বেরোবে।" অবশ্যই, সে আর বলতে! অকাট্য যুক্তি! কিন্তু আমি ভাবছি গেলবা'র সাপটা কাকে গিলবে। দিনের পর দিন যখন কেটে গেল তখন গেলবা ছেলেমেয়েদেরই পুঁচকি একটা প্রাইজের লোভ দেখিয়ে তল্লাশির কাজে লাগিয়ে দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে স্কুলের সবচেয়ে দুষ্টু ছেলেটা ল্যাবের ফ্রীজের পিছন থেকে তাকে বের করে আনল। ওই ফ্রিজের ভিতরেই ওর ফেভারিট ইঁদুরগুলো রাখা থাকে কিনা! তার উষ্ণতাকে ঘিরে দিব্যি ঘুম মারছিলেন ইনি। আমরা সাপ পুষব কি পুষব না ডিলেমার সেখানেই ইতি।

আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের একতলার প্রতিবেশীর ব্লাইন্ডস্‌গুলো দেখে মনে হতো নিশ্চয়ই কোনও পাগল থাকে ওখানে – সবকটা ব্লাইন্ডস্ এলোমেলো ছেঁড়া-ভাঙা। ভাবতুম

এবাড়ির একজন বাসিন্দা আলবাৎ সাইকিক কেস্ | একদিন কৌতূহল চাপতে না পেরে সামনে ঘোরাঘুরি করছি, আর আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছি সেদিকে | কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিস্তর হাঁচর পাঁচরের পরে ব্লাইন্ডসের এহেন দশার জন্য যারা দায়ী তাদের দুটো মস্ত লোমশ মাথা দেখা দিল জানলায় | দুজন পেল্লাই কুকুর থাবায় আর চোয়ালে সারা বাড়ির সবকিছুই কতখানি ছিবড়ে করে ফেলেছে তাতে সন্দেহ রইল না | খুব কিউট লেগে থাকলেও ভাবলাম যে জার্মান শেপার্ড বা গোল্ডেন রিট্রিভার বা নিদেন পক্ষে গঙ্গারামের মতন লেপাপোছা ভালমানুষ সেইন্ট বার্নার্ড কোনোটাই চলবে না | রাস্তায় ওদের দেখে বরং 'হায়, হ্যালো' আর হাত পা চাটাচাটিতেই সন্তুষ্ট থাকব |

লোকে কী না পোষে | কচ্ছপ থেকে কুমীর, শামুক থেকে র‍্যাটল্ স্নেক – তালিকার শেষ নেই | হিউস্টন আর্বোরেটামে যতদিন কাজে ঢুকেছি, গাছপ্রেমী আর প্রাণীপ্রেমীর নানান রকমের স্যাম্পল দেখা হয়ে গেছে | আর শিখলুম কিছু প্রাণীদের খাওয়ানো | সেই সুবাদে আমার একটু উচ্চিংড়ে বা ইঁদুর খাওয়ানোর অভিজ্ঞতাও হয়েছে বৈকি |

সেই অফিসে একটাই সাপ, নাম ফ্রেড | ফ্রেডকে দেখে অ্যাফ্রেইড হবার কিছু নেই অবশ্য | বিষ নেই | বাবুরাম দেখলে খুশী হতো | তেড়ে মেড়ে ডান্ডা আনবার দরকার হতো না, কেননা ফ্রেড খুব মিশুকে | হাতে গলায় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সে দিব্যি সবার সাথে খেলে বেড়ায় | মাসে একদিন সে খায় – মোটে একটা পুঁচকে, সাদা ইঁদুর | বেশ তো, খাক না!

কিন্তু আমার সমস্যার এখানেই সবে শুরু | একদিন কফি-রুমে ঢুকে দেখি ফ্রিজ থেকে একটা ছোট্ট প্যাকেটে সাদা একটা ইঁদুরের মরদেহ টুপ করে এক কাপ গরম জলে ডুবিয়ে দিল এমা নামের মেয়েটি | আমি তো মনে মনে 'এ মা, এ মা' করে চলেছি! "ও বাবা গো" বলে লম্ফ দিলে হয়তো কাজে দিত | আরেকদিন দেখি অন্য একজন ঠিক ওই কান্ডটাই করছে অন্য একটা কাপে | বুঝলুম এখানে এটাই চালু | চায়ের কাপে গরম জল নিয়ে ইঁদুর 'থ' করা হয় | এদিকে সেটা দেখে তো আমি চোয়াল ঝুলিয়ে 'থ' হয়ে গেছি | এতদিন আমি যত কাপে চা খেয়েছি সেগুলোতে কোনও না কোনও দিন ইঁদুর গরম করা হয়েছে! সাপের ইঁদুর গরম করা হচ্ছে আমাদের চা খাওয়ার কাপে! এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না কি? একদিন আমরা কয়েকজন একটু চোখ চাওয়া-চাওয়ি করছি; লজ্জার মাথা খেয়ে শেষে বলেই ফেললুম যে একটা কাপ ওই ইঁদুরের জন্য ডেসিগনেট্ করে দিলে ভাল হয় না কি? শার্পি দিয়ে "মাউস কাপ" লিখে রেখো, প্লীজ | অন্যেরা সায় দিলেও আমার ট্রেইনার, এমা একেবারেই বুঝল না | সে ভাবে সাবান দিয়ে ধুলেই যা সাফ হয়ে যায়, তাই নিয়ে এত চিন্তা কীসের!

এদিকে কম্পিউটারের পাশে গা ঘেঁষে উল্টো হয়ে শুয়ে আমার হুলো নাম্বার ওয়ান – শ্রীমান 'প্যাচুপাই' আমাকে লেখা ফেলে একটা ঘুম মারবার প্রেরণা দিচ্ছে | ওর থাবায় চিবুকটা রেখে আলতো করে ওর গালে গাল ঠেকিয়ে আমিও মাথা এলিয়ে দিলুম টেবিলে | গলার ভারি মন্দ্রে গুরগুরানির ছোঁয়ায় আমার মন প্রাণ ঘুড়ির মতন উড়তে লাগল | আমাদের দামী সোফার কোনাগুলো আঁচড়ে নাহয় ছিঁড়েই ফেলেছে এরা, বাড়ির প্রতিটি জিনিসে ওদের লোমের প্রলেপ, তাও সই | বহুকাল আগে দু-দুটো ফুটফুটে বেড়ালছানা বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রী ডীলে পাওয়া; কোথাও তো তার দাম দিতেই হবে! ওদের সাতাশিটা ন্যাপের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের যে কত কাজ তার ফিরিস্তির আর উত্থাপন নাই বা করলুম | ভগবানের দয়ায় এদের অন্তত ইঁদুর গরম করে দিতে হয় না |

ভাবলুম সাপ ব্যাঙ শামুক কুকুর বেড়াল ইঁদুররা যেখানে খুশী থাক | আমার সারাদিনের অফুরন্ত কাজের ফাঁকে মনে হয় আমাকেই কেউ পুষুক | একটু যেই জিরোবার ফাঁক পাই মনে হয় নিজেই একটু বেড়াল-মার্কা ন্যাপ নিই গে |

ছেলের স্কুলের পাট শেষ হয়েছে বহুকাল আগে | গাড়ি নিয়ে সন্ধ্যেবেলা এদিক ওদিক ছুটোছুটির পর্বে এখন ইতি | আমাদের দুই বেড়ালরাও মায়া ত্যাগ করে কবে চলে গেছে | এখন বাগানের পাখি আর কাঠবিড়ালিদের নানারকম খাবার দিয়ে খুশী রাখবার চেষ্টা করি | ভাগ বসাতে আসে র‍্যাকুন, অপোসাম, আরও কত কী | কাজে অবসর নিয়ে গাছের নীচে বসে ভাবি এই ভাল, এখন আমার একটু আরাম করবার পালা |

আমি এখন বরং 'নিজেকেই একটু পুষি'|

ডেস্টিনেশন ম্যারেজ

সফিক আহমেদ

স্বদেশী বাবার বিদেশী ছেলের সাথে ভিডিও কল:

স্বদেশে এখন দিন, বিদেশে রাত।

স্বদেশী বাবা:

- "বাবুন, তোর বিয়ের তারিখটা একটু আগে থেকে জানা, সব বন্দোবস্ত করতে হবে তো! পছন্দসই ভেন্যু তো আজকাল বছরখানেক আগে বুক না করলে পাওয়ার কোনো চান্সই নেই। একটা বুকিং করে ফেলি, তা না হলে শেষে ম্যারাপ বেঁধে পাড়ার মোড়ে পাত পেড়ে খাওয়াতে হবে। বেশি চিন্তা করিস না। না হয় একটা ক্যান্সেলেশন ইন্সিওরেন্স নিয়ে নেব। অনিবার্য কারণবশত, মানে শেষ সময় মেয়ে যদি বেঁকে বসে, তাহলে মাত্র ১০ পার্সেন্ট কেটে বাকি টাকা ফেরত দিয়ে দেবে। আর ডেকরেটর, ক্যাটারার – তাদেরও খুব ডিম্যান্ড। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা না হোক কমসে কম এক বছরের প্ল্যানিং ছাড়া কোনো কিছুই মনমতো পাবি না। নেমন্তন্নটাও সেরে ফেলতে হবে অনেক আগে থেকেই। নাহলে শুনবি হয় কারো পিসতুতো দিদির খুড়শ্বশুর-শাশুড়ির বিবাহবার্ষিকী, কারো থাইল্যান্ডে বিদেশ ভ্রমণের দিনক্ষণ একই সময়, নয়তো কারো অর্শ অপারেশনের ডেট ক্ল্যাশ করছে। আগে থেকে জানালে কেউ বলতে পারবে না দেখে দেখে ঐ দিনেই বিয়ের ব্যবস্থা করলেন? বাবুন, সবকিছুর একটা লং-টার্ম প্ল্যানিং দরকার, এটা তোকে কোনোদিনই শেখাতে পারলাম না। তোর সব সেই শেষ সময়ে, উঠল বাই তো কটক যাই। এই প্রথম দেখলাম তুই গুছিয়ে একটা পাত্রী জোগাড় করেছিস। যদিও ঠিকুজি কুষ্ঠি মেলেনি বলে আমার মনে একটা খোঁচা আছে।"

ভিডিও স্ক্রিনে পেছন থেকে একটা ঘুমের পোশাকপরা অবয়ব ভেসে উঠল আর বাবুনের কলার ধরে একটা টান দিয়ে পরক্ষণেই সরে গেল।

বিদেশী ছেলে:

- "বাবা, আমার একটা কল আসছে। আজ উইকেন্ড, শুক্রবার রাত। কাল সকালে আমি কল করব। মাকেও সঙ্গে রেখো। এবার কিন্তু আমি তোমার কথামতো লং-টার্ম প্ল্যানিং করে ফেলেছি। টেনশন নিও না, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো কাল সব জানাব।"

ঝপ করে ভিডিও স্ক্রিনটা অন্ধকার হয়ে গেল, আর পেছন থেকে গিন্নির চিল-চিৎকার।

- "যত বয়স বাড়ছে দিনে দিনে ভীমরতি বাড়ছে। ঠিকুজি কুষ্ঠির গুষ্টির তুষ্টি করেছে। এত ঠিকুজি কুষ্ঠি মিলিয়ে তোমার গলায় আমাকে ঝুলিয়ে দিল, তারপর সারা জীবন আমি এই সংসারের যাঁতা পিষে যাচ্ছি, আর তুমিও কলুর বলদের মতো বগলে ফোলিও ব্যাগ নিয়ে ট্রামে-বাসে-ট্রেনে বেসরকারী অফিস আর বাড়ি করে একটা জীবন কাটিয়ে দিলে। এখন আবার পেনশন ছাড়া রিটায়ার করে পাড়ার মোড়ে হাভাতে বুড়োহাবড়াদের সাথে গুলতানি করছ আর বাড়ি এসে আধ্যাত্মিক জ্ঞান মাড়াচ্ছ। এইসব অলুক্ষণে কথা বলো না তো, ঠিকুজি কুষ্ঠি মেলেনি তো কী হয়েছে? দোষ খন্ডন হয়ে গেছে মেয়ের ভিসা স্টেটাস্, IT কম্পানির বেতনের প্যাকেজ আর স্টক অপসনে।

বাবুন নিজে যে কী করে এখনও তো বুঝে উঠতে পারলাম না আমরা। এত ঢাকঢোল পিটিয়ে ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে বিদেশে চাকরি নিয়ে গেল, তা, বছর ঘুরতে না ঘুরতে এসে গেল কোভিড। সেই যে মুখোশ এঁটে ঘরে সেঁধোলো আর বেরোতে পারল না। ওয়ার্ক ফ্রম হোম থেকে কখন যে ওয়ার্ক ফর হোম – মানে ঘরের কাজে ফুল-টাইম হয়ে গেল বোঝাই গেল না। কই কোভিডের দোহাই দিয়ে সরকারী ভিসা-নীতি কোনো ছাড় দিল না তো! লোটাকম্বল গুটিয়ে দেশে ফিরে আসার জোগাড় হয়েছিল। ভুলে যেও না, এই অন্য কুষ্ঠি আর গুষ্ঠির মেয়ের সাথে কাগুজে বিয়ে করেই ওই দেশে টিকে আছে। এখন রাজ্যের হাভাতে বেকারদের মুখোশ হয়েছে স্টার্টআপ। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে, উদ্ভট চিন্তাধারায় হাওয়া দিচ্ছে আর আকাশকুসুম কল্পনা দেবদূতের মতো এক-শিঙ-হরিণ উনিকর্ন ইনভেস্টর এসে তাদের মনগড়া ব্যবসায় ডলার বর্ষণ করবে। এই টিভি শো'র হাঙ্গরের অ্যাকুইরিয়ামের (Shark Tank) কয়েকটা ঝলমলে এপিসোড দেখে মোটিভেটেড্ হয়ে কত ছেলেমেয়ে দু'বেলা থাকা-খাওয়ার জোগাড় করতে পারছে না তার ইয়ত্তা নেই।"

এরপর দুপদাপ পায়ের শব্দে ঘর থেকে গিন্নির নিষ্ক্রমণ।

বেচারা বাবা এই অযাচিত আক্রমণে স্থাণুবৎ অবস্থানে নিজেরই ঠিকুজি কুষ্ঠি গণনা করে নির্ধারণ করার চেষ্টা করতে থাকল পরের

এককাপ চা আর চালভাজা কপালে আছে কি নেই।

দুপুরে চেয়ারে বসে ঝিমোতে ঝিমোতে কখন যে দিনের আলো কমে এসেছিল খেয়াল নেই। নাকে একটা ল্যাভেণ্ডার ট্যালকম পাউডারের সুগন্ধ ভেসে এল, পাড়ার মোড়ের মাইকে চটুল হিন্দি গানের কলি আর দূরের মন্দিরের ঘন্টার আওয়াজ শুনতে শুনতে মিশ্র অনুভূতিতে ঝিমুনিটা কেটে গেল। এ তো মেঘ না চাইতেই জল! সারাদিনের গুমোট ভাবটা কাটিয়ে ঝগড়ুটে জীবনসঙ্গিনীর কক্ষে প্রবেশ। দশভুজার আটটা হাত গুটিয়ে আপাতত দু'হাতে ধোঁয়া-ওঠা চা আর ফুলকপির সিঙ্গারা নিয়ে আসতে দেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার একটা প্রবণতা এসে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসতেই পাশের গোল টেবিলে চায়ের কাপ আর সিঙ্গারার প্লেটটা নামিয়ে ছোট টুলটা টেনে এনে আমার পাশেই বসল গিন্নি।

বেশ আদুরে গলায় বলল, "আজ বাবুনের ফোন এলে কিন্তু বলতে হবে আমাদের দশটা নয় পাঁচটা নয় একটাই ছেলে। আমার স্কুলের দিদিমণি-স্টাফ মিলিয়ে শ'খানেক গেস্ট হবে কিন্তু।"

- "সে আর বলতে আমার কথাই ভাবো না, রিটায়ার করলেও যাদের সাথে এত বছর কাটিয়েছি, যাদের ছেলেমেয়ের বিয়ে, নাতি-নাতনির অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, অনুষ্ঠানে সপরিবারে কব্জি ডুবিয়ে খেয়ে এসেছি তাদের তো বলতেই হবে। আজ বলব, নাকি তাদের আমার শ্রাদ্ধে নেমন্তন্ন করব! এছাড়া আমার মর্নিং-ওয়াক গ্রুপের লোকজন আছে, পাড়া-প্রতিবেশী, যাদের সাথে দীর্ঘ তিন-চার দশক কাটিয়েছি, তারাও তো আজ নিজের পরিবারের মতো। আর তোমার, আমার আত্মীয়স্বজন, যাদের সঙ্গে এইসব অনুষ্ঠান ছাড়া দেখা হয় না, তাদের বলতেও কার্পণ্য করা যাবে না। না না করে চার-পাঁচশো লোক তো হবেই! সব্বাই জানে ছেলে বিদেশে ডলার কামাচ্ছে, বৌমাও সুপ্রতিষ্ঠিত, জন্মসূত্রে বিদেশিনী, যদিও ভারতীয় বংশোদ্ভূত।

আমাদের সারাজীবনের নিম্ন মধ্যবিত্ত ইমেজটা ভেঙে দেখিয়ে দেব আমরাও কোনো কিছুতে কম যাই না।"

রাত দশটায় ফোন আসবে তার আগেই খেয়েদেয়ে তৈরী হয়ে বসতে হবে। গুছিয়ে সব প্ল্যানিং করতে হবে।

স্বদেশে এখন রাত বিদেশে সকাল।

ল্যাপটপটা নিয়ে বাবা বেশ কয়েকবার এঘর ওঘর করে দেখছে ইন্টারনেটটা কোথায় সবথেকে জোরালো, যাতে ভিডিও কলে স্পষ্ট দেখা ও শোনা যায়।

বারান্দার কাছের টেবিলে ল্যাপটপ রেখে বাবা-মায়ের অপেক্ষা ভিডিও কলের জন্য। অনেকটা অপেক্ষা করার পর প্রায় রাত সাড়ে দশটায় বেজে উঠল ফোনের ঘন্টা। বিদেশী ছেলে ভেসে উঠল ল্যাপটপের পর্দায়। হাতে কফির কাপ, ঝকঝকে রোদ্দুরে বসে আছে। পিছনে নীল আকাশ। দেখেই গর্বে বুক ভরে উঠল মা-বাবার। পৃথিবীর সব সুখ বুঝি ওপারেই।

একগাল হেসে বাবুন বলতে শুরু করল, "বাবা, মা, তোমরা বিয়ে নিয়ে কোনো টেনশন নিও না। রোশনির আর আমার সব প্ল্যানিং হয়ে গেছে। আমরা ডেস্টিনেশন ম্যারেজ করব।"

বাবা চোখ কুঁচকে প্রশ্ন করল, "সেটা আবার কী রে বাবুন? বিয়ে তো একটা ডেসটিনি, সেটাকে আবার কোন ডেস্টিনেশনে নিয়ে যাবি আর কেনই বা যাবি?"

- "বাবা, আমরা বাহামার নাসাউ প্যারাডাইস দ্বীপে বিয়ে করব। এই জায়গা আর বিয়ে হবে স্বপ্নের বিয়ে। সেটা রোশনি আর আমার জন্য একটা অন্তরঙ্গ আর পাঁচতারা জমকালো পরিবেশ, সমুদ্র সৈকতে বিয়ে।

গুঁড়ো গুঁড়ো সাদা বালি আর ফিরোজী রঙের জলের ধারে বসবে বিয়ের মণ্ডপ। ট্রপিকাল ফ্লাওয়ার আর এথনিক ডেকোরেশনে সাজানো হবে বিয়ের আসর। রোশনি সমুদ্রের জল থেকে শাড়ি বাঁচিয়ে উঠে আসবে মণ্ডপের দিকে, আমি হাত বাড়িয়ে দেব আর ধীরে ধীরে হেঁটে আসব। পুরো বিয়ের ভিডিও করবে একটা wedding চ্যানেলের প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার। এই চ্যানেলকে আমরা বিয়ের ভিডিওর কপিরাইট বিক্রি করব। এরাই স্পন্সর করছে আমাদের বিয়ে। অগ্নিসাক্ষী রেখে, প্রথামতো সব সংস্কার মেনে বিয়ের অনুষ্ঠান হবে। এক সাউথ-ইন্ডিয়ান বিদগ্ধ প্রফেসর মন্ত্রোচ্চারণ করবেন। অগ্নিসাক্ষী রেখে সাতপাক ঘুরে আমরা বিয়ে করব।"

মা বলল, "সমুদ্রের হাওয়ায় আগুন নিভে গেলে মহা বিঘ্ন হবে তো বিয়ের, অশুভ হয়ে যাবে বিয়ের যজ্ঞ।"

হা হা করে হেসে উঠল বাবুন।

- "মা সব কন্টিনজেন্সির জন্য প্ল্যান B করা আছে। পাশেই হলোগ্রাফিক ইমেজ দিয়ে তৈরী অগ্নিকুন্ড জ্বলবে দাউ দাউ করে, এই আগুন অবিনশ্বর। ঝড় জল বৃষ্টি কিছুই নেভাতে

পারবে না এই আগুন | ক্যামেরার কারসাজিতে বোঝাই যাবে না এটা আসল আগুন নয় | দরকার হলে আমরা এই আগুন প্রদক্ষিণ করব | আর ব্যাকগ্রাউন্ডে সানাই, বাংলা গান সবই বাজবে | একজন এশিয়ান DJ-কে রাখা হয়েছে, যার আমাদের দেশের সংস্কৃতি আর গান-বাজনার বিষয়ে বেশ ভাল ধারণা আছে |"

বাবা নীরব শ্রোতা | মা গালে হাত দিয়ে প্রশ্ন করল, "এই বিয়ের আয়োজনে আমরা কোথায় বাবুন?"

- "কোনো চিন্তা কোরো না মা, এই প্যাকেজ ডীলে তোমাদের জন্য আটটা এয়ার ফেয়ার, হোটেল একোমোডেশন ফর ৩ নাইটস্ আর লোকাল সাইট সিইং ইনক্লুডেড |

রোশনির দিক থেকে জনাপঞ্চাশ, আর আমাদের বন্ধুবান্ধব বিসনেস পার্টনার অফিস কলিগ জনাপঞ্চাশ নিজের খরচে আসবে | এখন ঠিক করো তোমরা কে কে আসবে, সেই অনুযায়ী পাসপোর্ট-ভিসা রেডি করতে হবে আগে থেকে | দিদাকে কিন্তু আনতে হবে | হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা থাকবে | একজন বয়স্ক দিদার আশীর্বাদ ডক্যুমেন্টেড করে ফ্যামিলি ভ্যালুজ হাইলাইট করা যাবে |

আর জানো, এই এশিয়ান ডেস্টিনেশন ম্যারেজ ফুল ভ্যালু প্যাকেজ হচ্ছে আমার এখনকার স্টার্টআপ বিসনেসের আসল কনসেপ্ট | ঠিকঠাক নামাতে পারলে আমি আর রোশনি শার্ক ট্যাংকে অ্যাপ্লিকেশন জমা দেব | দেখো তোমাদের ছেলে কোথায় পৌঁছে যায় তারপর |

- "আর এই বিয়েতে আমাদের সমাজ, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, যাদের যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা নিমন্ত্রিত ছিলাম সারাজীবন, তাদের কোনো উপস্থিতি থাকবে না আমাদের একমাত্র ছেলের বিয়েতে?"

- "আরে চিন্তা করো না মা, পাড়ার কমিউনিটি হলে একটা ব্যবস্থা করে দেব | আজকাল দেশেও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ পাওয়া যায় | একটা LED বিগস্ক্রিন টিভিতে আমাদের বিয়ের লাইভ টেলিকাস্ট হবে | আর পাড়ার পুজোতে যারা রান্নাবান্না করে, ওদের একটা কেটারিং আছে, তাদের বলে দিলেই হবে | কব্জি ডুবিয়ে সবার মাংস-ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে | তোমরা সব্বাইকে নেমন্তন্ন করে দাও |

এই ডিজিটাল বিয়ের অনুষ্ঠানে একটা নতুনত্ব আছে | তোমাদের স্টেটাস বুঝতে পারবে সবাই |"

নিশ্চুপ বাবা হঠাৎ বলে উঠলেন, "ইন্টারনেট কানেকশনটা আমাদের মাটির টানের মতোই কেমন যেন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে রে! এত ঝলমলে রোদেও তোকে ঝাপসা দেখছি | ভাল থাকিস বাবুন তুই আর রোশনি | আশীর্বাদ রইল তোদের স্বপ্নের বাণিজ্যিক বিয়ের বাণিজ্যে | তোদের উত্তরণ হোক |"

ল্যাপটপের স্ক্রিনটা কালো হয়ে গেল | ঝগড়ুটে ঠিকুজি কুষ্ঠি মেলানো জীবনসঙ্গিনী হাতে হাত রেখে, চোখের জল লুকিয়ে বলল, "ঠিকুজি কুষ্ঠিটা একটু মিললে ভালই হতো বলো!"

স্নেহে অন্ধ

নন্দিতা ভট্টাচার্য

রঞ্জনা ছিল বাবার খুব আদরের। কোনও জিনিস আবদার করলে বাবা রাখবে না এমন হতো না। দিনগুলো খুব ভালভাবে কাটতে থাকে।

স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হ'ল রঞ্জনা। বাবার কাছে আবদার করেছিল ভাল রেজাল্ট করলে স্কুটি চাই। রেজাল্ট বেরোনোর সাথে সাথেই বাবা স্কুটি নিয়ে হাজির, মেয়ের প্রতি বাবার অগাধ বিশ্বাস যে!

দাদার সাথে বাবার মোটেই বনে না। দাদা হচ্ছে মায়ের খুব আদরের, দাদা কোন অন্যায় করলেও মা সবসময় দাদার পাশে থাকে। দাদা নেশা করে বাড়ি ফিরলে মা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দাদাকে নিজের ঘরে পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু সেগুলো বাবার নজর এড়িয়ে যায় না। বাবা-মায়ের এসব নিয়ে অশান্তি, দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে। রঞ্জনার খুব খারাপ লাগে; সংসারে রোজকার অশান্তি এমন তার ভাল লাগে না।

একদিন বাবা দাদাকে বলে, "যথেষ্ট বড় হয়েছ, এবার একটা কাজকর্ম খুঁজে সংসারে মন দাও। ছোট বোনটাকে দেখে কিছু তো শিখতে পারো, নিজের পড়াশোনার পাশাপাশি টিউশন করে নিজের হাতখরচ চালায়। আর তুমি বড় দাদা হয়ে বোনের থেকে, মায়ের থেকে টাকা নিয়ে নেশা করছ। আমার রিটায়ারমেন্টের আর দু'বছর বাকি; এর মধ্যে চেষ্টা করে যে কোন একটা কাজ শুরু করো।"

দাদা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। মা সাথে সাথেই এসে বলে, "সকাল সকাল ছেলেটাকে বকাবকি না করে নিজের কাজ করো না কেন!"

দাদা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বেরিয়ে যায়।

বাবা মাকে সেদিন বলেছিল, "একদিন এই ছেলের জন্য অনেক বড় বিপদে পড়বে, দেখো।" বলে বাবাও বেরিয়ে যায়।

দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ মদে চুর হয়ে দাদা বাড়ি ফিরল, এতটাই খেয়েছে যে দাঁড়াতে পারছে না। রঞ্জনা ভাবল বাবা দেখলেই আবার অশান্তি হবে।

এদিকে দুপুর পেরিয়ে, বিকেল গড়িয়ে, সন্ধ্যে হয়ে গেল, কিন্তু বাবা বাড়ি ফিরল না। রঞ্জনা জানে রবিবারটা বাবা বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়। সারা সপ্তাহ খেটে মানুষটা এই একটা দিনই একটু আনন্দ করে। রঞ্জনা কিন্তু এত বছরে বাবাকে এত দেরি করে বাড়ি ফিরতে দেখেনি, যেখানেই থাকুক রবিবার দুপুরে বাবা ঠিক ফিরে আসে, রঞ্জনার সাথে দুপুরের খাবার খায়। আজ বাবা আসেনি বলে রঞ্জনাও খায়নি, এদিকে মা আর দাদার কোন হেল-দোল নেই। মাংস-ভাত খেয়ে টিভিতে সিনেমা দেখছে। রঞ্জনা বাবাকে বারবার ফোন করছে; রিং হচ্ছে কিন্তু রিসিভ করছে না বাবা, কী যে হ'ল কিছুই বুঝতে পারছে না।

হঠাৎই কলিংবেল, রঞ্জনা দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলেই অবাক। কিছু বোঝার আগেই চারজন পুলিশ দাদাকে ধরে নিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়।

মা বলে, "আমার ছেলে কিছুই করেনি।"

পুলিশ অফিসার বলেন, "সেটা তো আদালত বিচার করবে।"

রঞ্জনা কিছু বুঝে উঠতে পারে না, মাকে জিজ্ঞেস করে, "কী ব্যাপার মা? কিছু বুঝতে পারছি না তো!"

পরদিন সকালে মা ও রঞ্জনা পুলিশ স্টেশনে যায়। অফিসার বলেন, "আপনার ছেলে দোষ স্বীকার করেছে, সে তার বাবাকে খুন করেছে দিনের আলোয়, সিসি টিভি ফুটেজ পেয়েছি আমরা।"

মা এতটাই শান্ত, যেন আগে থেকেই সবটা জানে; আর রঞ্জনার পুরো পৃথিবীটা দুলছে মনে হ'ল।

হসপিটালের বেডে রঞ্জনার জ্ঞান ফিরল। মাকে দেখতে পেয়ে বলল, "দাদা এটা কী করল, মা? তুমি যদি দাদার ভুলগুলো সব সময় ধামাচাপা না দিতে, তাহলে আজ এই দিনটা দেখতে হতো না। বাবা ঠিকই বলেছিল, এই ছেলের জন্য একদিন তুমি অনেক বড় বিপদে পড়বে, আজ তোমার পরিচয় তুমি একজন খুনির মা। স্নেহ ভাল জিনিস, কিন্তু অন্ধ স্নেহ কখনও নয়।"

ডুকরে কেঁদে উঠে মা বলে, "সত্যি, ছোট থেকে ছেলেটার দোষগুলোকে উপেক্ষা করা ঠিক হয়নি। আমি সত্যিই ওর প্রতি স্নেহে অন্ধ হয়ে ছিলাম।"

জামাইয়ের জুতো

কল্যাণী মিত্র ঘোষ

জামাইয়ের থান ইঁটের মতো জুতোগুলোয় যে খুশি যখন তখন হোঁচট খেতে পারে। আর তাঁর মেয়ের চলন বলনের তো কথাই নেই। সব সময় দৌড়াচ্ছে। ছোটবেলা থেকে আজও সেই একই স্বভাব। স্পোর্টসে বেশ প্রাইজ টাইজও পেত হাই-জাম্প, দৌড় ইত্যাদিতে। মেয়েটা খেলাধূলা, গান বাজনা, বই পড়া, ছবি আঁকা, এসব নিয়েই থাকতে ভালবাসত। এ বিষয়ে বাবার প্রশ্রয় সর্বদাই ওকে নিরাপত্তার ঘেরাটোপের স্বস্তি দিত।

বিদেশে মেয়ে, জামাইয়ের কাছে পাকাপাকিভাবে চলে এসেছেন যামিনী দেবী, নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও। একমাত্র মেয়ে আমেরিকার নাগরিকত্ব নিয়ে নিয়েছে। দেশে রাত বিরেতে অসুখ, হাসপাতাল ইত্যাদি করতে সেই অ্যাপার্টমেন্টের পড়শীরাই ভরসা। তবু তিনি একা থাকতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন, কারণ আর কিছুই না, মেয়ে জামাইয়ের গলগ্রহ হয়ে থাকা তাঁর একেবারে না পসন্দ। ছেলেদের বাড়িতে তাদের মা-বাবা বুক ফুলিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু জামাই বাড়িতে বৃদ্ধা, অথর্ব শাশুড়ি কিসের জোরে থাকবেন?

আসলে সমাজই এইভাবে সব ঠিক করে দিয়েছে। মেয়েটা ভাল চাকরি করত দেশে, জামাইয়ের সঙ্গে সেখানেই ভাব ভালবাসা; তার বহু বছর পর বিয়ের সিদ্ধান্ত ও বিদেশে পাড়ি। ইতিমধ্যে যামিনী দেবীও জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছালেন আর রোগ-ব্যাধি একেবারে গ্রাস করে ফেলল। প্রতিবেশীদের নিয়ে হই হই করে পনেরো-ষোল বছর কাটিয়েছেন। আজ পিকনিক, কাল কারো জন্মদিন, পরশু দলবেঁধে সিনেমা দেখতে যাওয়া। সেসব আস্তে আস্তে তাঁর জীবন থেকে মুছে গেল। বেশ ভারী কতকগুলো অসুখ তাঁকে একেবারে পেড়ে ফেলল। রান্নার মেয়েটা আর রাতের আয়াসর্বস্ব জীবন তখন তাঁর।

মেয়ে কিছুতেই কোনো ওজর আপত্তি শুনল না, বলল, "তুমি আমার পয়সায় থাকবে, খাবে, একদম উল্টোপাল্টা কিছু মনে আনবে না। আর নিজেকে ওরকম মিনমিনে করে রাখলে অন্যরাই বা সম্মান দেবে কেন? নিজের ডাঁটে থাকবে।" মেয়ের নাম কুহু আর জামাই সূর্য, নাতনিটিও এবার সাবালিকা হ'ল, গুড়িয়া বলে ডাকেন তিনি, তার বাবা ডাকে গুড্ডি আর মা বলে বেবো। ওইটের ভরসাতেই তাঁর এতদূর আসা। তা সেও এবার কলেজে চলে যাবে। যদিও সে বারবার দিম্মাকে আশ্বস্ত করেছে কাছের কলেজটাতেই ভর্তি হবে এবং ছুটি পেলেই দিম্মাকে দেখতে চলে আসবে।

আমেরিকার স্যান ডিয়েগো শহর বিখ্যাত তার আবহাওয়ার জন্য, তবু যামিনী দেবীর সারাক্ষণই শীত করে, একটা সোয়েটার আর তার ওপর পাতলা একটা পশমিনা কেউ তাঁর গা থেকে খুলে নিতে পারেনি আজ অবধি। এদেশে সব কাজ নিজেকেই করতে হয়, কিন্তু তিনি অথর্ব, দৃষ্টিশক্তিও প্রায় হারিয়ে ফেলেছেন, বোতল থেকে গ্লাসে জল ঢালতে গেলে সেটা কার্পেটে পড়ে যায়। নিজের ওপরই রাগ হয় তাঁর।

হ্যাঁ যে কথা হচ্ছিল, তিনি ভীষণ গোছানি মানুষ ছিলেন, ছিলেন কেন আজও আছেন। নিজের ঘরের প্রতিটা জিনিস হাতড়ে হাতড়ে গুছিয়ে রাখেন। মেয়েকেও ছোট থেকে পইপই করে শিখিয়েছেন, "জায়গার জিনিস জায়গায় রাখবি।" সত্যি এই সহজ কথাটা মেনে চললেই আর মিনিটে মিনিটে এটা হারাল, সেটা হারাল শুনতে হয় না। অথচ এদেশে এদের বাড়িতে এসে থেকেই তিনি বিভিন্ন ঘর থেকে আর্তনাদ শুনতে পান, "মা আমার সকারের একটা মোজা পাচ্ছি শুধু...", "আরে আমার ছোট টর্চটা গেল কোথায়..." অথবা মেয়ে স্বয়ং কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, "মা তোমাকে চুপিচুপি বলছি, সেই যে অষ্টমীর দিন বাড়ি এসে বালাজোড়া খুলে রাখলাম তারপর থেকে আর দেখতে পাচ্ছি না!"

এসব রোজকার ঘটনা। এখন তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন এদের এই এলোমেলো ছন্নছাড়া জীবনযাত্রায়। এদের কোনো কিছুতেই সময় নেই। সর্বদাই ঘোড়ায় জিন দিয়ে রয়েছে। তিনটে প্রাণীর একজন বেরোচ্ছে তো অন্য একজন ঢুকছে, নাতনি সন্ধ্যেবেলায় সকার প্র্যাকটিস করতে বেরোল তো তার একটু পরে জামাই গেল পিকল বল না কী একটা খেলতে, আর মেয়েও টুকটাক গ্রসারি করতে। ওপরের ঘরে বসে বসে গ্যারাজ খোলা আর বন্ধ করার আওয়াজ শুনে মোটামুটি আন্দাজ করে নেন তিনি কখন কে বেরোল। সেই সঙ্গে মনে পড়ে যায় তাঁর দেশের জীবনযাত্রার কথা। ছোট্ট ফ্ল্যাটে সবকিছু পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখা। মেয়ে তো সে অর্থে গুছিয়ে সংসার করতেই

জানল না। ভোর পাঁচটায় উঠে সকলের ব্রেকফাস্ট তৈরী করে, লাঞ্চ বাক্সে ভরেই কাজে দৌড়ায় আবার বাড়ি এসে জামাকাপড় ছেড়েই রান্নাঘরে ডিনারের জোগাড় । বছরের এই সময়টা নাতনির স্কুলে ছুটি থাকে স্প্রিং ব্রেক বলে। এই সময় ওরা পুরনো জামাকাপড় লন্ড্রিব্যাগে পুরে স্যালভেশন আর্মির কাছে দান করে আসে। তার আগে সেগুলো ভাল করে কেচে পরিষ্কার করে নেয় । যা হোক, কিছুটা হলেও আলমারি আর ওয়াড্রোবগুলো হালকা হয়, নইলে যা জিনিস কেনার ধুম এদের! বাপরে, রোজই বাড়ির সামনে অ্যামাজনের ট্রাক এসে দাঁড়ায়! আরে বাপু, এত যে কিনিস, পরিস কখন? সেই তো দেখি কালো টপ আর নীল জিন্স – কারণটা অবশ্য আর কিছুই নয়, বেরোবার সময় ঠিক জামাকাপড়গুলো খুঁজে না পাওয়া।

জামাইয়ের আবার শখ ঘড়ি কেনার, সেগুলো দুদিন পর পরই ব্যাটারি নিভে গিয়ে নিশ্চুপ হয়ে পড়ে থাকে। এদেশে এসে সূর্য খুব দৌড়াতে শিখেছে এবং সেজন্য চাই ভাল মজবুত জুতো। অনেক খুঁজে পেতে সে 'নিউ ব্যালেন্স' নামক একটা কম্পানির কাছে নিজের শারীরিক ব্যালেন্স সামলে রাখার দায়িত্ব দিয়েছে। মেয়ে অবশ্য বাড়িতেই একতলা দোতলা দৌড়োদৌড়ি সেরে নেয়, ওর ভাষায় ওর কাছে অত "ঘটা করে" দৌড়াতে যাবার মতো সময় নেই। ঠেস দিয়ে কথা এরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বলে, যামিনী দেবীর কানের পাশ দিয়ে সেসব গোলাগুলি ঠুসঠাস করে বেরিয়ে যায়। সবসময় ঠাকুরকে ডাকেন এইবার লেগে না যায়!

যামিনী দেবী মাঝেসাঝে নীচে নামেন যখন বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হয় কিংবা ওঁকে ডাক্তারের কাছে যেতে হয় তখন। তা, সে সময় সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে সোজা তিনজোড়া হাওয়াই চপ্পল পায়ের কাছে ঠেকে যায়। আর সেই তিন জোড়া আবার তিনদিকে ছড়িয়ে থাকে, কালো ডোরাকাটা অ্যাডিডাসের বাঁ'পায়েরটা সিঁড়ির বাঁ'দিকে তো অন্যটা নেভিব্লু রঙের ডঃ শোলসের একপাটির ঘাড়ের ওপর। ছোট থেকে শুনে এসেছেন জুতোর ঘাড়ে জুতো থাকলে ঝগড়া হয়। এর আগেও যতবার তিনি এদেশে এসেছেন চেষ্টা করেছেন গ্যারাজে রাখা জুতোর তাকে গন্ধমাদন পাহাড়ের মতো জুতোর স্তূপগুলোকে অন্তত জোড়ায় জোড়ায় রাখতে, কিন্তু তারপর আবার যে কে সেই! উনি মনে করেন কে কীভাবে জুতো বা জামাকাপড় খুলে রাখে তার মধ্যে দিয়ে তাদের মনের অবস্থা টের পাওয়া যায়। এই বাড়িতে সকলের মন যেন অন্য কোথাও বাঁধা – কাজেই জুতোগুলোও এর ওর দ্বারা জুতোতে জুতোতে এক সময় নিজ নিজ সঙ্গীকে পেয়ে যায়।

আজকে ওঁকে আবার দাঁতের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। প্রায় আট মাস হ'ল শেষ সম্বল চারখানা দাঁত তুলে ফেলতে হয়েছে এবং সেই থেকে নতুন পাওয়া বাঁধানো দাঁত কোনও ডাক্তারই আর ওঁর মাড়িতে ঠিকমতো বসাতে পারছে না। কী ঝকমারি রে বাবা! অথচ দেশে সেই হরি ডাক্তারবাবুর টেকনিশিয়ান ছেলেটাকে একবার ফোন করে ডাকলেই কী সব মেশিন পত্তর নিয়ে বাড়িতে চলে আসত আর বলত, "মাসীমা, যতক্ষণ না দাঁত আপনার মনের মতো হচ্ছে ততক্ষণ আমি আছি; কোনো চিন্তা করবেন না।"

এর বদলে বার'দুয়েক দার্জিলিং চা আর রান্নার মেয়েটার হাতের ঘুগনি দিলেই হ'ল । সেসব আরাম আর এদেশে কই? ইনসিওরেন্স নামে একটা বিশাল তিমিমাছ রয়েছে, যার নামে মেয়ে প্রায়শঃই গালমন্দ করে থাকে। আর তারাও সবে যখন ওঁর দিবানিদ্রার উপক্রম হয় ঠিক তখুনি ফোন করে হাজার একটা প্রশ্ন করে। উনি "মাই ডটার ইজ নট হিয়ার" বলে ফোন কেটে দেন। সেই ইনসিওরেন্স বলেছে এই বাঁধানো দাঁত ওরা নাকি পাঁচ বছরে একবার দেবে। বোঝো! আরে, এর মধ্যে একটা ভেঙেটেঙে গেলে কী হবে! যাই হোক সেইজন্যই এই ছ-সাত মাস ধরে প্রায় প্রতি সপ্তাহে উনি ডেন্টিস্টের কাছে যান; একদিন একদিকটা মসৃণ করে তো অন্যদিন অন্যদিক দিয়ে খাবার খেলে গাল কেটে যায়!

ডাক্তারের কাছে যাবার সময়টা মেয়ে বিকেল সাড়ে চারটের পর রাখে, যাতে ওকে আর আলাদা করে ছুটি নিতে না হয়। এবার মেয়ে আসার পর ওই সোয়া চারটে থেকে বাড়িতে একেবারে দক্ষযজ্ঞ লেগে যায়। যামিনী দেবী তো তটস্থ হয়ে থাকেন। মেয়ে হুইল চেয়ার গাড়িতে তুলে দিয়ে ওপরে আসে মাকে ধরে ধরে নামিয়ে নিতে। তারপর একটা ট্র্যান্সফার চেয়ারে বসিয়ে গ্যারাজ থেকে পার্কিংলটে রাখা অন্য একটা গাড়িতে মাকে বসায়। এরপর আবার এসে মাকে জুতো পরিয়ে দেয়, আর ফিরে গিয়ে বাড়ির অ্যালার্মটা অন করে দেয়। এই সব কাজ মোটামুটি দশমিনিটে সেরে শাঁ করে গাড়ি ও মাকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। সেদিন জামাই বাড়িতেই ছিল, একটু দয়া পরবশ হয়ে দুই

মহিলাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসে প্রথমে একবার নিজের হাওয়াই চপ্পলে ধাক্কা খেয়ে, "পায়ের কাছে কে যে এসব রাখে..." বলে গজগজ করতে করতে গ্যারাজের দিকে এগিয়ে যায় | বাইরে পা রাখতেই চৌকাঠের ঠিক মাঝখানে রাখা বিশালাকায় 'নিউ ব্যালেন্স' জুতোর এক পাটিতে শ্যুট করে, সে পাটি মাটি ছেড়ে শূন্যে উড়ে গিয়ে গ্যারাজের শেষপ্রান্তে ভূপতিত হয় | জামাই কোনোমতে দরজার ফ্রেম ধরে নিজের ব্যালেন্স ঠিক রাখে | হুইল চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় যামিনী দেবী অন্য পাটিটা কাঁপা কাঁপা হাতে তুলে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন, কারণ তার ওজন প্রায় তিন কেজি তো বটেই! এতক্ষণ ঘটে যাওয়া সবকিছু এবং দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বিরক্তি থেকেই তিনি বলে ওঠেন, "বাব্বা, এমন একেকখানা থান ইঁট পায়ে গলিয়ে কী করে দৌড়াও বলো তো? এর একখানা কারোর মাথায় মারলে তো সে সঙ্গে সঙ্গে অক্কা পাবে! নিউ ব্যালেন্স না সিধে হেভেন!"...

মায়ের অবদান

হুসনে জাহান

গাছের ডালে পাখিদের জীবন, তাদের চলাফেরা কি কখনো লক্ষ্য করেছ? মা-পাখি কেমন করে দূর দূরান্ত থেকে খাবার খুঁজে ঠোঁটে তুলে নিয়ে উড়ে গিয়ে তার গাছের বাসায় চোখ না ফোটা, পাখা না গজানো, ছোট্ট ছানাগুলোর ঠোঁটের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়? একটু পরে আবার মা-পাখি ফিরে যায়, আরো খাবারের খোঁজে? কারণ, পাখিটা যে বাচ্চাগুলোর জন্মদাতা মা, কষ্ট করে জন্ম দিয়েছে যাদের, তাদের বাঁচিয়ে সাবলীল পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে তো! তারপর – বড় হয়ে সে ছানা কোথায় যাবে, কী করবে, সে খোঁজ রাখার প্রয়োজন মা-পাখির ফুরিয়ে যাবে; আর সে মা আবার তার নিজের জীবন নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়বে | এটাই হ'ল পাখি ও অধিকাংশ প্রাণীর জীবনধারা | আর এখানেই অন্যান্য প্রাণীর সাথে মানুষ প্রাণীর জীবনের পার্থক্য | মানব জীবনের জন্মদাতা মা ও বাবা, বিশেষ করে গর্ভধারিনী মা'র তার সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা আজীবন এক তিলও হ্রাস পায় না | নিজের বাবা, মা ও সন্তানের সাথে সম্পর্কের কথা ভাবলে এ কথার সত্যতা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হবে না | পৃথিবীতে আমার নিজের অবস্থানের মেয়াদ যত ফুরিয়ে আসছে, মায়ের স্নেহ-মমতা, যত্ন-আকুলতা ততই বেশি মনের পর্দায় ভেসে আসছে | সে আদর, মায়াভরা চাহনি, অল্পেই সন্তুষ্টি, প্রতিদিনের চিন্তাভাবনা, জিজ্ঞাসা, দুশ্চিন্তা, কুশল সমাচার নির্ভয়ে ও নির্বিবাদে শেয়ার করা, পরামর্শ নেওয়া, আর অকৃত্রিম সেবা, এগুলো কি পৃথিবীতে আর কারো কাছে পাওয়া সম্ভব? মায়ের কথা লিখতে বসলে তো আরব্য উপন্যাসের গল্পের মতোই হয়ে যাবে |

আজকের যান্ত্রিক জীবনে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দ্রুত গতিতে চলার প্রতিযোগিতায় পৃথিবীটা ছোট হয়ে সবকিছুই মনে হয় অনেক কাছে এসে গেছে | মানুষের চাহিদাও ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে | এই কারণে যে যার তাগিদে ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার চেষ্টায় জীব জগতের স্নেহ-মমতা-মায়া পিছনে সরিয়ে রেখে যে যার লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে উন্মাদের মতো ছুটছে | এক পাড়ার বাসিন্দাই শুধু নয়, দরজার ওপাশের প্রতিবেশীরও এক মুহূর্ত সময় বা সদিচ্ছা নেই

যে উঁকি মেরে দেখে পাশের ঘরের লোকটা বেঁচে আছে কিনা।

এই বয়সে এসে আমার প্রতি পদে মায়ের কথা মনে পড়ে, আহা, মা আমার একথা বলত, এরকমভাবে সব সমাধান করে দিত, তিনি থাকলে তাঁর সাথে পরামর্শ করা যেত – ইত্যাদি আরো কত কি। মা সব কথাই মন দিয়ে শুনে আন্তরিকতার সাথে সমাধান করে দিত। এখন তো সেসব সম্ভাবনা সূর্যাস্তের সীমানারও ওপারে। কতদিন মনে প্রশ্ন জেগেছে, মা কি আমার কথা শুনতে পায়? আমাদের জন্য কি চিন্তা করে? যদি তাই না হয়, তবে প্রায় প্রতি রাতেই কেন আমি ঘুমোলে তিনি এসে আমাকে দেখা দেন?

আজ থেকে ২৪ বছর আগে মা চিরশান্তির দেশে চলে গেছেন। এতদিনে আমাদের কথা তো ভুলে যাবারই কথা! আমরা সবাই দীর্ঘজীবী হবার আশীর্বাদ দিয়ে থাকি। কিন্তু সে আশীর্বাদের সময় কেউ কি চিন্তা করি যে বয়সের সাথে পাল্লা দিয়ে শারীরিক ও মানসিক সমস্যাগুলোও ক্রমশ বেড়ে চলে? বাবা চলে যাবার পর মা তো একা একাই অনেক বছর কাটিয়েছেন। কারণ, তাঁর সন্তানরা মাকে কাজের মেয়ের তত্ত্বাবধানে রেখে সবাই বিদেশে। এক-দুবছর পর পর অবশ্য মায়ের আদর পেতে ও রান্না উপভোগ করতে দু-তিন সপ্তাহের জন্য তারা এসে বেড়িয়ে গেছে।

আজ মর্মে মর্মে বুঝতে পারি কেন মা যখন অসুস্থ বা একা বোধ করতেন, তাঁর মায়ের আদর ও যত্নের কথা বারবার মনে করে আক্ষেপ করতেন। তাঁর মুখে এ কথা কতবার শুনেছি। আহারে, কত বিরক্ত হয়েছি যখন আমাকে একটু শুয়ে থাকতে দেখলেই মা প্রশ্ন করতেন, 'ওমা অনু, কী হয়েছে মা, শরীরটা কি খারাপ লাগছে?' তখন বিরক্ত হয়ে মুখ ঝামটা দিয়ে জবাব দিয়েছি, 'আহ্ মা, কী মুশকিল, একটু বিশ্রাম করতে দেখলেই আপনি এ কথা কেন জিজ্ঞেস করেন?' আর আজ – ঐটুকু কথা শোনার জন্য যখন মনটা ছটফট করে, তখন সেই মানুষ কত দূরে!

আমার মা প্রায়ই আফসোস করতেন যে তাঁর মাকে শেষ সময়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তাঁর ধারণা হাসপাতালে ঠিকমতো চিকিৎসা বা যত্ন পাওয়া যায় না, হয় চিকিৎসা বিভ্রাটে নয় হাসপাতাল কর্মীদের অবহেলার কারণে। তাছাড়াও রুগীর পরিবারের পক্ষে প্রতিদিন সকাল বিকেল হাসপাতালে আসা যাওয়া, ডাক্তার নার্সদের সাথে পরামর্শ করা, রুগীর দেখাশোনা ও ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করা, সবই বেশ ঝামেলার ব্যাপার হয়ে যায়। কিন্তু মায়ের ভাই বড় ডাক্তার। তাঁর মতে এসব অশিক্ষিত লোকের কথা। তাই সবার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মাকে তিনি হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন। এরপর হাসপাতালে রুগীর প্রতিদিনের পুরো দায়িত্ব নিয়ে যাতায়াত করা আমার মা ছাড়া আর তো কারো পক্ষে সম্ভব হ'ল না। হাসপাতালে আলাদা কেবিন পাওয়া গেল না। সাধারণ ওয়ার্ডে জানালার পাশে খানিকটা খালি জায়গায় একটা বিছানা পেতে তাঁর শোবার ব্যবস্থা করা হ'ল। আমার মা রোজ বাসার কাজকর্ম কোনোমতে সামলিয়ে বিকেলে হাসপাতালে তাঁর মায়ের বিছানার পাশে চেয়ারে বসে রাত কাটিয়ে, সকালে বাসায় ফিরতেন। তাঁর কাছেই শুনেছি যে বর্ষার রাতে বৃষ্টির ঝাপ্টায় আমার মায়ের কম্বল ভিজে যেত।

বয়স বাড়ার সাথে ঘরে বাইরে দায়িত্বহীন হয়ে পড়ায় মা-বাবার সান্নিধ্যে কাটানো দিনগুলোর কথাই সারাক্ষণ জোনাকির আলোর মতো ঘুরে ফিরে মিটমিট করে জ্বলে। প্রায় প্রতি রাতে ঘুমোবার পর মা অথবা বাবা, কিংবা দুজনেই চুপচাপ আমার পুরনো পরিচিত পরিবেশে এসে দেখা দেন। এটা সুলক্ষণ না কুলক্ষণ, নাকি মনের অজ্ঞাত ইচ্ছাপূরণ, তা স্বপ্ন-বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারবেন। তবে এক ভোরে আমার জীবনের এক ভয়াবহ ঘটনার প্রাক্কালে দেখা স্বপ্ন থেকে মনে করতে ইচ্ছে হয় যে মা সেদিন পৃথিবীতে রেখে যাওয়া তাঁর সন্তানের অমঙ্গলের সংকেতবাণী পৌঁছাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মায়ের সেই চিন্তাগ্রস্ত মলিন চেহারা আমি কখনো ভুলতে পারিনি।

সেদিনের ঘটনাটা তাহলে এবার বলি। সেদিন দুপুরে আমার শোবার ঘরের বেডসুইচের সার্কিট ঢিলে হয়ে আমার খাটে আগুন ধরে যায়; আর নিমেষের মধ্যে পুরো অ্যাপার্টমেন্টে কালো ধোঁয়াসহ আগুনের শিখা ছড়িয়ে আলমারি, টেবিল, চেয়ার, বাক্স, বিছানা আর যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সব গ্রাস করে বিজলি ও গ্যাসের লাইনও অকেজো করে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। বিল্ডিং-এর সতর্কতার ঘন্টা বেজে উঠলে সবাই হুড়মুড় করে নিচে রাস্তায় নেমে পড়ে। আমার অ্যাপার্টমেন্টের সবাইও বেরিয়ে নিচে চলে যেতে বাধ্য হয়। সবার অনুরোধ উপেক্ষা করে মুখে কাপড় চেপে দমকলের অপেক্ষায় দরজার চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি আমি।

আগুন ও ধোঁয়ার কবল থেকে মুক্ত হবার পর দু-তিন ধরে চলল ধকল। দৌড়াদৌড়ি করে বিজলী ও গ্যাসের লাইন চালু করা ও বিভিন্ন অফিসে ঘোরাঘুরি করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নবায়ন করাতে হ'ল। এই ঘটনার দিনই ভোরে ঘুম ভাঙার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এলোথেলো সাধারণ বেশে মলিন ও চিন্তিত মুখে আমার ফ্ল্যাটের প্রবেশ পথের চৌকাঠে দেখেছিলাম আমার স্নেহময়ী মাকে। চিন্তিত হলাম মাকে ওরকমভাবে দেখে। দুপুরে আগুন লাগার পর মনে মনে অনুমান করলাম আমার শুভাকাঙ্ক্ষী মায়ের আসার কারণ।

মায়ের কাছে ছোটবেলায় অনেক বকাঝকা খেয়েছি, মন খারাপ হয়েছে, রাগ হয়েছে। আকাশে উড়ে সবার চোখের বাইরে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু মা-বাবার আস্তানা ছেড়ে বেরোবার পরই তাঁর সত্যিকার মায়া-মমতা বুঝতে ও কদর করতে শিখে পুরনো সব অভিমান ও অভিযোগ দূর হয়ে গেছে। মায়ের নিজের ছোট্ট বধূ-জীবনের অসন্তোষজনক পরিস্থিতির কথা যখন বুঝতে পেরেছি, তখন তাঁর জন্য দারুণ করুণা ও মায়াতেই মন বিমর্ষ হয়েছে, আহারে, আমার মা কত কষ্টই না পেয়েছে! বাবা-মা ছেড়ে বাসাভর্তি শ্বশুরবাড়ির লোকজনের ভিড়ে, যেখানে স্বামী ছাড়া তাঁর ভালমন্দের খেয়াল করার সময় বা আগ্রহ কারোরই ছিল না, সেখানে আমার মা সেই বয়সেও ওই পরিবেশে সবাইকে সন্তুষ্ট রেখে মিলেমিশে চলতে চেষ্টা করেছেন।

স্বামী সন্তান ছাড়াও শ্বশুর এবং বাবার পরিবারের সবারই মায়ের অক্লান্ত সেবা উপভোগ করার সুযোগ হয়েছে। কারো অসুখ শুনলেই মা তাদের বাসায় এনে নিজহাতে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মতো সেবা-শুশ্রূষা করে সুস্থ করেছেন। একবার আমাদের বাবা ঘোড়া থেকে পড়ে পিঠের গোটা দুই হাড় ভেঙে যায়। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বাবার সারা পিঠজুড়ে প্লাস্টার বাঁধা হয়। কলকাতায় দুই কামরার ফ্ল্যাটে সবাইমিলে দু'মাস কাটাতে হয়। আমরা তিন ভাইবোন সেখানে হাম-জ্বরে আক্রান্ত হই। এক অল্পবয়সী কাজের ছেলে নিয়ে কীভাবে মা একা সব সামলেছিলেন ভাবলে অবাক লাগে।

সেকালে ডাক্তাররা রুগীর বাসায় এসে চিকিৎসা করতেন। সে সময়ের তরল তিতো ওষুধ খেতে আমরা খুব কান্নাকাটি ও জিদ করতাম বলে দুরারোগ্য অসুখ ছাড়া আমাদের মা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসারই সাহায্য নিতেন। স্থানীয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকরাও আমাদের বাসায় এসেই চিকিৎসা করেছেন। মনে আছে শরীরে কোথাও কেটে ছড়ে গেলে আয়োডিন না লাগিয়ে মা গাঁদা ফুলের পাতা কচলিয়ে লাগিয়ে দিতেন। আমার মা সর্বদাই তাঁর চিকিৎসার জ্ঞান বাড়ানোর উদ্দেশ্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকদের কাছ থেকে ওষুধের নাম, প্রয়োগের মাত্রা, শুশ্রূষার পদ্ধতি সব খুঁটিয়ে জেনে নিতেন। সেই সাথে প্রয়োজনীয় বইও জোগাড় করতেন। মা আমাদের সবাইকেই সাধারণ অসুখের জন্য হোমিওপ্যাথির কিছু প্রাথমিক চিকিৎসা, ওষুধের নাম আর প্রয়োগ-পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আজীবন সেগুলো আমরা কাজে লাগিয়েছি, এখনো প্রয়োজনে প্রয়োগ করি।

আমি কয়েকবার কয়েকটা কঠিন অসুখে ভুগেছি, যেমন, টাইফয়েড, মাম্পস্, জল বসন্ত, হাঁটুর হাড় ভাঙা আর অবশ্যই হাম। অসুখ হওয়ামাত্র মা আমাকে নিজের কাছে আনিয়ে চিকিৎসা করেছেন। পূর্ববাংলায় তখনও পেনিসিলিন, অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি ওষুধ এসে পৌঁছায়নি, ডাক্তারের পরামর্শে আর মা'র অনুরোধে বাবা সেগুলো কলকাতা থেকে আনিয়ে আমার চিকিৎসা করিয়েছেন। আমার সন্তান প্রসবের সময় ন'মাসের কাহিনী তো বলে শেষই করা যাবে না।

আমাদের দাদি যখন কালাজ্বরে আক্রান্ত হলেন, গ্রামে তখন সেই রোগের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ছিল না, তাই তাঁকে আমাদের কলকাতার বাসায় আনিয়ে যেভাবে মা চিকিৎসা, ওষুধ-পথ্য ও সেবা করেছেন, তা যে কোনো স্পেশাল হাসপাতালের চিকিৎসার চাইতে কোনো অংশেই নিম্ন মানের ছিল না। এ ধরনের কাজে মা আনন্দ ও গর্ব বোধ করতেন। উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেলে মা সম্ভবত ডাক্তারের পেশাই বেছে নিতেন।

আমাদের বাসা ছোট বা বড় যেমনই ছিল, রুগীর পুরো ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করতে মা কখনই অবহেলা করেননি। রুগীর প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়ে, নিজের অসুবিধা তুচ্ছ করে যেভাবে সংসারের অন্যান্য দায়িত্ব সামলিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। রুগীর পরিচর্যা সম্পন্ন করার পর তার স্বাভাবিক জীবন-যাত্রায় না ফেরা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় যত্নের কোনো ত্রুটি রাখেননি আমার মা।

একবার মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে মাকে দেখতে এসে আমি নিজেই ডিসেন্ট্রি এবং ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলাম। ডাক্তার এই দুই অসুখের জন্য একাধিক কড়া ওষুধের নির্দেশ দিলেন। ফলে খাবারে অরুচি হয়ে একফোঁটা পানীয়ও মুখে দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। সে রাতে আমার ছোট বোন বিদেশ থেকে এসে পৌঁছাল। মা তাকে কাতরস্বরে নির্দেশ দিলেন, 'শিগগির উপরে যা। তোর দিদি যে মরে যাচ্ছে!' ছোটবোনকে উপরে দেখে তটস্থ হয়ে আমি তাকে মায়ের কাছেই ফিরে যেতে বললাম। সে জানাল মা-ই তাকে উপরে পাঠিয়েছেন আমার শুশ্রূষা করার জন্য। তখন সে বেচারি এতটা জার্নি করে এসে সারারাত মশারির ভেতরে বসে চামচ দিয়ে আমার ঠোঁটের ফাঁকে আস্তে আস্তে স্যালাইন ঢেলে কাটিয়ে দিল। ভোরের দিকে আমার জীবনীশক্তি ফিরে এল।

আমার বাবার ক্যান্সারের শেষ দু'বছর চলাফেরা স্থগিত হয়ে যায়। সে সময় মা নিজের শারীরিক ও মানসিক শক্তি দিয়ে যেভাবে বাবার সেবা করেছেন তা অবর্ণনীয়। তবুও নাকি বার বার বাবাকে বলতেন, 'দোহাই তোমার, তুমি আমার পাশে থেকো। আমি এভাবেই তোমার সেবা করে যেতে চাই। লক্ষ্মীটি, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেও না।'

এভাবেই নিজের ভালমন্দ উপেক্ষা করে আমার মা সবার জন্য করে গেছেন । স্বামী ও সন্তানরাই ছিল তাঁর জীবনের গণ্ডি। তাদের প্রয়োজন ও শখ মেটাবার লক্ষ্যেই নিজের সারাটা জীবন নিয়োগ করেছিলেন আমাদের মা।

এখন তাই মনে হয়, যে মানুষ সবটুকু জীবনীশক্তি অন্যের জন্য উৎসর্গ করেছেন, তার পরিবর্তে আমরা কেউ কি তাঁর জন্য তেমন কিছু করতে পেরেছি? আমাদের কারো কাছে কখনই তিনি কোনো চাহিদা বা দাবি করেননি। আমরা যদি কখনো তাঁর মাথায় বা পায়ে হাত বুলিয়ে বা চুল আঁচড়ে দিতে চেয়েছি, সেটুকুও নিতে মা'র কুণ্ঠা বোধ হয়েছে।

অন্তিম সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে তাঁর একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আমাদের পরিবারের যেসব ডাক্তার ছিল, হয় তারা সে সময় নিজেরাই স্রষ্টার কাছে ফিরে গেছেন নয়তো বার্ধক্যের কবলে। আর ডাক্তার বাসায় এসে চিকিৎসা করার যুগও তখন পুরোপুরি পাল্টে গেছে। বড় বড় হাসপাতালে, স্পেশাল ক্লিনিকে হয় নিজেরা গিয়ে, না হয় ভর্তি হয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়ে চিকিৎসা করাতে হয়। মায়ের কিডনির শেষ অবস্থায় ডাক্তার টেলিফোনে নির্দেশ দিলেন হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে। দুঃখের বিষয় মায়ের কোনো সন্তান ডাক্তারি পেশা গ্রহণ করেনি। তাই ডাক্তারের নির্দেশ অমান্য করার সাহস আমাদের কারো হয়নি। আমাদের নিরুপায় অবস্থা বুঝে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও মলিন মুখে মা সবার কাছে শেষ বিদায় নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। পূর্ব বাংলায় যে হাসপাতালে মা ছিলেন, তখন সেখানেই একমাত্র কিডনি ডায়ালিসিসের মেশিন ছিল, কিন্তু সেটাও অচল অবস্থায় পড়ে ছিল । তাছাড়া মা আমাদের বরাবর অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে যেন মেশিনের চিকিৎসা করে জোর করে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা না করি।

প্রথম রাতে আমার ভাই মায়ের পাশে চেয়ারে বসেই কাটাল। পরের রাতে আমাকে দেখে মা একটু মলিন হেসে শুধু বললেন, "আজ বুঝি তোমার ডিউটি?" রাতে শরীরে অস্থিরতা সত্ত্বেও মা আমার কাছে কোনো সেবা নিতে সম্মত হলেন না। ক্ষীণস্বরে শুধু একবার জিজ্ঞেস করলেন তাঁর খাস কাজের মেয়ে এসেছে কিনা । আমি আর তাঁকে বললাম না যে তাঁর খাস মেয়ে হাসপাতালে রাত কাটাতে রাজি ছিল না।

পরদিন সকালে মাকে ইন্টেনসিভ্ কেয়ারে নিয়ে যাবার পর আমাদের আর কিছু করার বা বলার সুযোগ কিংবা প্রয়োজন হ'ল না। রয়ে গেল শুধু সেই সাতসকালে স্কুলের বাস এলে মাসির চিৎকারে তাড়াহুড়ো করে ডিমভাজা, আলুভর্তা, ঘি ও ডালমাখা গরম ভাতের স্মৃতি, না বলা কথা, আর এক শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হারানোর ব্যথা।

আজ ঢাকার এক খবরে পড়লাম ঘর পুড়ে যাওয়া এক বস্তির মেয়ে সাংবাদিকের সাক্ষাৎকারে বলেছে, "ঘর পুড়ছে তো কী হইছে, আমার মা তো বাঁইচা আছে এইডাই বেশি, সবকিছু পুইড়া যাক, আমার মা তো আছে!..."

কত লোকের কত সম্পদ আছে, কিন্তু মা নেই। আমাদের এতকিছু নেই, কিন্তু মা তো আছে, এই অনেক!

যে হাত দোলনা দোলায়, তারে কি কভু ভোলা যায়?

প্রবাস বন্ধু

নববর্ষ সংখ্যা ১৪৩১ (2024)

প্রবাস বন্ধু পত্রিকায় আমরা শুধুমাত্র বাংলা লেখা প্রকাশ করি।
যাঁরা এই পত্রিকায় লেখা বা আঁকা পাঠাতে ইচ্ছুক,
তাঁরা স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান।
কেবলমাত্র Google বাঙলায় টাইপ করা লেখা নেওয়া হবে।
https://www.google.com/intl/bn/inputtools/try/ এই ওয়েবসাইটে গিয়ে টাইপ করুন।
লেখা pdf করে পাঠাবেন না। **Word-**এ পাঠাবেন। প্রসঙ্গত Vrinda টাইপও ঠিক হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:

Malabika Chatterjee
6 Wimberly Court
Decatur, GA 30030
e-mail address: c.malabika@gmail.com

অথবা

Sujay Datta
41 Rotili Lane
Copley, OH 44321
e-mail address: sujayd5247@yahoo.com

সাহিত্য সভার সভ্য হবার বাৎসরিক চাঁদা পরিবার পিছু ২৫ ডলার।
প্রতি মাসের শেষ রবিবার সাহিত্য সভার অধিবেশন পরিচালিত হয় বিভিন্ন সভ্যের বাড়িতে।
বছরে দুবার (নববর্ষ সংখ্যা ও শারদীয়া সংখ্যা) 'প্রবাস বন্ধু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
লেখা পাঠাবার ইচ্ছা থাকলে নববর্ষ আর দুর্গাপুজোর এক মাস আগে লেখা জমা দিন।
এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রবাস বন্ধু ওয়েববসাইটে **https://www.prabashbandhu.org/**
রবি ও চন্দ্রা দে-র বাড়িতে পাঠচক্রের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বাংলা বই আছে।
সেগুলি সভ্যরা ব্যবহার করতে পারেন।
সাহিত্য সভার সভ্য হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন রবি ও চন্দ্রা দে-র ঠিকানায়।

Rabi & Chandra De
8 Prospect Place
Bellaire, TX 77401
Phone: 713-669-0923
e-mail address: rabide@yahoo.com

শুভ নববর্ষ